শতাব্দী

রমেশচন্দ্র সেন

শতাব্দী

পূরবী পাবলিশার্স
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ—
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

প্রকাশক :—গিরীন চক্রবর্তী
পুরবী পাবলিশার্স
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা

মূল্য—৪।।০

মুদ্রাকর :—ফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা

ভারতীয় সাধনার মূর্ত প্রতীক—

শ্রীঅরবিন্দের

চরণোদ্দেশে

শতাব্দী

বিলান দেশ। চারদিকে থৈ থৈ করে জল। বছরে পাঁচটা মাস পথ ঘাট, নদী নালা সব একাকার হইয়া যায়। সূর্য কার্তিক মাস হইতে জল শুষিতে আরম্ভ করে, বিলের জল নদী দিয়া নামিতে থাকে কিন্তু বৈশাখ পর্যন্তও সব জায়গা শুকায় না। মাঠের নীচু জমিগুলি জলের তলায়ই থাকে। তার উপরই আবার শুরু হয় জ্যৈষ্ঠের বর্ষণ। ঘর দরজা জলে ডুবিয়া যায়, অনেককেই মাচা বাঁধিয়া থাকিতে হয়। যাতায়াত করিতে হয় নৌকা বা তালের ডোঙা করিয়া।

পরগনার মাঝখানে ছোট্ট গ্রাম, নাম মঞ্জরী। বর্ষাকালে দিনের বেলায় মঞ্জরীর বাড়ীগুলিকে দ্বীপের মতন দেখায়। রাত্রে আলো জ্বালিলে মনে হয় যেন ছোট ছোট এক একটা লাইট হাউস।

লোকে জল হইতে ধাপ-দল তুলিয়া ভিটার উপর জড় করে। সেগুলি শুকাইয়া মাটি হয়। সেই মাটি কিছুটা ধুইয়া যায়। মানুষ আবার ধাপ টানিয়া তোলে, চেষ্টা করে ভিটা উঁচু করিবার। প্রকৃতির সঙ্গে এমনিভাবে সংগ্রাম করিয়া সে বাঁচিয়া থাকে। জলের তলায় লুকানো যে প্রাণশক্তি—বিলের মানুষ তাহাই সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া তার আবাস-গৃহ গড়িয়া তোলে। এমনি করিয়াই গ্রামের জন্ম হয়, গ্রামের পর গ্রাম মিলিয়া হয় পরগনা।

বাহিরের লোকের কাছে ছোট্ট এই গ্রামখানি পরগনার নামেই পরিচিত। পরগনা নেপালপুরে বহু জাতির বাস, অনেক হিন্দু, অনেক মুসলমান। তবে স্থানটাকে ব্রাহ্মণ-প্রধানই বলা চলে। জমিদারি

বহুধা বিভক্ত হইলেও তাঁরাই পরগনার অধিকাংশ জমির মালিক। কিন্তু এ দেশের সত্যকার গৌরব ব্রাহ্মণ-জমিদার নয়, গৌরব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। কৌলিন্য কাঞ্চনে নয়, পূজা স্তব ও শাস্ত্র চর্চায়। প্রভাতে তাঁদের স্তব ও শাস্ত্র আবৃত্তি শ্রবণ করিলে হিন্দুর জ্ঞানচর্চার অতীত ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে। ভারতবিখ্যাত বহু ঋষিকল্প পণ্ডিতের স্মৃতিপূত এই দেশে তখনও অনেক মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আজ বলিতেছি সেই যুগের কথা।

মঞ্জরীর শাস্ত্রচর্চার তেমন কোন ঐতিহ্য নাই। বাংলার আর পাঁচটা গ্রামেব মতন এখানেও হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাবে বাস করে, যখনকার এই আখ্যায়িকা অন্ততঃ তখন করিত। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, নমঃশূদ্র-নাপিত একে অপরকে খুড়া, জ্যাঠা, ভাই, চাচা বলিয়া ডাকিত। দ্বন্দ্ব ছিল, কলহও ছিল, যেমন হয় ভাইয়ে ভাইয়ে কিন্তু অন্তরের পুঞ্জীভূত মালিন্য আকাশ বাতাসকে বিষাইয়া তুলিত না। শরতের মেঘের মতন ক্ষণ-বর্ষণান্তে দেখা যাইত স্বচ্ছ নীল নির্মল আকাশ। বাংলা ছিল হিন্দু-মুসলমানেব আদরের মাতৃভুমি। বাংলাকে কেহ বিমাতা বলিয়া ভাবিত না। বিভিন্ন স্বার্থ তখনও এমন করিয়া দেখা দেয় নাই। কেহ একপক্ষকে অপরপক্ষের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য উস্‌কাইয়া দিত না।

মঞ্জরীর হাটের কিছু নীচে পশ্চিম বাহিনী খালটি দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে, তারই পুব পারে গ্রামের নমঃশূদ্রদের মাতব্বর অগ্নি মণ্ডলের বাড়ী। বাড়ীর নীচে খালের পারে এক সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। থোকায় থোকায় লাল ফুল, তার উপর বৈকালী সূর্যের আলো পড়ায় রক্তবর্ণের সে কী অপূর্ব সমারোহ। লাল চেলির ভিতর হইতে গৌরী নববধূর মতন ফুলের আড়ালে মণ্ডলের ঘরের চকচকে সাদা টিন উঁকি মারে।

এই ঘরের বারান্দায় পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। সেখানে ও উঠানে কতকগুলি হোগলার চাটাই পাতা। বারান্দার মাঝখানে অগ্নি মণ্ডল, তাঁর দু'পাশে জজের জুরির মতন কয়েকজন মাতব্বর। বারান্দায় ও উঠানের ছায়ায় স্বজাতীয়দের অনেকেই উপস্থিত।

পঞ্চায়েতের আসবাব সামান্য—গুটিকয়েক তুষের তাওয়া, গোল করিয়া পাকানো নারিকেলের ছোবড়া, গন্ধকের কাঠি এবং দা-কাটা তামাক। অগ্নি মণ্ডল নমঃশূদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী। ধানের গোলায় প্রচুর ধান, পুকুরে মাছ বাগানে ফল, ক্ষেতে ফসল, এক কথায় ভাগ্যলক্ষ্মী যেন তাঁর ঘরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। লোকটি ন্যায়পরায়ণ ধর্মভীরু বলিয়া ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, হিন্দু, মুসলমান—সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণই স্বজাতীয়দের থানা ও আদালত। বিপদে আপদে অন্য লোকেরাও তাঁর নিকট ছুটিয়া আসে, সম্পদে পরামর্শ নেয়। অনেক সময় সালিশ মান্য করে।

কয়েকটি ব্যাপারের মীমাংসার পর নগরবাসী বাড়ৈর বিচার আরম্ভ হইল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ করিয়া নগর এক বিধবাকে লইয়া তারাইলে ঘর বাঁধিয়াছে। তারাইলের বিলে তার বাবা সাগরবাসীর পঁচিশ বিঘার উপর জমি। নগর সেই সব জমি নিজে ভোগ করে, পিতাকে জমির কাছে যাইতে দেয় না। গেলে গোলমাল করে, গালাগালি দেয়, লাঠি উঁচাইয়া ভয় দেখায়।

এক সময় এই বাড়ৈ পরিবারই বিশেষ প্রতিপত্তিশালা ছিল। সাগরের পিতা নদীয়াবাসী ছিলেন গাঁয়ের মাতব্বর। ধানে চালে, গরু-বাছুরে, হালে-লাঙ্গলে, বাড় বাড়ন্ত সংসার। লোকে খাতির করিত। নদীয়াবাসীর পর সাগরকেও মাঝে মাঝে সালিসিতে ডাকিত।

আজ নগরবাসীর জন্য সংসার হতশ্রী। আসিয়াছে দারিদ্র্য ও অপমান, কলহ ও অশান্তি। সাগরকে পঞ্চায়েতের সামনে দাঁড়াইতে

হইয়াছে। লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। ভাবিতেছেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা।

বয়স্ক পুত্র কোথায় তাঁহাকে সাহায্য করিবে, তার বদল সে আজ তাঁকে ন্যায্য অন্ন হইতে বঞ্চিত করে। শুধু তাহাই নয়, তার জন্য সাগরবাসীকে আজ পাঁচ জনের সামনে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হয়।

নগরের মাতার মৃত্যুর পর সাগরবাসী আবার বিবাহ করেন। সেই হইতেই নগরবাসী বিগড়াইয়া যায়। বয়স তখন তার ষোল কি সতর। সাগর কহিলেন, বিচার করখুন মণ্ডল খুড়া আর মাতব্বর মশায়রা, ও আমারে জমিতে যাইতে দেয় না। ছাওয়াল হৈয়া অপমানী করে।

অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, কি কও, নগর?

নগর বলিল, হ্যাঁ, ও জমি আমিই ভোগ করি।

অগ্নি মণ্ডল জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপকে জমির ধারে যাইতে দেও না কেন?

নগরবাসী কহিল, জমির অর্ধেক আমায় ভাগ করে দিন। বাকি অর্ধেক ওরা চষুন গিয়ে।

সাগর কহিলেন, আধা তোর কিসের রে? তোর শ্বশুর কি তোরে লেইখ্যা দিছে?

অশাস্তরী কথা ব'ল না। সে আমায় দেবে কেন? সে হ'ল তোমার মিতে। দিলে তোমায় দিয়েছে।

অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, দেখ নগর, বাপ থাকতে ছাওয়ালে জমির মালিক হইতে পারে না।

নগরবাসী বলিল, আমিও অকূল পাথার থেকে ভেসে আসি নি।

অগ্নি মণ্ডল কহিলেন, তা নয় কিন্তু মহারাণীর আইন এই। সমাজ শাস্তরেও ঐ কথাই কয়।

নগর বলিল, তা কেন? আমার পিতার দুই পরিবার; বিষয়ের এক ভাগ আমার মা'র আর এক ভাগ এই কৈকেয়ী মাতার। আপনারা সেই হিসেবে ভাগ ক'রে দিন।

তাকে কে যেন বুঝাইয়াছিল যে, স্ত্রীর সংখ্যা অনুপাতে হিন্দুর সম্পত্তি বিভাগ হয়। সে সেইটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

অনেক কথা কাটাকাটির পর ভাগ্য বাড়ৈ বলিল, ও যখন পিতার লগে থাকতে চায় না, আপনারা অরে জমি ভাগ করিয়া দিখুন। সাগর ভাইর চার ছাওয়াল, চার ভাগের এক ভাগ তো ও পাবেই।

সর্বস্ব হইতে বঞ্চিত বৃদ্ধ সাগরবাসী এর চেয়ে বেশী দিয়াও মিটমাট করিতে সম্মত ছিলেন। এই সময় মণ্ডলের ঘরের ভিতর হইতে মাতব্বররা শুনিতে পান এইভাবে নগরের বিমাতা কুঞ্জসখী কহিল, আমার ছাওপোনারাও তো খড়কুটার মতন বিলের জলে ভাসিয়া আসে নাই। আপনারা মোড়ল, আপনারা পেরধান। আমার ছাওয়ালেরা যাতে বাঁচিয়া থাকতে পারে তা আপনারগো করতেই হবে।

নগরবাসী বলিল, বেশ মঞ্জরীর জমির ভাগ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমাকে তারাইলের জমির অর্ধেক দিন।

কুঞ্জসখী কহিল, গ্রামের জমি মাত্তর চার কুড়া, ভিটা বাড়ী আধ কুড়া। এই সাড়ে চার বিঘার অর্ধেকের বদল তারাইলের ত্রিশ কুড়ার অর্ধেক ও পাইতে পারে না। গ্রামের জমি নীরস আর তারাইলের গাঙের ধারের উঠ্‌তি জমি মাটি না যেন মা লক্ষ্মী।

বাদ-প্রতিবাদের উপসংহারে অগ্নি মণ্ডল কহিলেন, কাল একপ্রহর উদানে আমরা তারাইলে যাইয়া জমি ভাগ করিয়া দেব। নগর, এক সিকি পাবা তুমি। যদিও বাপ থাকতে তা হওয়া উচিত না কিন্তু মণ্ডলরা যখন কইছেন আর তোমার বাবারও সেই মত তখন গোলমাল মিটানোই ভাল।

নগরবাসী ইহাতে খুশি হইতে পারিল না। কিন্তু সে জানিত, আপত্তি করা নিরর্থক। সাগরবাসী বলিলেন, আর একটা কথারও ফয়সালার দরকার।

কথাটা টগর সংক্রান্ত। খুলিয়া বলিতে তার বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, বার দুই ঢোঁক গিলিয়া শেষটায় বলিলেন, আমি কইতেছিলাম এই দধিভূষণের মাইয়ার কথা, টগরের—

ব্যাপারটা জানিত সকলেই। অনেকেই এবার মুখ চাওয়া-চাউয়ি করিতে লাগিল।

এই সময় উন্নতবপু, সুশ্রী এক যুবা আসর ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, কি রাজেশ্বর, তুমি তো আরও একদিন আইছিলা। কোন কথা ছিল না কি?

রাজেশ্বর বলিল আজ্ঞে ছিল। সে অন্য সময় হবে—বলিয়াই পঞ্চায়েতের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলেন। অপরের গ্লানিকর আলোচনার সময় রাজেশ্বর উপস্থিত থাকিতে চায় না। অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, আলোক মল্লিকের ছাওয়ালটি বড় খাসা। লোচন মধু কহিলেন, ছাওয়াল না যেন চকমকির ঝিলিক্।

সাগরবাসী আবার পুত্রের প্রসঙ্গ তুলিলেন, বউডি কী কেলেশই না পায়। কী ক্রন্দনডাই না করে, যদি তা' ছাখতেন মণ্ডল মশায়রা, দুইটা ছাওপোনা হইছে, নগর তারগো দিগেও যদি চাইতো।

নগরবাসী বলিল, নিষেধ করিনি তখন, যে ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না? কৈকেয়ী রানীর যুক্তিতে তোমার রামচন্দররে নিজ হাতে তুমি বনে পাঠাইছ।

সকলেই এবার হাসিয়া উঠিল।

নগরবাসী বলিল, আপনারা হাস্য করেন কেন? বিমাতার বিষের জ্বালা কি এর মধ্যে কেউ টের পান নাই?

বিমাতা এই সময় আড়াল হইতে বলিয়া উঠিলেন, আরে আমার সোনার রামচন্দররে! তোর বউ বেডারে তুই পুষবি না তো পোষবে কেডা?

নগরবাসী বলিল, তুমি এই বউ এনেছিলে শুধু আমায় কষ্ট দেওয়ার জন্য।

তাদের সমাজে পণ দিয়া ক'নে আনিতে হয়। মেয়ের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পণ বাড়ে। তখন মেয়েদের বিবাহ হইত পাঁচ, সাত বৎসর বয়সে। অনেকেই গরিব, টাকার দরকার, তাই মেয়ে বড় হওয়া পর্যন্ত কেহ দেরি করিতে পারে না। বার বৎসর পার হইয়া গেলে সমাজেও পাঁচটা কথা ওঠে।

নগরবাসীর স্বভাব বিগড়াইয়া যাওয়ায় সাগরবাসী স্থির করিলেন ছেলের জন্য বয়স্কা সুন্দরী পাত্রী আনিবেন। একটি মেয়ে তার পছন্দও হইয়াছিল। মেয়েটি দরিদ্রের, টাকা তারা কিছু বেশী চায়। সাগরবাসীর তখন টাকা দেওয়ার মতন অবস্থা ছিল, কিন্তু স্ত্রী কুঞ্জসখী আপত্তি করিল, এক ছাওয়ালের জন্য আর সগলডিরে তুমি ভাসাইয়া দেবা দেখছি।

আপত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেলিতেও কসুর করিল না।

ঐ চোখের জলেরই শেষটায় জয় হইল। কুঞ্জসখীর মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে নগরবাসীর বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রীটি কালো, ট্যারা, তার উপর দাঁত উঁচু।

নারী সম্বন্ধে নগরবাসী অনভিজ্ঞ ছিল না বটে, কিন্তু একান্তই আপনার করিয়া একজনকে পাইল আজ এই প্রথম। যার উপর অধিকার আছে, বাড়ী ফিরিতে দেরি হইলে ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া যে উৎসুক চিত্তে তার প্রতীক্ষা করিবে, এরূপ একটি নারীর মোহ কিছুদিনের জন্য তাকে সংযত করিল।

তারপর ফুরাইয়া গেল সেই নূতনত্বের মোহ। অধিকারের দাবি পুরাতন হইল এবং সেই দাবিই শেষটায় তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। তার উপর কারও দাবি আছে এ জিনিসটা সে সহ্য করিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া অসহ্য ঠেকিত বিমাতার আনা ঐ কুৎসিত মেয়েটির দাবি।

এই সময় টগরের রূপ-যৌবন, শানিত ফলার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নগরকে আকৃষ্ট করিল। স্ত্রী নৃত্যকালীর রূপ তো ছিলই না, মানুষকে ভুলাইবার ছলাকলাও সে জানিত না। নিতান্ত সাদাসিধে এই মেয়েটি জানিত ঘর-সংসার করিতে, ভালবাসিতে, নিজেকে বিলাইয়া দিতে। অমন যে সৎ-শাশুড়ী কুঞ্জসখী, তাকেও সে আপন করিল, পারিল না শুধু স্বামীকে। সে কাঁদিয়া কাপড়ের খুঁট ভিজাইল, ছেলে দু'টিকে আরও বেশী করিয়া আদর করিল। এদিকে নগরবাসী টগরকে লইয়া তারাইলে বাসা বাঁধিল।

পঞ্চায়েতের উদ্দেশে সাগরবাসী বলিলেন, আপনারা অন্ততঃ অর ছাওয়ালগো একটা ব্যবস্থা করখুন।

নগরবাসী বলিল, তারাইলের জমি অর্ধেক আমাকে দাও, আমি ওদের ভার নিচ্ছি।

এই সময় মণ্ডলের বাড়ীর ভিতর হইতে কাঁসার পাত্রে মাতব্বরদের জন্য ফুটি, তরমুজ, গুড়, আব কয়েক গেলাস জল আসিল। অন্য সম্প্রদায়ের যাঁরা ছিলেন তাদের জন্য আসিল, আস্ত ফল আর একখানা কাটারি। স্বজাতীয়দের আর পাঁচজনকে কাঠের একটা বড় বারকোশে ফল পাকুড় ও গুড় দেওয়া হইল। ভাগ্য জিজ্ঞাসা করিল, এ সব আপনার ক্ষেতের ফসল বুঝি।

অশ্বি মণ্ডল কহিলেন, আজ্ঞা, হ।

খাবার খাইয়া অল্পবয়স্কেরা তুষের তাওয়ায় নারিকেলের ছোবড়া

গুঁজিয়া ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালে। তামাক সাজিয়া বৃদ্ধদের হাতে দিবার আগে কলিকাটা একটু প্রসাদ করিয়া দেয়। টানের চোটে হাতের তালু গরম হইয়া ওঠে, আগুনের শিখা কলিকার ডগায় লক্ লক্ করিতে থাকে।

জলযোগান্তে অগ্নি মণ্ডল নগরকে কহিলেন, আর এক কথা, ঐ মাইয়াডিরে তোমার ছাড়তে হবে।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নগরবাসী বলিল, বেশ ছাড়ব,—যদি মাতব্বররাও ছাড়েন। লোকে মহৎকে দেখেই কাজ করে। ঐ যে কটাই মশায়—রাত্রে ওকে কত মেয়েছেলের ঘরে দেখা যায়।

সভাময় একটা কলগুঞ্জন উঠিল। কটাই গর্জন করিয়া উঠিল, কি এত বড় কথা!

নগরবাসী কহিল, মেঘের মতন গুরু গুরু গর্জন ক'রলেই সত্যি কথা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। কথা বলতে পারে ঐ এক মণ্ডল মশায়। বিলের পচা জল উনি নন। ওঁর স্বভাব যেন মধুমতীর ধবল পানি।

লোচন মধু কহিল, ছাখ, গোপনে যে যা করে তাই নিয়া কোন কথা নাই। মানুষের মনের গহনে কত আগাছা জন্মে—তা উপড়াইয়া ফ্যালতে পারে কেডা? তুমি করতেছ সদরে!

নগরবাসী বলিল, ওরই বা সদর অন্দর কি আছে? কে না জানে?

কটাই কহিলেন, এই ওঠলাম, আমি যদি এর শাস্তি না দেই তা হইলে আমি পরশুরামের পুত্তুর না।

ব্যাপারটায় সকলেই মনে মনে খুশি হইয়াছিল। কটাইর বয়স ষাটের উপর, বউ-ছেলে, নাতি-নাতনীতে ঘর ভরা, কিন্তু লজ্জা নাই। রোজই রাত্রে সে বাহিরে কাটায় এবং ব্যাপারটা জানে সকলেই।

কটাই কহিলেন, এই ওঠলাম মণ্ডল মশায়, এখানে আর মান থাকল না।

অগ্নি মণ্ডল তার হাত ধরিয়া বসাইলেন। কটাই কহিলেন, সাগর ভাই, সাবধান করিয়া গ্যাও তোমার ছাওয়ালরে। কেডা না জানে যে আমার মান্য-মানত্ কত? নরাগাতির মণ্ডল বাড়ীতে আমি মাইয়া দিছি, তারা কত ধুধুর মালিক।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। কটাইর নিঃস্ব কিন্তু বনেদী এই জামাইবংশের বড়াই গ্রামের লোকের একটা উপহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। এই হাসিতে তিনি আরও রাগিয়া গেলেন। বলিলেন, ছ্যায় নগরারে চড়াইয়া।

নগরবাসী কহিল, মুখ সাম্‌লে কথা ব'ল বুড়ো।

তবে রে—বলিয়া কটাই লাফ দিয়া উঠিতেই সাগরবাসী সামাল সামাল বলিয়া কোমরে কাপড় বাঁধিতে লাগিলেন। বুকের ছাতি উঁচু করিয়া নগর বলিল, তুমি থাম বাবা, আমি এক চড়ে অর—

মণ্ডল উভয় পক্ষকেই থামাইয়া দিলেন। কটাই বলিলেন, এর একটা প্রতিকার আপনারগো করতে হবে, মণ্ডল মশায়।

মণ্ডল মুশকিলে পড়িলেন। সমাজ গোপন পাপের প্রতিকার কোন দিনই করে নাই। ইহার কিনারা করিতে গেলে অবস্থা হয় ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়ের মতন। তবু তিনি নগরকে বলিলেন, ওনারডে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে। উনি তোমার বাপের বয়সী, সম্পর্কে মাতুল।

নগর বলিল, বিচার কি শুধু আমারই হবে?

অগ্নি মণ্ডল কহিলেন, ওর বিচার করতে হয়, করবো আমরা।

বেশ, আপনি যখন বলছেন—বলিয়া নগর ক্ষমা ভিক্ষার জন্য কটাইর দিকে আগাইয়া গেলে তিনি জল হইয়া গেলেন, কহিলেন, হইছে, হইছে। তোমারগো উপর আমরা কি সত্য সত্যই রাগ করতে পারি?

অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, সাগর ভাইপো, আমারগো লগে তুমি কাল তারাইল বাবা।

মাতব্বরদের মধ্যে একজনের অসুবিধা থাকায় দিনটা পিছাইয়া দেওয়া হইল। ভিন্ন জাতীয় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলের অনুরোধে তাহাদের মধ্যে কালী সজ্জন, চন্দ্র সেখ, কালা মিয়া ও যোগীন্দ্র শীল সালিসির সময় মাঠে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যাব ম্লান ছায়া উঠানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওপারের মাঠ হইতে শোনা যায় গৃহাভিমুখী গরু-বাছুরের হাম্বা রব। খালের ঘাটে বধূরা গা ধোয়, ছেলেরা সাঁতার কাটে, পানকৌড়ি ও নইল-নইল খেলে।

অগ্নি মণ্ডল খালের ঘাটে গা ধুইয়া, ছোট একখানা ঘরে যাইয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীর পটের সামনে বসিয়া মায়ের নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুর ঘরে তাঁদের ঢুকিতে নাই, বিগ্রহ স্পর্শ করিতে নাই, তাই তিনি কলিকাতা হইতে কালীর এই পট আনাইয়াছেন। সকাল ও সন্ধ্যা ছবির সামনে বসিয়া ডাকেন, মা, মা।

মন্ত্র নাই, দীক্ষা নাই, মন্ত্রে নাই অধিকার, শাস্ত্র স্পর্শ করিতে নাই। এই অবিচার মধ্যে মধ্যে তাঁকে পীড়া দেয়, কিন্তু মণ্ডলের দেব-দ্বিজে ভক্তি এত প্রগাঢ় যে শেষটায় মীমাংসার একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করেন। ভাবেন, যুগ-যুগান্তের এই বিধানের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল লুক্কায়িত আছে, যাহা তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিব অতীত।

অত হিসাব-নিকাশে আমার কাজ নাই—ভাবিয়া তিনি পূজায় বসিয়া যান। নিজেরই গাছের লাল জবা ও কৃষ্ণচূড়া দিয়া মায়ের পা রাঙাইয়া দেন। বলেন, তোর ছবি ছুঁইয়া যদি পাপ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিস মা। ছাওয়ালে মায়ের শরীর নোংরা করে, মা তাতেও তো রাগ করে না।

দেবীকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া

যায়। ভাবাবেশে নিতান্তই বেসুরো গলায় কখনও কখনও গাহিতে আরম্ভ করেন—

"এমন দিন কি হবে মা তারা।"

রাজেশ্বর এক একবার স্থির করে যে, অগ্নি মণ্ডলের নিকট যাইয়া তার বক্তব্য বেশ গুছাইয়া বলিবে। কোন্‌টার পর কি বলা দরকার তাহাও ঠিক করিয়া লয়, কিন্তু মণ্ডলের সামনে যাইয়া কেমনই যেন সব গুলাইয়া যায়।

অগ্নি মণ্ডল রাগী নন, কাহাকেও একটি কড়া কথা বলেন না, কিন্তু সকলেই তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে। হয়তো কড়া কথা বলিলে অতটা করিত না।

পূর্বেও কয়েকবার মণ্ডলের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। পঞ্চায়েতের সময় সেদিনও বলিয়া আসিল, আর এক সময় আসব।

তার পরও পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল, রোজই সে দিন পিছাইয়া দেয়। প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারে না। রাজেশ্বর যে-কথা বলিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহা নিজে বলা সমাজের রীতি-বিরুদ্ধ, অপরকে দিয়াও উত্থাপন করা চলে না। লোকে হাসিবে, বলিবে, বামনের চাঁদ ধরিবার শখ।

নিজে সে যে বামন রাজেশ্বর তাহা জানে কিন্তু চাঁদ ধরার এই দুরাকাঙ্খা মন হইতে কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। মনে মনে সে এই আশা পোষণ করে আজ তিন বৎসর। সেদিন শেষটায় প্রতিজ্ঞা করিল, আজ বলবই, যা থাকে কপালে।

সন্ধ্যার কিছু পরে অগ্নি মণ্ডল খাল ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার নাম গানের পর প্রায় প্রতিদিনই এখানে আসিয়া বসেন।

খালের ওপারেই বাগণ্ডের মাঠ, মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণে ছোট্ট গ্রাম দীঘিরপাড়। দীঘিরপাড়ের বাড়ীগুলির ফাঁক দিয়া ফেরধরা ও ঘাঘরের কালো কালো গাছের সারি দেখা যায়। চাঁদিনী রাতে মনে হয়, কতকগুলি সবুজ পরী আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতেছে।

কী অপূর্ব শোভা! থৈ থৈ করে জল, চাঁদের প্রেম বুকে করিয়া মৃদু বাতাসে জলরাশি ধীরে ধীরে নাচিতে থাকে। এই জল শুকাইয়া আসিতেছে বলিয়া মণ্ডলের মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়। জমির দাম বাড়িতেছে বটে কিন্তু মণ্ডলের বাল্যকালের সে নেপালপুর আর নাই। পদ্মপাতায় ও রাশি রাশি পদ্মে বিল ভরা থাকিত। টকটকে লাল শাপলার ফুল দেখিলে দূর হইতে মনে হইত এক ঝাঁক লাল ভ্রমর পদ্মের মধু লোভে কোন্ দুর-দুরান্তর হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। নীল কমলের স্নিগ্ধ রূপে চোখ জুড়াইত। জাল ঝাঁকিয়া একবার জলের মধ্য হইতে টানিয়া আনিলেই অমন দু' চার কুড়ি কই, শিঙি, মাগুর উঠিয়া আসিত। আজকাল বছরে পাঁচ ছয় মাস ঐ মাঠের মধ্য দিয়াই হাঁটিয়া ঘাঘর যাওয়া যায়। পথে অবশ্য জল কাদা অনেক। কিন্তু মণ্ডলের ছেলেবেলায় মাঠ ভাঙ্গিয়া ঘাঘর যাওয়ার কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না।

এমনি করিয়াই সব বদলায়। তাঁর এই জীবনে কত বিল উঠিল, কত নদী বাঁকিয়া গেল। মাঝি যেখানে নৌকার পাড়ি দিতে ভয় পাইত,—সেখানে আজ তার ছেলে হাল চষে। আবার কত গাঁ, কত হাট বাজার, আকাশ-চুম্বী কত বট পাকুড়, তাল গাছ মিলাইয়া গেল জলের তলায়।

জীবনেও এমন কত পরিবর্তনই না আসে, কত গর্বী ধনী মানুষ কত সম্ভ্রান্ত পরিবার এমনই ভাবে দুর্ভাগ্যের বন্যায় ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়, আবার কত দুঃস্থ, দরিদ্র অভাবের ঘোর আবর্তের মধ্য হইতে নদীর বুকে চরের মত একটু একটু করিয়া মাথা তুলিয়া ঋদ্ধি-শ্রীতে পরিপূর্ণ হয়। জগতের ইতিহাস ইহাই। ইহাই মণ্ডলেব নিজেরও জীবন কথা।

মনে পড়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে, বিলেব জলের, সঙ্গে সাপেব সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকার ইতিহাস। কিন্তু সমস্ত স্মৃতিকে ছাপাইয়া ওঠে একখানা মুখ, একটি নারী মূর্তি। কত নারীইতো দেখিলেন, কিন্তু অমন শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী আর চোখে পড়িল না। তাঁর এই যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মান প্রতিপত্তি সকলই তাঁর স্ত্রী যাদুবালার জন্য। তিনি যেন একটা ডালিতে করিয়া শ্রী ও মঙ্গল সাজাইয়া আনিয়াছিলেন। আসিয়া লক্ষ্মীর মতন স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া কহিলেন, এই নাও।

এক একজন আছে, যারা জীবন পথে এইরূপ শান্তি ও মঙ্গল, আনন্দ ও মাধুর্য বহন করিয়াই চলে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন এই ধরনের একজন নারী।

আপনার বলিতে অগ্নি মণ্ডলের কিছুই ছিল না। বরিশালের গুয়াটোনে নয়াবাড়ীর সেনেদের জমিদারি ছিল। সেখান হইতে তাঁহারা অগ্নি মণ্ডলের পিতা শুকচাঁদ মণ্ডলকে মঞ্জরীতে আনেন। তার কিছুকাল পরেই শুকচাঁদের মৃত্যু হয়। আত্মকলহের ফলে গুয়াটোনও সেনেদের হাতছাড়া হইয়া যায়। অগ্নি তখন একেবারেই ছেলেমানুষ।

বিদেশ বিভুঁইয়ে আত্মীয় বন্ধুহীন এই বালক নিঃসহায় সেনেদের বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। এই ভূস্বামীরাই একটি গরিবের মেয়ে সঙ্গে অগ্নির বিবাহ দেন। স্বামীর সঙ্গে যাদুবালাও মনিব বাড়ীতে

কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীর মাস মাহিনা বার আনার জায়গায় পাঁচসিকা হইল। যাদুবালার কোন মাহিনা ছিল না। উঠান ঝাঁট দেওয়া, বাগান পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, গোয়াল নিকানো কাজ ছিল তাঁর নানাবিধ। বিনিময়ে দু'বেলা দু' থালা ভাত, আর ডাল তারকারীর নামে পাইতেন গামলা ও কড়ার তলায় ভুক্তাবশিষ্ট যাহা পড়িয়া থাকিত তাহার সমস্তই অর্থাৎ প্রায় দিনই ও-সবের বড় একটা বালাই থাকিত না। জোলার কাপড়ও বরাদ্দ ছিল বছরে দু'খানা। মাহিনা ছিল না তাই স্বামীর চেয়ে স্বাধীনতাও ছিল কিছু বেশী। সেনের বাড়ীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু অবসর মিলিত সেই সময় তিনি আর পাচ বাড়ীতে ধান ভানিতেন, কারও ঘরের মাটির ভিত বাঁধিয়া দিতেন, চিঁড়া কুটিতেন। কেহ দুই চারিটা পয়সা দিত। তবে বেশীর ভাগই মিলিত চালের খুদ। অগ্নি মণ্ডলের বৈভবের সূত্রপাত এই খুদকণায়।

জীবন যাত্রার এই দুর্গম পথে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না, আলস্য ছিল না। মাঝে মাঝে একটু মিষ্টি হাসিতেন। হাসিয়া স্বামীকে উৎসাহ যোগাইতেন। রূপেরও তাঁর খ্যাতি ছিল। লোকে বলিত, শুকচাঁদের ছাওয়াডা হৈল বৌ-কপালিয়া।

ছেলেরা মায়ের রূপ কিছু কিছু পাইয়াছে বটে, গুণ কেহই পায় নাই। তাঁর রূপ গুণের অধিকারিণী হইয়াছে শুধু তাঁদের ছোট সন্তান, একমাত্র মেয়ে চাঁপা। সে হুবহু মায়েরই মতন, রং না যেন কাঁঠালী চাঁপা, রূপ না যেন পদ্মফুলটি, হাসে ঠিক মায়েরই মতন। তার নিবিড় কালো চোখের তারকায় যেন বিজলী হানে। বয়স পনর ষোল কিন্তু তার চেয়ে একটু বড় দেখায়। দেহ-মন বসন্ত সন্তারে দিন দিন যতই পুষ্পিত হইয়া উঠে, গতিভঙ্গী ততই মন্দালস হয়। প্রায়ই সম্বন্ধ আসে, ঘর বর সবই ভাল। সুন্দরী মেয়ে, পিতা অবস্থাপন্ন,

অনেকেই তাই আগ্রহ করিয়া নিতে চায়। কিন্তু সম্বন্ধ আসিলেই বৃদ্ধ বিলম্বের একটা অজুহাত বাহির করেন। ছেলেরা তাগিদ দিলে বলেন, একটা ত' মাইয়া, থাউক আর কিছুদিন ঘরে।

গ্রামে উপযুক্ত পাত্র নাই, মেয়েকেও দূর দেশে পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না। চাঁপা চলিয়া গেলে কে তাঁকে দেখিবে? বধূদের স্বামী পুত্র আছে, কাজও অনেক। রাশি রাশি ধান ভানা, ধান শুকাইয়া গোলায় রাখা, চাল চিঁড়া কোটা, কাঠ শুকানো, গো-সেবা। প্রায়ই অতিরিক্ত কৃষাণ খাটে, ভোরে তাদের ও বাড়ীর সকলের পান্ত ভাত যোগাইতে হয়, দুপুরে মাঠে ভাত পাঠাইতে হয়, বৈকাল না পড়িতেই আবার রান্নার যোগাড়।

বধূরা চারটিতে সমান খাটিতেও পারে না। বড়টি কর্মপটু বটে কিন্তু বছর না ঘুরিতেই তার কোলে একটি করিয়া সন্তান আসে। মেজ ও ছোট রোগা। সেজটি কাজে চট্‌পটে বটে কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের ভয়েই সকলে অস্থির। গ্রামেই তার বাপের বাড়ী, সপ্তাহে তিন চার দিন নানা ছুঁতা করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায়। তাই চাঁপার দরকার। চারিটি বধূতে মিলিয়াও তার মত কাজ করিতে পারে না।

অথচ কন্যা-সন্তান, পরের ঘরে তাহাকে পাঠাইতেই হইবে। না পাঠাইলে পিতার অসম্মান। অগ্নি মণ্ডল ভিন্ন আর কাহারও ঘরে মেয়ে এত বড় হইলে পাঁচটা কথা উঠিত। তাঁদের নামেও হয়ত ওঠে, কে জানে?

বৃদ্ধ এই সব ভাবিতে ভাবিতে মুখ তুলিয়া দেখেন, সামনে দাঁড়াইয়া রাজেশ্বর। তিনি বলিলেন, কে রাজু না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সমাচার কি?

রাজেশ্বর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, সেদিন কইছিলা, কি যেন কবা। কও দেখি বার্তাডা।

রাজেশ্বর ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিল, আজ্ঞে, আপনার মেয়ে চাঁপা, ঐ চাঁপার কথা।

কি কথা চাঁপার ?—মণ্ডলের কণ্ঠস্বরে একটু ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইল।

আজ্ঞে, আমি ওকে বিয়ে ক'রতে চাই। যদি ওকে দেন—বক্তব্যটা শেষ করিয়া রাজেশ্বরের বুক যেন হাল্‌কা হইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভাবিল, কি হাস্যকর প্রস্তাব। কোথায় অগ্নি মণ্ডল, চার ভিতে যাঁর চারখানা টিনের ঘর, দশ বারটা হালের গরু, গাই পাঁচ' সাতটা, তারাইলে বলতলীতে, পাতিয়ার বিলে—প্রায় একশ বিঘা যাঁর চাষের জমি আর কোথায় সে, গরিব রাজেশ্বর মল্লিক, দু' কুড়ার বেশি যার জমি নাই, একটা ভাই পর্যন্ত নাই পিছনে দাঁড়াইবার।

মণ্ডল প্রায় একদণ্ড চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। কি যে ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন।

রাজেশ্বরের ভয় হইল। নিজে বলিয়া সে হয়ত ভুল করিয়াছে। আবার মনে হইল বৃদ্ধ হয়ত শুনিতেই পান নাই। অথবা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সে মনে মনে ডাকিল, মা দুর্গা, মা শীতলা, বাবা সত্যপীর তোমরা মণ্ডলের জিহ্বায় এসে ব'স।

খানিকক্ষণ পরে অগ্নি মণ্ডল কহিলেন, অর কত সম্বন্ধ আইছে জান, আমার চাঁপার ?

রাজেশ্বর নীরব।

মোল্লারচকের গিরি মণ্ডল, বিপিনদহের ঘারের ডাক্তার বাবু, কত বড় মানুষেই নিতে চাইতেছেন অরে।

রাজেশ্বরের কানে গেল দুইটি শব্দ, গিরি মণ্ডল আর বিপিনদহের ডাক্তার। দুজনেই তাদের সম্প্রদায়ের বিখ্যাত লোক, নাম জানে সবাই।

২

একটু পরে অগ্নি মণ্ডল কহিলেন, মাইয়া আমি অত দূরে দেব না। বড় লোকে আমার বিশ্বাসও নাই। মানষের ধনী-দরিদ্দির হইতে কতক্ষণ? আমি বুঝি হাত আর বরাত—বলিয়াই বৃদ্ধ নিজের ডান হাত উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন,—এই হাত। মা লক্ষ্মী যদি বৈমুখ না থাকেন তা হৈলে বাহুর বলই সেরা বল। আচ্ছা তুমি একখানা ঘর করছ না?

রাজেশ্বর যেন একটু আশ্বস্ত হইল। সে কহিল, পুরনো ঘর ছিল, সারিয়েছি।

অগ্নি মণ্ডল হাসিয়া বলিলেন, শালের খুঁটি দিছ, নতুন বাতা মাক্তা, খড় কুটা—সবইত তোমার কেনতে হৈছে। প্রাচীন খালি মাটির পোতাড়া।

রাজেশ্বর কোন উত্তর করিল না। মণ্ডল হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি চাই তোমারই মতন একজন, যে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। তোমার বুকের ছিনায় বল আছে, চেহারাও কান্তিমান, বয়স বছর বাইশ হবে। এর মধ্যে তুমি ঘর করছ, দু' কুড়া জমি কেনছ।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এবার ক্ষীণ হইয়া আসিল। তিনি আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন, স্বভাবও তোমার ভাল, তোমার বাবা আলোকও ছিল খাসা মানুষ, আমারগো কত ছোট। অকালে চলিয়া গেল।

রাজেশ্বর উৎসাহের সহিত এতক্ষণ গাছের ছাল খুঁটিতেছিল। বেদনা বোধ হওয়ায় লক্ষ্য করিয়া দেখিল দুইটা আঙুলের নখের ডগা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

মণ্ডল কহিলেন, এক বছরের মধ্যে তুমি আমারে দেড়শ টাকা দেবা। তা হৈলে চাঁপার লগে তোমার বিবাহ দেব। আর, এক বছর এ বাড়ীর ধারেও আসবা না: বোঝলা?

রাজেশ্বর বৃদ্ধের পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, হ্যাঁ দেড়শ টাকা এনে দেব। আর, আসবও না এক বছর।

মণ্ডল কহিলেন, এইত চাই। আলোক মল্লিকের ছাওয়ালের মতনই কথা। তুমি পুরুষের মতন পুরুষ, নিজে আসিয়া মাইয়া চাইলা।

মণ্ডলের উঠানের উপর দিয়াই পথ। ফিরিবার সময় রাজেশ্বর পশ্চিম দিকের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, চাঁপা মাটির প্রদীপের সামনে বসিয়া ঝিনুকে করিয়া একটি শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছে।

কত ভাবেই না সে চাঁপাকে দেখিল, তার প্রত্যেকটি ভঙ্গীই কী সুন্দর! বন্ধু ত্রিগুণাকে রাজেশ্বর বলিয়াছে, চাঁপা যেন পটে আঁকা পাশ পুতুলটি। দুর্গা প্রতিমার পাশের লক্ষ্মী সরস্বতীরই মতন চাঁপা এতদিন রাজেশ্বরের কাছে ছিল একটি দূরের বস্তু। আজ সে তাকে দেখিল নূতন দৃষ্টি দিয়া। গাঁয়ের সেরা মেয়ে চাঁপা, একদিন ও তো তাহারই হইবে। ঐ যে বাহু যুগল—ভাবিতেই সে কী আনন্দ! বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া ওঠে, বাহুতে জোর পায়, মনে হয় সামনের ঐ গাছগুলি সে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে।

খালের ওপারে তার বাড়ী, খানিকটা দক্ষিণে মঞ্জরীর খালের বড় সাঁকোটা পার হইয়া যাইতে হয়। এতদিন যে সব দেবতাকে ডাকিত, যাঁরা তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন, সে তাঁদের মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম সারিয়া বাড়ী ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম প্রহরের বাজ-কুড়াল ডাকিয়া উঠিল। রাজেশ্বর ঐ পাখীর উদ্দেশে বলিল, আমার বাসনা পূর্ণ কর পক্ষীরাজ, আমি তোমায় দুধ কলা দেব।

বন্ধু ত্রিগুণাকে খবর দেওয়া হইল না বলিয়া মনটা খচ্‌খচ করিতে লাগিল। কিন্তু তখন রাত বেশী হইয়াছে। কাল ভোরে পীরের দরগায় প্রণাম সারিয়া তার ওখানে যাইবে।

আনন্দের প্রথম আবেগ কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার কথাটা বড় হইয়া উঠিল। তাদের সমাজে মেয়ের পণ মাত্র বাহান্ন টাকা, কিন্তু মণ্ডল চাহিলেন দেড়শ’। অন্য মেয়ের পণ বাহান্ন হইলে চাঁপার

অন্ত পাঁচশ টাকা চাওয়াও কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু এই দেড়শইত' যোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব। জমির আয়ে জমির খরচা, খাজনা এবং নিজের অন্ন সংস্থান হইয়া একটা আধলাও উদ্বৃত্ত থাকে না। অন্ত আয়ের সময়ই বা কোথায়? মাটির বুকে ফসল ফলাইতেই প্রচুর শ্রম করিতে হয়। পৌষে আমন ধান কাটে, ধান ঝাড়িয়া শুকাইয়া গোলায় তুলিতেই মাঘ, ফাল্গুন কাটিয়া যায়, তার উপর আবার দল-টানা।

বর্ষাকালে মাঠের জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানের গাছ বাড়িতে থাকে। জলের উপর মাথা তুলিয়াই তাকে বাঁচিতে হয়। বাঁচিয়া থাকার এই প্রয়াসে কোথায়ও গাছগুলি দশ পনর হাত লম্বা হয়। ধান কাটার পর গাছের গোড়ার যে অংশ মাঠে পড়িয়া থাকে তাহা পরিষ্কার করার নামই দল-টানা।

চৈত্রের মাঝামাঝি একই সঙ্গে আউশ আমনের বীজ বোনে। শ্রাবণে হয় আউশ। যাদের জমি অল্প তাদেরও জমি নিড়াইতে ভাদ্রের দশ বার দিন কাটে।

রাজেশ্বর অক্লান্ত খাটে। গ্রামে সেই একমাত্র কৃষক যে জমিতে রীতিমত সার দেয়। কিন্তু মাটি উর্বরা নয়, তাই দুই ফসলে মিলিয়া বছরে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মন ধান হয়। আর হয় ঘুঘরাহাটির বিলে পাঁচ সাত টাকার হোগলা।

সব কাজ একা করা চলে না, লোক চাই। রাজেশ্বরও পাঁচজনের সাহায্য নেয়; বিনিময়ে তাদের কৃষাণ খাটিয়া দেয়। কখনও বা টাকা দিয়া কৃষাণ রাখে। মানুষটা অসাধারণ পরিশ্রমী। চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, ঘরামীগিরি করিয়া, নৌকা বাহিয়া, কাঠ কাটিয়াও বছরে বিশ ত্রিশ টাকা রোজগার করে। ঘর করিয়াছে, হাল গরু কিনিয়াছে, সবই ঐ টাকায়। ঘর তুলিয়া পাঁচজনের প্রশংসা পাইয়াছে।

অমন যে কটাই মহাশয় তিনিও বলেন, ছাওয়াল বটে এক খান রাজুয়া মল্লিক, এর মধ্যে শালের খুঁটি দিয়া ঘর করছে, চৌকাঠ দিছে সেগুনের, আর করবেই বা না কেন? নেশা ভাঙ্ তো কিছু নাই, যা একটু ঐ তামুক। তা না খাইলে কাজ করবেই বা কিসের দমকে? জোয়ান মানুষ, মধ্যে মধ্যে একটু উরুক্ষু হৈতে হবে ত।

সব ছাড়িয়া কেরায়া নৌকা বাহিলে হয়ত দেড়শ টাকা যোগাড় হইতে পারে, কিন্তু তা'তে আজ বাগেরহাট, কাল পিরোজপুর, পরশু গৈলা এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, ইহাতে ঘরবাড়ী রক্ষা করা অসম্ভব। মালিক বেশী দিন অনুপস্থিত থাকিলে লোকে ঘরের বেড়া পর্যন্ত খুলিয়া নেয়, জমির আল ভাঙ্গিয়া দুই হাত বেশী দখল করে, ধানের খেতের উপর দিয়াই পথ পড়িয়া যায়। নিজের সামান্য একটু সুবিধা, একটু পথসঙ্কোচের জন্য নির্মম ভাবে পরের সোনার ধানগুলিকে দলিয়া, পিষিয়া চলে। রাজেশ্বর ভাবে, মানুষ এত অবুঝ হয় কেমন করিয়া?

তার মনে পড়ে চালানী কারবারের কথা, লাভ তা'তে অনেক। বেশীদিন বিদেশে থাকিতে হয় না। মধ্যে মধ্যে গেলেই চলে।

আর কয়েকদিন পরে কাঁঠালের সময় যশোরের কাঁঠাল আনিয়া বেচিতে পারিলে লাভ যথেষ্ট। তারপর পূজার সময় বরিশাল হইতে নারিকেলের চালান, যদি সম্ভব হয় সঙ্গে সুপারি। সুপারির কাজে লাভ সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু এর জন্য দরকার নগদ টাকার, দরকার একজন মানুষের আর একখানা নৌকার। এই টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। রাজেশ্বর শেষটায় স্থির করে, কাল প্রাতে এই সম্বন্ধে সে ত্রিগুণ ভাইর সঙ্গে পরামর্শ করিবে, লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক মানুষ, একটা পথ সে বলিয়া দিবেই।

টাকা মাত্র দেড়শ', উহা শেষ পর্যন্ত যোগাড় হইয়া যাইবে। তার ও চাঁপার মধ্যে ব্যবধান মাত্র দেড়শ' টাকার। মা কালী কি তাহা দিবেন না? নিশ্চয়ই দিবেন।

এই আশা বুকে করিয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

রাজেশ্বরের খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শুইলেও অতি প্রত্যুষে কাজী বাড়ীর আজানের সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কী মধুর ঐ শব্দ! মৌলবী ইসলামের ভক্তদের আহ্বান করিতেছেন, পবিত্র হজরতের অনুগামিগণ, আল্লাহ্ তল্লার নামে এখানে আসিয়া মিলিত হও।

রাজেশ্বর আজানের অর্থ জানে না কিন্তু বড় মিষ্টি লাগে, প্রভাতে পাখীর গুঞ্জনের মতই মধুর অথচ উদাত্ত গম্ভীর।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সূর্য প্রণামের জন্য সে যখন মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল তখনও সূর্য ওঠে নাই। পুব আকাশ জুড়িয়া অরুণ বর্ণচ্ছটা তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটের রক্ত তিলকের মতন জ্বল জ্বল করে। রাজেশ্বর প্রায় এক মিনিট কাল মাথা নোয়াইয়া নিখিল চরাচরের প্রাণশক্তির উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করিল, তারপর চলিল সত্যপীরের দরগা'র দিকে।

মঞ্জরী ও দীঘিরপারের মাঝখানে ঝরঝরিয়ার ভিটায় পীরের পৈঠান। আশে পাশের হিন্দু মুসলমান এখানে শিন্নি দেয়। তাদের বিশ্বাস পীরের দয়া হইলে সকল মনস্কামনাই পূর্ণ হয়। রাজেশ্বর দরগার সামনে যাইয়া বলিল, পীর সাহেব, আমার বাসনা পূর্ণ কর।

সে যখন ত্রিগুণাদের বাড়ী পৌছিল তখন ত্রিগুণার ভ্রাতৃবধূ উঠানে গোবর জল ছিটাইতেছিলেন। রাজেশ্বরকে দেখিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ত্রিগুণার মা জবাফুল তুলিয়া ঝাঁপি হাতে ঘরে ফিরিতেছেন। বৃদ্ধা বিধবার পরিধানে পট্টবাস, লম্বা দোহারা গড়ন, বয়সের ভারে শরীর এখনও নুইয়া পড়ে নাই। গায়ের রং কালো হইলেও তাঁর উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তিনি বলিলেন, বাবা রাজু, কেমন আছ ?

ভাল আছি মা ঠাকরুন।

ত্রিগুণাত' এখনও ওঠেনি। কাল আবার সারা রাত্তির জেগে পড়েছে। উঠতে দেরি হবে। ডেকে দেব ?

না, আমি একটু বসছি।

বৃদ্ধা পুত্রবধূকে বলিলেন, তোমার দেওরকে বসবার আসন দাও।

রাজেশ্বর বলিল, থাক্, বৌঠাকরুন। হাতের কাজ ফেলে আপনাকে আসন দিতে হবে না।

ত্রিগুণার মা বলিলেন, তা কি হয় বাবা, ওটা যে আরও জরুরী।

খানিকটা পরে, "নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়"—সুর করিয়া এই স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে দীর্ঘ ঋজুদেহ শ্যামবর্ণ একটি যুবা রাজেশ্বরের সামনে আসিয়া বলিল, অনেকক্ষণ তোমায় বসতে হয়েছে রাজু। উঠতে বড় দেরি হয়ে গেল।

তাতে আর কি ?

একটু বসো ভাই, ঘাট থেকে মুখ ধুয়ে আসি।

আমি পুকুর পাড়েই বসব'খন। চল যাই তোমার সঙ্গে।

ঠাকুর ঘরে নারায়ণশিলা, লক্ষ্মীর বিগ্রহ ও মনসার ঘট আছেন। ত্রিগুণা সেখানে প্রণাম করিল না। চণ্ডীমণ্ডপেও নয়। প্রণাম যে করিবে না,—রাজেশ্বর তাহা জানিত, তবুও সে ক্ষুণ্ণ হইল। কেহ বলে, ত্রিগুণা খৃষ্টান হইয়াছে, কেহ বলে ব্রাহ্ম! খৃষ্টান যে কাহাকে বলে রাজেশ্বর তাহা জানে, সে বোঝে যে ত্রিগুণ ভাই তার খৃষ্টান

হয় নাই। ব্রাহ্ম সে দেখে নাই, শুনিয়াছে ব্রাহ্মরা ঠাকুর দেবতা, বামুন—গরু কিছুই মানে না, সকলের ছোঁয়া খায়। জাতের বাছ বিচার তাদের নাই, যাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে।

লোকে আর পাঁচ রকম নিন্দাও করে, বলে, ত্রিগুণা কোনও মাদ্রাজী মেয়ের প্রেমে পড়িয়াছে। দায়ে পড়িয়া তাকেই বিবাহ করিতে হইবে। রাজেশ্বরের দৃঢ় বিশ্বাস, উহা মিথ্যা, তার ত্রিগুণ ভাই ওরূপ নয়। তবে ঠাকুর দেবতা যে সে মানে না, ইহাত সবাই জানে।

ত্রিগুণার বাবা মানিতেন, ঠাকুরদা' মানিতেন। রাজেশ্বরের বাবার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস ছিল, অগ্নি মণ্ডলেরও আছে। ত্রিগুণার দাদা ঢাকার নবাব সেরেস্তায় কাজ করিয়া মাসে শত শত টাকা রোজগার করেন, পূজার সময় নৌকা বোঝাই করিয়া কত সামগ্রী আনেন। বলির পাঁঠাই অন্তত এক কুড়ি। তিনিও ঠাকুর দেবতা মানেন। তাঁর ছোট ভাই হইয়া ত্রিগুণা দাদার ধর্ম মানে না, ছেলে হইয়া মায়ের দেবতাকে অস্বীকার করে। রাজেশ্বরের মনে কেমন যেন খটকা থাকিয়া যায়।

এই দুজনের বন্ধুত্বের একটা ইতিহাস আছে। ত্রিগুণার ফাঁড়া ছিল। জ্যোতিষী নিবারণ ভশ্চায্যি পাতি দিলেন, কোনও নমঃশুদ্রের পুত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে রিষ্ট কাটিয়া যাইবে। রাজেশ্বর সুদর্শন, কাছে তার বাড়ী, তাদেরই প্রজা, ত্রিগুণার সে সমবয়সী। এই সব কারণে তাকেই মনোনীত করা হইল। ত্রিগুণার মা তিনরূপ-চণ্ডীপাঠ করাইয়া, নারায়ণকে তুলসী দিয়া, ভোজনদক্ষিণায় ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া রাজেশ্বরকে পুত্রের বন্ধুত্বে অভিষিক্ত করেন। আজও সে বছরে দুবার কাপড় পায়। গত বৎসর হইতে রাজেশ্বরও বন্ধু ও বন্ধুর মাকে কাপড় দেয়। বাড়ীতে ও খেতে যা' কিছু ফসল হয় প্রথমেই এই বাড়ীতে লইয়া আসে। বাড়ীর প্রথম কুমড়াটি, চালার

প্রথম লাউ, গাছের বেগুন, লঙ্কা, পেঁপে, কাঁকুড় হাতে করিয়া ছুটিয়া আসে। ত্রিগুণার মাকে বলে, আপনি প্রসাদ করে দিলে পরে খাব।

এই অর্ঘ দানে সে কী তার তৃপ্তি! মা নাই, ভাই নাই, তাহা সে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে।

ত্রিগুণা পুকুরের ঘাট হইতে মুখ ধুইয়া উঠিলে রাজেশ্বর কহিল, কাল শেষে মণ্ডল মশাইকে বলেছি।

কি বলেছ, চাঁপার কথা?

হ্যাঁ।

পারলে নিজে বলতে? বাহাদুর বলতে হবে তো তোমায়, কি বললেন তিনি?

রাজী হয়েছেন, কিন্তু টাকা চেয়েছেন দেড়শ।

দেড়শ! তোমাদের সমাজে মেয়ের পণ তো বাহান্ন টাকা।

রাজেশ্বর বলিল, কিন্তু চাঁপা তো আর বাহান্ন টাকার মেয়ে নয়, ভাই। দেখেছই ত'।

ত্রিগুণা হাসিয়া কহিল, কিন্তু মণ্ডল মশাইর অবস্থা ভাল। টাকাটা ত' ছেড়ে দিলেও পারতেন।

রাজেশ্বর কহিল, বড় মানুষের খেয়ালও বড়।

ত্রিগুণা কহিল, যাক্, এই ভাল খবর দেওয়ার জন্য তোমাকে সিকির বাজারে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ খাইয়ে আনব। চল, আগে মাকে খবরটা দিয়ে আসি।

গোপনে দিতে হবে, আর কেউ টের না পায়। মণ্ডল মশাই আমাকে তাঁর বাড়ী যেতেও নিষেধ করেছেন, আর সময় দিয়েছেন এক বছর।

অত দেরিতে কাজ কি? টাকাটা মার কাছ থেকে নিয়ে আষাঢ়েই বিয়ে করে ফেল না।

তা' নয়, নিজে রোজগার করে তাঁকে দিতে হবে—মণ্ডল মশাই তাই চান।

এই সময় ত্রিগুণার ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণ আসিয়া কহিল, ছোট কাকা ঠাকুরমা তোমাকে আর রাজু কাকাকে জল খাবার খেতে ডাকছেন।

ত্রিগুণার মা তাদের মুড়ি, দুধ, গুড় ও আম দিলেন। রাজেশ্বর বন্ধুর সঙ্গে বৈঠকখানায়ই খাইতে বসিয়া গেল।

আগে আগে সুখদাসুন্দরী আপত্তি করিতেন। ত্রিগুণা হাসিয়া বলিত, মা, রাজু তোমার আমার চেয়ে ফরসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওর সঙ্গে এক ঘরে বসে খাওয়ায় আর দোষ কি?

বৃদ্ধা বলেন, রাজু তো আমার ছেলেরই মতন, তবে কিনা—

ত্রিগুণা বলে, হিন্দুর সবই ঐ "তবে কিনার" পাল্লায় প'ড়ে মাটি হয়ে যায়, মা।

সুখদা সুন্দরীর এই আপত্তিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। আসল কথা, ছেলের মতি গতি দেখিয়া তিনি এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভাবেন, ছেলে যার সঙ্গে ইচ্ছা একত্রে খাওয়া দাওয়া করুক, বিশ্বাস না হইলে ঠাকুর দেবতাকেও না মানুক, কিছুতেই তাঁর আপত্তি নাই, যদি সে শুধু একটা বিবাহে সম্মতি দেয়। তাঁর ধারণা একটী সুন্দরী বধূ আনিতে পারিলে, ত্রিগুণের এই সব খোস খেয়াল দুদিনেই বাষ্পে পরিণত হইবে। বধূলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখী সকল অলক্ষ্মী বুদ্ধিও লোপ পাইবে।

কিন্তু মায়ের ব্যবস্থানুযায়ী এই মহৌষধি সেবনে ত্রিগুণা কিছুতেই সম্মত নয়। সুখদাসুন্দরীর সব চেয়ে বেশী বেদনা এইখানে। কোলের এই ছেলেটিকে লইয়া তিনি বিধবা হন। কত কষ্টই না তখন গিয়াছে। আজ সংসারের সুদিন, বড় ছেলে ইন্দুপ্রকাশ মুঠা মুঠা টাকা আনে। পূজার সময়ে ঝাড়ে লণ্ঠনে, গদি গালিচায়, অর্চনা সম্ভারে পূজামণ্ডপ ও

নাটমন্দির ছাইয়া ফেলে। পরগণার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা বিদায় লইতে আসেন। লোকে বলে, ইন্দুর মা যেন রত্নগর্ভা।

রত্নগর্ভাই বটে, মেজটিও চাকরি করে। ত্রিগুণাও দুইটা পাশ দিয়াছে, এবার আর একটা দিলেই বি, এ, হইবে, তারপর উকিল. ইচ্ছা হইলে তখন হাকিমও হইতে পারে।

কোথায় বৃদ্ধার এই সুখ আজ ষোল কলায় পূর্ণ হইবে, ছোট বৌ আসিবে, একটি লাল টুকটুকে বৌ। আর আজ কিনা ত্রিগুণা শুধু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করে না, পিতৃ-পিতামহের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করিতে চায়। মাতার দেবতাকে উপেক্ষা করে, স্বর্গত পিতার উদ্দেশে এক ফোঁটা জল, তর্পণের এক মুঠা তিল পর্যন্ত দিতে চায় না।

পণের টাকা সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে রাজেশ্বর বন্ধুর নিকট চালানী কারবারের কথা বিস্তৃতভাবে খুলিয়া বলিল।

ত্রিগুণা কহিল, মাকে টাকার কথাটা বলি তা হ'লে?

রাজেশ্বর বলিল, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। টাকার বদল আমার জমি ও বাড়ী বন্ধক লিখে দেব। রাগ করবে না তো?

তুমি আমাদের এত ছোট মনে কর, তা' ত জানতুম না।

তা নয় ভাই, জানি অনেক কিছু তোমরা আমায় দিতে পার, দিয়েছও ঢের। কিন্তু আমারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। টাকা শোধ করার আগে আমি যদি মারা যাই, আমার কি উপায় হবে তখন?

ত্রিগুণা তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজেশ্বর বলিল, আমি বলছি পরলোকের কথা। দেনা রেখে মরে গেলে একেবারে রৈরব নরক।

নরক আমি বিশ্বাস করি না।

আমি কিন্তু করি। আমাদের গুরু ভগবান ঠাকুর মশায় সেদিন বলেছেন, এক পুণ্যবন্ত মানুষ, অনেক পুণ্য সে করেছিল, বাড়ীতে অতিথি

সেবা, বামুনকে সোনা দান, ভিক্ষুককে পেট ভরে খাওয়ান, কোন বিষয়েই তার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠের দ্বারী তাঁকে সেখানে ঢুকতে দিল না।

ত্রিগুণা বলিল, কেন ?

রাজেশ্বর বলিল, শুধু এক ভাঁড় গুড়ের জন্য। গ্রামের এক মুদি তার কাছে নাকি এক ভাঁড় গুড়ের দাম পেত।

ত্রিগুণা বলিল, এত যখন তোমার ভয় তখন দিও একখানা খত লিখে।

তোমার তা হ'লে এ কারবারে মত আছে ?

কারবার আমি বুঝি না, আমি দাদার ভাই। সংসারী বুদ্ধি শুদ্ধি আমার নেই।

তা বললে শুনব কেন, তুমি দুটো পাশ দিয়েছ।

পাশ করা সোজা, সংসার করা তার চাইতে ঢের শক্ত। তা যাক্ তুমি যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে।

তুমি ভালবাস কিনা তাই বলছ।

শুধু তা নয়, তুমি নিজেকে ফাঁকি দাও না। দুনিয়াও তোমায় ফাঁকি দেবে না।

বন্ধুর প্রশংসায় রাজেশ্বরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে বলিল, বরাতও তো একটা আছে।

ত্রিগুণা বলিল, বরাত আমি মানি না।

মানবে না কেন ? আমার বাবা আলোক মল্লিক, এমন কি পাপ করেছিল, যাতে বিলের মধ্যে তাকে অমন ভাবে মরতে হ'ল ? ওষুধ না, রোজা না, পথ্য না, এক ফোঁটা জল দেওয়ার একটা মানুষ পর্যন্ত ছিল না। সাপের বিষ ক্রমে ক্রমে সব শরীরে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল।

তা বটে, ও একটা দুর্দৈব।

ঐ দৈবটাই সব। নিজেদের হাতে ত' আমাদের কিছু নাই। বাপ ঐ রকমে গেলেন। মা ছিলেন কেমন পুণ্যাত্মা তা ত' জান। তিনি মরলেন না খেয়ে। কাঁটা নটে, কচুর শাক, এ খেয়ে মানুষ কদিন থাকতে পারে? বলিতে বলিতে রাজেশ্বরের চোখের পাতা জলে ভিজিয়া গেল।

ত্রিগুণা ধীরে ধীরে বলিল, মল্লিক খুড়ী বড় কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন।

আজ রাজেশ্বরের রওনা হইবার দিন। ঘাটে দো-মাল্লাই একখানা নৌকা বাঁধা। দুইজন মাঝিতে যে ধরনের নৌকা বায় তার তুলনায় এইখানা বেশ বড় এবং নূতন। শেখ আলেপের নিকট হইতে রোজ চার আনা হিসাবে ভাড়া নেওয়া হইয়াছে। রাজেশ্বররা যাইবে দুইজন, সে আর বৃন্দাবন। বেঁটে খাটো এই বৃন্দাবন লোকটি বেশ বলবান এবং অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি। লগি ঠেলিতে এবং দাঁড় টানিতে মঞ্জরীতে অদ্বিতীয়। তবে হালে সে যাইতে চায় না। বলে, আমি হাইল ধরলে নাও যেন কেমন ঘুরিয়া যায়।

বৃন্দাবন মাসে এক টাকা মাহিনায় দাশের বাড়ীর ভুবন বাবুর কাজ করিত। রাজেশ্বর যশোহরে যাওয়ার প্রস্তাব করিলে সে একটু হাসিয়া কহিল, আমি কব কি করিয়া, কইতে পারে বউ। যাও তারডে।

বধূটি পাকা গৃহস্থ, বারখী বাঁধিয়া অর্থাৎ পরের বাড়ী ধান ভানিয়া সংসার চালায়, সঙ্গে সঙ্গে দেবর দুটিকেও পাঠশালায় পড়ায়। সে দর কষাকষি করিয়া স্বামীর মাহিনা ঠিক করিল চার টাকা। শুনিয়া বৃন্দাবন চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, করছ কি বড় বউ, একেবারে চারডা টাকশাল! সে আবার কত পয়সা?

বধূ ধমক দিল, যাও, কাজে যাও।

আরে কাজে তো যাবই।—যাহাকে দেখে তাহাকেই বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করে, চারটা টাকশালে পয়সা কতডি?

দুইশ, তিনশ, যার যেরূপ খুশি বলে।

বৃন্দাবন দুই হাত ফাঁক করিয়া জিজ্ঞাসা করে, এই এত? ওরে আমার কপাল রে। তা হৈলে ত মেলা কেলা পাওয়া যায়, পাকা পাকা রম্ভা।

কতকগুলি বাঁশের চোঙায় ও নারিকেলের মালায় হলুদের গুঁড়া সরিষার তৈল, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতি সংসার করিবার তৈজসপত্র লইয়া রাজেশ্বররা নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িবার আগে সে ত্রিগুণাকে বলিল, চললাম তোমার টাকা নিয়ে, দেখো যেন সুরাহা হয়।

ত্রিগুণা কহিল, হবে নিশ্চয়ই।

বৃন্দাবনের প্রতিবেশী জুড়ন জলে দাঁড়াইয়া হিঞ্চে তুলিতেছিল, বৃন্দাবন তাকে ডাকিয়া বলিল, আমার মাথারিরে কইও, আমি চললাম। কয়ডা পাকা কেলা রাখছিলাম তার জন্য, আর দেওয়া হইল না।

ছোট্ট ডাঙা হইতে নৌকা মঞ্জরীর খালে আসিয়া পড়ার আগে সে এক দৃষ্টে তার বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। খালে আসিলে বলিল, ভাই রাজু, তুমি একটু নৌকা বাও। আমি ঘরখানা দেখি, ঘরের পাছে বসিয়া মাথারি উত্তরের বাড়ীর মোক্তার বাবুর ধান সেদ্ধ করতেছে।

গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে রাজেশ্বরেরও কষ্ট হইতেছিল।

মঞ্জরীর বাড়ীগুলি ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়, গাছগুলি সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হয়। গোপালপুরের নীচে গাঙের উপরহইতে দেখা যায় শুধু মধু বাড়ীর পাকুড় গাছ, আর কবিরাজ বাড়ীর টিনের চালা।

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। রাজেশ্বর ছিল হালে, বৃন্দাবন দাঁড় টানিতেছিল। গাঙের সেই পরিচিত পথ। মাঝে মাঝে দুধারেই ছোট ছোট খাল বাহির হইয়া বিভিন্ন গ্রামের দিকে গিয়াছে। গাঙপারে কোথাও একটা গাছ একাকী দাঁড়াইয়া, কোথাও বা তিন চারিটা একত্রে।

নদীর উপর হইতেই কৃষকের ধানের মড়াই ও গোশালা দেখা যায়। কারও বাড়ী দেখিলে দুঃখ করে, আবার কোন কোন বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া চোখ জুড়ায়। ঘরগুলি সুন্দর, গরুগুলি পুষ্ট, শিশুদের কোমরে রূপার গোট।

কোথায়ও বধূরা স্নান করে, সাঁতার কাটিবার সময় কিশোর কিশোরী-দের কলগুঞ্জনে আকাশ মুখরিত হয়। কোন বধূ খালৈ করিয়া মাছ ধুইতে ধুইতে মাথা তুলিয়া হালে দাঁড়ানো রাজেশ্বরের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকে। তারপরই লজ্জায় জিভ কাটিয়া ঘোমটা টানিয়া দেয়। স্বল্প পরিসর কাপড়ে চোখের লজ্জা ঢাকিতে গিয়া দেহের অন্য অংশকে অনাবৃত করিয়া ফেলে।

বৃন্দাবন বলিল, এবার একটু তামাক খাইয়া লই।

তামাক খাইতে রাজেশ্বরেরও ইচ্ছা হইয়াছিল। সে কহিল, বেশ।

প্রথম কলিকা বৃন্দাবন একাই নিঃশেষ করিল। দ্বিতীয় কলিকাও খানিকক্ষণ টানিয়া কহিল, এই নেও।

রাজেশ্বর জিজ্ঞেসা করিল, আছে কিছু?

বৃন্দাবন কহিল, কৈঙ্কার যৈবনে এইত আগুন লাগল।

সেদিন ডুমুরিয়ার হাটবার, হাট তখনও পুরা বসে নাই, সবে কিছু কিছু জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাটে নৌকা রাখিয়া রাজেশ্বর তামাক সাজিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, রাখো, রাখো, তামাক সাজা ছাওয়ালপানের কম্ম না।

গাঙে স্নান সারিয়া রাজেশ্বর কহিল, হাটে গিয়ে ফুটি আর আম আনতে পারবে?

পারব, দেও পয়সা।

রাজেশ্বর বলিল, চার পয়সার আম আর দু পয়সার ফুটি।

বৃন্দাবনের মুখে হাসি ফুটিল, সে কহিল, মিষ্টু দিয়া ফুট খাবা বুঝি? ক' পয়সার আম, আর ফুটই বা কত'র?

চার পয়সার আম আর দু' পয়সার ফুটি।

খানিকটা পরে বৃন্দাবন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আরে আমার কপাল রে, পয়সাগুলি মিশিয়া গেছে। কও দেহি, কোন্ পয়সা দিয়া ফুট কেনব আর কোন্ পয়সার আম?

রাজেশ্বর চারটা পয়সা তার কাছায় বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই চার পয়সার আম। আর হাতে রাখ এই দুটো পয়সা, এই দিয়ে ফুটি কিনবে, বুঝলে ত?

বোঝব না কেন? কাছায় আম আর হাতে ফুইট।

এবার বৃন্দাবন 'কাছায় আম, আর হাতে ফুইট' বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

পাটগাতির বাজারে রান্না ও খাওয়া শেষ করিয়া তারা ঘুমাইয়া পড়িল। রাত দুপুরে বাতাস অনুকূল হইলে পাশের নৌকার মাঝি ডাকিয়া বলিল, ওঠেন মশায়রা বাতাস গোণ হইছে।

রাত্রে ডাকাতি ও রাহাজানির ভয়ে গঞ্জে ও বাজারে নৌকাগুলি সব পাশাপাশি থাকে, ছাড়েও এক সঙ্গে।

পঞ্চাশ ষাটখানা নৌকা একসঙ্গে ছাড়িয়া দিল। দলে একজন মাঝিতে বাহিতে পারে এমন ছোট নৌকা হইতে আরম্ভ করিয়া, আট শ', হাজার মনি, এমন কি দেড় হাজার মনি পর্যন্ত ভাউলিয়াও ছিল।

পরিচয় দু একদিনের, কারও সঙ্গে বা দু চার দণ্ডের জন্য। বিনিময় হয় দু এক ছিলিম তামাকের, অথবা একটু নারিকেলের ছোবড়ার। কথনও বা তাহাও হয় না কিন্তু এরই মধ্যে কেহ ভাই, কেহ চাচা বনিয়া যায়। সুখ দুঃখের, আশা নৈরাশ্যের কত কথা হয়।

চাঁদিনী রাত, মধুমতীর দুপারে ধূ ধূ করে মাঠ, বাঁ দিকে মাইলকে মাইল জুড়িয়া গিমি কুমড়ার খেত, কুমড়ার কচি কচি সবুজ ডগা সাপের ফণার মত লিক লিক করে। দূরে দেখা যায় ঘুমন্ত পল্লী।

রাজেশ্বরের মনে পড়ে মঞ্জরীর কথা, মনে পড়ে গত রাত্রের বৃষ্টির পরে ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাক। সে একটা কাচের কুপি জ্বালাইয়া তার বাগান ও ঘরের পিছন হইতেই হাতে করিয়া অন্ততঃ দু কুড়ি কৈ মাছ তুলিয়াছিল।

সামনের নৌকা হইতে একজন গান ধরিল,

ওরে ভাই গহুর নিতাই
সময় যে নাই
পাল তুইলা চল্, পাল তুইলা চল্
ঢেউয়ের নীচে
তুফান নাচে
ছল্ ছলা ছল্—ছল্ ছলা ছল্।

আর একজন ধরে,

আলতা দিয়া পা রাঙাইছ
(কার) বুকের লহু দিয়া
খয়ের চুনে ঠোঁট রাঙাইছ
(কার) ওষ্ঠের মধু দিয়া

(আমার) রাঙা দরদ সিঁদুর কইরা
পইরাছ কপালে
(আমার) নয়ান জলে বৈন্যা হৈল
সন তিরাশি সালে।

মাঝিদের ভাব-বন্যার সঙ্গে সঙ্গে পালের নৌকাগুলি তর তর বেগে বহিয়া যায়। জলের উপর ক্ষণিকের জন্য একটা দাগ কাটে, যেমন কাটে মানুষ অনন্ত কালবারিধির বক্ষে।

চোখে নেশা লাগে, চাঁদিনী রাতের নেশা, জ্যোৎস্না ধবল প্রকৃতি রুপালী জল ও মিঠা মেঠো হাওয়ার নেশা। চাঁপাকে পাওয়ার জন্য উন্মাদনাময় এই শ্রমের নেশা রাজেশ্বরের চোখে সমস্ত জগৎকেই সুন্দর ও মধুময় করিয়া তোলে।

স্বল্পবাক্ বৃন্দাবন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এবার জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাথারি কি করতেছে, কও দেহি রাজু।

শেষরাত্রে বাতাস বন্ধ হওয়ায় সকলেই পাল গুটাইয়া একটা খালের ধারে নৌকা বাঁধিল। ভোরের দিকে রাজেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বৃন্দাবনের চীৎকারে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আরে উঠো রাজু, দানো দানো!

আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় রাজেশ্বর বলিল, দানো আবার কি?

বৃন্দাবন বলিল, আরে ওঠ মশায়। গাছের পিছনে ফোঁসফোঁসানি লাগাইছে, আর কালা ধোঁয়া ছাড়তেছে, দানো, মস্ত দানো!

এই সময় ষ্টীমারের হুইসল শোনা গেল। পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, কলের নাওর ধোঁয়া দেইখ্যা ভয় পাইছ বুঝি, মশায়?

বৃন্দাবন সেকথা বোধ হয় শুনিতেও পাইল না। হুইসল শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

ষ্টীমারটা কাছেই ছিল, পরের বাঁকে। একটু পরে নৌকার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বৃন্দাবন হাসিতে আরম্ভ করিল। সে কী হাসি!

রাজেশ্বর বলিল, কি হ'ল আবার?

বৃন্দাবন বলিল, খুব মজাডাই পাইছি। যা দোল দোলাইছে যেন একেবারে চড়কের ঘুল্লি আর কি।

শ্রাবণের শেষ। বিশাল বিল জুড়িয়া ধানের খেত। মনে হয় মা লক্ষ্মী যেন তাঁর সবুজ আঁচল পাতিয়া রাখিয়াছেন। বাতাসে সেই আঁচলে লাগে মৃদু কাঁপন, তার উপর দিয়া রৌদ্র ছায়া লুকো-চুরি খেলিয়া বেড়ায়।

ঐ সবুজ সমারোহের মাঝখানটায় উপুড় করা মাটির জালার উপর বসিয়া শত শত মানুষ জমি নিড়ায়। কারও কোমর, কারও বা বুক পর্যন্ত জলে ডোবা। জালা নড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলিও ধীরে ধীরে দোল খাইতে থাকে। প্রত্যেকেরই মাথায় বাঁধা এক একটি জোংরা। হোগলার তৈরী এগুলি একাধারে ছাতা ও বর্ষাতির কাজ করে।

চাষীরা জলের উপরে বসিয়া কাস্তে দিয়া জমির আগাছা কাটে, এরই নাম জমি নিড়ানো।

রাজেশ্বরেরা পাঁচজনে জমি নিড়াইতেছিল, সে, বৃন্দাবন, তার ভাই এবং আরও দুইটি কৃষাণ। বিনিময়ে পরের জমিতে খাটিয়া দিবার তার অবকাশ নাই। জমি নিড়ান হইলেই বরিশালে যাইবে নারিকেল কিনিতে, তাই পয়সা দিয়া কৃষাণ রাখিয়াছে।

বৃন্দাবনই সব চেয়ে ভাল জমি নিড়ায়, মুখে কথাটি নাই, এদিক ওদিক তাকায় না, মাথা নীচু করিয়া একমনে কাস্তে চালাইতে থাকে। এক এক গোছা আগাছা ধরে আর শব্দ করে, হু। একরাশ জঙ্গল জড় হইলে নৌকায় তুলিয়া রাখে।

কখনও রৌদ্রে ঘামে, কখনও বৃষ্টিতে চোখ ঝাপসা হইয়া আসে, কিন্তু কাজে বিরাম নাই, যেন কলের তৈরী মানুষ। তবে মাঝে মাঝে চাই এক ছিলিম তামাক, না পাইলেই মুশ্‌কিল। তখন সে ঘন ঘন হাই তোলে, হাত পা শিথিল হইয়া আসে, বলে, রইল এই ছাতার কাজ আর বৈল এই বৃন্দাবন।

কাজ করিতে করিতে চাষীরা গল্প করে, কার গরু কতটা দুধ দেয়, কার বলদ কেমন লাঙ্গল টানে। সামাজিক পাঁচটা আলোচনা হয়, নিন্দা প্রশংসা চলে, জটিল সামাজিক সমস্যায় নিজেদের মতামত দেয়।

কেহ বা গান ধরে, রৌদ্র বৃষ্টির গান, আলো ছায়া ও সুখ দুঃখের গান—

এমন সোনার ফসল
ওরে ভাই, সোনার ফসল
ফলছিল রে জমিতে
(পড়ল) শনির দৃষ্টি, অনাবৃষ্টি
(মানষে) কেমনে পারে বাঁচিতে ?

কখনও বা

দেইখ্যা যারে ধানের শিষে
বৃষ্টি রোদের খেলা
দুই জনেতে চালছে খেতে
সোনার মুঠার ডেলা
ঐ সোনাতে কেনবে রে বউ
সোনার বরণী
সওদাগরের মতন জলে
ভাসাব তরণী
খেতে এমন সোনা!

রাজেশ্বরের খেতে সোনাই ফলিয়াছে। কিন্তু বাহিরের সোনার চেষ্টায়ও তাহাকে বাহির হইতে হইবে সোনার বরণী বধূ আনিবার জন্য।

এর আগের কথা। প্রথম বার যশোহর হইতে কাঁঠাল ও গুড় লইয়া রাজেশ্বরকে নেপালপুর পর্যন্ত আসিতে হয় নাই। পথেই পাইকারী দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাতে বেশ কিছু লাভ ছিল।

দ্বিতীয় বারে মূলধন ও লাভের টাকা দিয়া কাঁঠাল কেনে; তা'তে লাভ হয় অনেক বেশী। শনিবারে ডুমুরিয়া, রবিবারে মঞ্জরী এবং সোমবারে ঘাঘরের হাটে কাঁঠালগুলি বিক্রয় হইয়া যায়। সেই দিনই সন্ধ্যার পর হাট হইতে ফিরিয়া রাজেশ্বর ত্রিগুণাদের বাড়ী যায়। তার মাকে দুটি কাঁঠাল দিয়া বলে, এই নিন আপনার ভেট।

রাজেশ্বর আশি টাকা লাভ করিয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধা ভারী খুশি হন। সে তাঁর হাতে একশত আশি টাকা দিয়া বলে, টাকাটা রেখে দিন মা।

সুখদা পুত্রবধূদের ডাকিয়া বলেন, ও বড় বৌ, ও মেজ বৌ, দেখেছ তোমাদের দেওরের কাণ্ড। এক মাস যায় নি এর মধ্যেই এক ক্ষেপে একশ আশি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

রাজেশ্বর বলিল, এক ক্ষেপে নয়, দু'ক্ষেপের রোজগার।

আবার যাবে কবে?

এখন আউশ কাটতে হবে। তারপর আছে জমি নিড়ানো। আবার যেতে মাসখানেক দেরি হবে। এবার মনে করেছি ধান বৃন্দাবনের বৌকে দিয়ে যাব। সে চাল করে রাখবে।

বৃন্দাবন এতক্ষণ পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে একটু হাসিয়া বলিল, আমার বউ খুব ভাল ধান ভানে, বটঠাইরণ। চাউল বড় মিষ্টি হয়।

সুখদা বলিলেন, ওঃ—তোমায় এতক্ষণ দেখতেই পাইনি। ভাল আছ বৃন্দাবন?

আছি ভালই। বৌ ভালই রাখছে।

কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া ফেলিল।

সুখদা বলিলেন, তোমরা খেয়ে যাও, রাজু।

বধূদের অসুবিধা হইবে বলিয়া রাজেশ্বর আপত্তি করিল। সুখদা বলিলেন, এইত সবে ফিরছ। যোগাড় যন্তর কিছু নেই। এখন তোমায় রেঁধেই বা দেবে কে? যখন দেবার লোক হবে তখন বরং বলব না।

খাইতে বসিয়া রাজেশ্বর বলিল, ত্রিগুণ ভাই আমার দেশে থাকলে আজ বড় খুশি হত।

সুখদা কোন কথা বলিলেন না। রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, ত্রিগুণ ভাইএর খবর কি?

খবর আর কি? গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আসে নি, অথচ গাঁয়ে গাঁয়ে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছে, পুতুল পুজোয় পাপ হয়। এও আমাকে দেখে যেতে হল! সবই বরাত।

রাজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল। সুখদা বলিতে লাগিলেন, নূতন এক বন্ধু জুটেছে কলকাতায়, বিধবা বোনকে বিয়ে দিয়ে সে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে। সেই এখন ত্রিগুণার গুরু।

রাজেশ্বর বলিল, ও আবার আপনার চরণে ফিরে আসবে।

আমার কথা ভাবি না। দুঃখ হয় ওর জন্য। যদি একটা বিয়েও দিয়ে যেতে পারতুম, দেখবার তবু একজন লোক থাকত।

কনিষ্ঠ পুত্রের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধা অনেক আক্ষেপ করিলেন। রাজেশ্বর বলিল, ভাইর কিন্তু আমার ভাল হবেই।

বিদায় লইবার সময় সে ঘরের ভিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। সুখদা বলিলেন, কাল তোমার খতখানা নিয়ে যেও :

টাকা শোধ করার আগেই যদি আমি মরে যাই?

বালাই ষাট্, ও কথা বলতে নেই। তাছাড়া তোমার আশিটাকা ত' রইলই আমার কাছে।

আবারও ত' নিতে হবে, মা।

তা ত' নেবেই। কিন্তু খতের দরকার কি?

কিন্তু আমার পরকালের—

বাধা দিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, শুনেছি ত্রিগুণার কাছে সব। আমি আশীর্বাদ করি, দ্বারী কোন জায়গায় তোমার পথ অটকাবে না। এটা মায়ের আশীর্বাদ।

তারপর বড় বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, সিন্দুকে টাকাটা তুলে রাখ মা। এর মধ্যে আশিটাকা রাজুর নিজের। আমি হঠাৎ মরে গেলে একশ' আশি টাকাই ওকে দিও। ও সবই ওর।

বড়বধূ রাজেশ্বরকে শুনাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, মা আপনি মল্লিক ঠাকুরপোকে আমাদের চেয়েও বেশী ভালবাসেন।

সুখদা বলিলেন, ওর বয়স তখন সাত, সেই থেকে আমি যে ওর মা হয়ে আছি। তখন ওর কেউ ছিল না। এখন রাজুর একটি বউ দেখে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতাম।

রাজেশ্বর কহিল, মা ঠাকুরুনের ঐ এক কথা

পথে যাইতে যাইতে বৃন্দাবন বলিল, মেলা টাকশাল পাইছ তুমি।

রাজেশ্বর অন্যমনস্ক ছিল। সে ভাবিতেছিল ত্রিগুণ ভাইর কথা। মার দুঃখ সে বোঝে না কেন? অত লেখাপড়া জানে, তাকে ত' বুঝাইবার কিছু নাই।

একবার সে ত্রিগুণাকে বলে, মা যখন বলছেন, একটা বিয়ে করে ফেল না।

ত্রিগুণা উত্তর করে, শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে বিয়ে করতে আমি পারব না। ওতে আমার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া যার সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ হল না, তাকে বিয়ে করি কি করে?

আত্মার যোগাযোগ শুনিয়া রাজেশ্বর সেদিন বন্ধুর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বাড়ীর সামনে আসিয়া সে বৃন্দাবনকে বলিল, একটা কাঁঠাল নিয়ে যাও।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমার বৌরে দেবা বুঝি?

শুধু তোমার বউকে নয়, ভাইদেরও দিও।

সে বৌই দেবে। সে অন্যায় মানুষ না।

কাঁঠালের সঙ্গে রাজেশ্বর দুটা টাকা তার হাতে দিলে বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, টাকশাল আবার কিসের?

তোমার।

আমার টাকশাল!

দুবার তোমার সঙ্গে গিয়ে লাভ হল, তাই দুটো টাকা তোমায় দিতে চাই।

ও তুমি বৌরে দিও। জবাই আমার টাকশালের মালিক।

পরদিন রাজেশ্বর জবার হাতে দুটি টাকা দিলে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পাওনা নাই অথচ উপযাচক হইয়া টাকা দেয় এমন মানুষ সে আর দেখে নাই।

রাজেশ্বর কহিল, আউশ ধান কেটে তোমায় দিয়ে যাব। চাল করে রাখতে পারবে ত'?

বধূটি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

রাজেশ্বর কহিল, নেবে কত?

জবা বলিল, যা দাও। এই মানুষটির সঙ্গে দরদস্তর করিতে তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল।

রাজেশ্বর কাহারও নিকট গল্প করে নাই কিন্তু ছোট্ট গ্রামে তার সাফল্যের কথা নানাভাবে পল্লবিত হইয়া রটিয়া গেল। প্রায় সকলেই

-তার লাভের অংশ ফাঁপাইয়া তুলিল। কেহ বলিল, রাজেশ্বর দু' ঘড়া টাকা পেয়েছে সীতারামের মামুদপুরের ভাঙা দালানের মধ্য থেকে।

তার জমির পাশেই কটাই মহাশয়ের জমি। জমিতে তারা সে রকম খাটে না, ফসলও অল্প হয়। সেদিন কটাইয়ের পুত্র গড়ুই ও তার বন্ধু জব্বর জমি নিড়াইতেছিল। গড়ুই ডাকিয়া বলিল, রাজু তোমার জমিতে সোনা ফলছে।

জব্বর কহিল, রাজু ভাগ্যবন্ত পুরুষ, ওনার উপর পীরপয়গম্বরের দোয়া কত!

গড়ুই কহিল, কলস ভরতি মোহর ওনার। উনি ত' এখন ভদ্রস্থ।

নিজের টাকার এই অপবাদে রাজেশ্বর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিল। গড়ুই কহিল, তোমার লগে কথা ছিল। শোনবা কখন?

এখনও বলতে পার।

সে পরে হবে। তোমার বাড়ী যাইয়া কব।

সমস্ত দিন রৌদ্র-বৃষ্টিতে খাটিয়া রাজেশ্বর সেনের বাড়ীতে রামায়ণ শুনিতে গিয়াছে। পুত্রের অসুখের সময় গিন্নি সেন মানত করিয়াছিলেন ছেলে আরোগ্য হইলে রামায়ণ-পাঠ দিবেন।

পাঠ চলিতেছে আজ সাত দিন, সঙ্গে ব্যাখ্যা। পিতলের থালা, তার উপর একটি লণ্ঠনের মধ্যে কাচের গেলাসে রেড়ির তেলের আলো। চার ভাগের তিন ভাগই জল—উপরে সিকি আন্দাজ তেল। পাশেই কথক ঠাকুরের আসন। সামনে গালিচায় ঢাকা জলচৌকির উপর চর্বিবাতি জ্বলিতেছে। আর একধারে ধূপদানি হইতে উঠিতেছে

ধুনার নীলাভ শিখা। আট দশ বছরের একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে-ধুনচিতে ধুনা দেয়, দিয়াই এদিক ওদিক তাকায়। দেখে, তার কাজ কেহ লক্ষ্য করে কিনা।

কথকের সামনেই ভদ্রলোকদের আসন, একটু দূরে নিম্নশ্রেণীর জন্য একটা হোগলা বিছানো, আর এক পাশে মেয়েরা বসিয়া আছেন। মোট শ্রোতা পঞ্চাশ জনের উপর।

কৃষ্ণ শিরোমণি খ্যাতনামা কথক। সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, স্থূলবপু এবং একটু স্থূলোদর, দেখিলেই মনে হয় জীবনযুদ্ধে তরী কখনও চরায় ঠেকিয়া যায় নাই। তিনি সুর করিয়া বলিতেছেন, কী নবজলধর রূপ যেন কচি দূর্বা। দেখলে চোখ জুড়ায়। রামচন্দ্রের কী নধর কান্তি!

তারপরই আরম্ভ হয় গান—

যত দেখে আরও চায় নাহি ফেরে চোখ
রাম লক্ষণেরে দেখি মিথিলার লোক
আহা মিথিলার লোক
ভুলিলা যতেক দুঃখ, যত ছিল শোক
কহিল বাঁচাও প্রভু, তরাও ভুলোক।

অর্থাৎ ভুলোকের বন্ধন থেকে মুক্তি চাইল।

সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীভগবানের দর্শন, চোখ আর ফিরতে চায় না। দীর্ঘ বিরহের অবসানে কান্তা যেমন কান্তের দিকে চায়, ঠিক তেমনিভাবে মিথিলার নিখিল নরনারী দেখে সেই স্নিগ্ধশ্যাম তেজঃপুঞ্জ, ভাবে দশরথাত্মজের অপার মহিমার কথা।

মহিমা অপার, তাঁর মহিমা অপার

তাই বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি—

গুণ গান নানা ছন্দে ত্রিপদী পয়ার।

আহা হা প্রভু রামচন্দ্র! শ্রোতারা বলিয়া ওঠে, আহা-হা। প্রভুকে তারা যেন প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ভক্তিগদ্গদ চিত্তে কেহ বলে, দয়াল হরি। কারও চোখ জলে ভরিয়া যায়।

রামচন্দ্রের রূপের ব্যাখ্যা হইতেছে এমন সময় কটাই ও গড়ুই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা পুত্রের আকৃতি একই রূপ। বেঁটেখাটো, মোটাসোটা, ঘাড় একরূপ নাই বলিলেই হয়। গিরি সেন কহিলেন, ব'স কটাই, ভাল আছ ত'?

হ' আজ্ঞা। এখন বসার সময় নাই। আর একদিন আসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে রাজু। ওঠতে পারবা?

পাশেই রাজুর বাড়ী। সে তালের ডোঙায় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কটাই মহাশয়েরা আসিলেন নিজেদের নৌকায়। রাজেশ্বরের বাড়ী আসিয়া কটাই কহিলেন, গড়ুই কৈল্কাটা একটু ধরা।

রাজেশ্বর বলিল উনি কেন? আমি দিচ্ছি।

কটাই কহিলেন, তামাক সাজত' তোমার বাপ, কী খাসা! আমি আইলেই কইত, কটাইদা, তোমার মতন লোকরে তামাক সাজিয়া দিলেও পুণ্য হয়।

তামাক খাইতে খাইতে মৃত আলোক মল্লিকের আরও অনেক প্রশংসা করিয়া কটাই কহিলেন, নরাগাতিতে আমি মাইয়া দিছি, তা ত' জান।

রাজেশ্বর বলিল, সে আর না জানে কে?

তা জানবাই ত'। যেমন বর তেমন ঘর, তারগো বলদই অমন দুই চার কুড়ি।

নরাগাতির মণ্ডলদের গল্প রাজেশ্বর এর আগেও শুনিয়াছে। কিন্তু বলদের প্রসঙ্গ এই প্রথম।

কটাই কহিলেন, আমার মাইয়ারা বড় ভাগ্যবন্ত আর রূপবানও

বটেক। দেখছুইত'। নরাগাতির মাইয়ার চাইয়াও আমার ছোট মাইয়ার মুখের ছিরি-ছাঁদ ভাল। তবে রংটা যা একটু ক্রেষ্ট। আমি ঠিক করছি তার লগে তোমার বিয়া দেব।

রাজেশ্বর প্রমাদ গণিল। এ কী বিপদ। তাকে নীরব দেখিয়া কটাই বলিলেন, তুমি মত করবা তা জনতাম। তুমি হইলা বুদ্ধিমন্ত ছাওয়াল। আমার অভিলাষ কাজটা ভাদ্রেই হোক। বুড়া হইছি, কবে আছি কবে নাই। মাইয়ার বিয়া দেখতে পারলে শান্তিতে যাইতে পারতাম।

রাজেশ্বর বলিল, আজ্ঞে আমায়—

ওঃ, একটু লজ্জা করতেছে বুঝি? তাত' হবেই। বাপ মা থাকলে এ লজ্জায় তোমায় ত' আর পড়তে হৈত না।

তা' নয়, আমার অসুবিধা আছে।

বেশ, তা' হৈলে পূজার পরেই হবে।

মাফ করবেন, আমি পারব না।

কটাই নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কী! টাকার এত গরম? কালকের শিশু, নিঃস্ব রিক্ত রাজেশ্বর দুটা পয়সা হইয়াছে বলিয়া আজ পরশুপাম মহাশয়ের নাতনি, কটাই মহাশয়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তিনি বলিলেন, এ কও কি তুমি? আমার মাইয়া—

রাজেশ্বর বিনিত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, সম্বন্ধ আমার হয়ে গেছে।

ফেরৎ দেও সেখানে। টাকা আমি চাই না। বরং দশ কুড়ি টাকা দেব।

রাজেশ্বর বলিল, সেখাসে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, এখন আর ফেরৎ দেওয়া চলে না।

ফেরৎ দিতে তোমার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা থাকলে কি কোন কাজ আটকায়? হেঃ হেঃ—

রাজেশ্বর নীরব।

কটাই পুত্রকে বলিলেন, চল গড়ুই, আমরা উঠি। এখানে থাইক্কা কোন লাভ নাই, বলিয়াই তিনি উঠিলেন।

রাজেশ্বর তাকে আর বাধা দিল না। তার কানে গেল কটাই বাহিরে যাইয়া পুত্রকে বলিতেছেন, নতুন টাকা হইছে কি না, মা টাকেশ্বরীর কারখানা আর কি—

চির পরিচিত প্রভাতের রূপ, পূব আকাশের অরুণ আলো, পাখীর কলগুঞ্জন সবই আজ রাজেশ্বরের কাছে নূতন বলিয়া মনে হয়। সবই যেন আনন্দময়। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে আকাশের নিবিড় নীলিমাকে, ধরণীর ধূসর ধূলিকে। এ এক অভিনব উপলব্ধি। একি চাঁপার আগমনীর আভাস ?

রাজেশ্বর ঘর ও উঠান ঝাঁট দিল, গোবর দিয়া বারন্দা ও ঘর নিকাইল। এ সব কাজ মেয়েদের মতন পরিপাটিভাবেই সে করে। অভ্যাস বহুদিনের। কিন্তু আজই এ পালার শেষ। কাল আর একজন আসিয়া তার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইবে, তার ঘুম ভাঙ্গার আগেই গোবরজল ছিটাইবে, ঘর নিকাইবে। সে উঠিয়া দেখিবে সব ফিটফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাত্রেই কাঁচা হলুদ, সরিষা ও চালের পিটুলি বাটিয়া রাখিয়াছিল। উহা গায়ে মাখিয়া খুঁধুলের খোসা লইয়া এবার চলিল ঘাটের দিকে। গা ঘষিতে ঘষিতে কেমন যেন লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, মনে করে এই আয়োজন সুন্দরী চাঁপার জন্য! কিছুদিন যাবৎ চাঁপাকেই তার যত লজ্জা, যত সঙ্কোচ। দিন সাতেক আগে কন্যাপণের দেড়শত টাকা অগ্নি মণ্ডলের হাতে দিয়া চাঁপার কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজেশ্বর যখন তাদের উঠান দিয়া ফিরিতেছিল তখন কানে বাজিল নূপুরের নিক্কন, মাটির উপর পা-ফেলার কোমল মৃদুশব্দ। চোখ একবার তুলিলেই চাঁপাকে দেখিতে

পাইত, কিন্তু মাথা নীচু করিয়া যেমনটি সে আসিয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবেই মাটির দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। তার এই সলজ্জভাব দেখিয়া চাঁপা হাসিয়া ফেলিল।

অগ্নি মণ্ডলের সঙ্গে কথা ছিল এক বৎসরের কিন্তু রাজেশ্বরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ছয় মাসের মধ্যেই টাকার জোগাড় হয়। তার এই সাফল্যে অগ্নি মণ্ডল অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। মেয়েকে বলেন বাপের বেটার কারবার। পাঁচটা গ্রাম খুঁজিয়াও এ রকম আর একজন মেলবে না।

চালানি কারবারের জন্য গঞ্জে গঞ্জে ঘুরিবার সময় রাজেশ্বর সুবিধা মতন সুন্দর দেখিয়া লেপ, তোষক প্রভৃতি শয্যার সব সরঞ্জামই কিনিয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যবহার করে নাই। আগের মতন হোগলা মাদুর ও কাঁথা দিয়া চালাইয়াছে। যার জন্য এই আয়োজন সে আসুক তারপর হইবে শয্যার ব্যবহার। বৃন্দাবন বলে, লেপ, তোষক কেন, বিয়া করবা বুঝি? রাজেশ্বর বলে, কেন, তোষকে কি আমি শুতে পারি না? বৃন্দাবন উত্তর করে, নরম জিনিস মাইয়াগোই মানায় ভাল। তারাও কেমন নরম।

আজ রাজেশ্বরের বিবাহ। সমস্ত দিনটা কাটিল আশা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে। উৎকণ্ঠা যে কিসের তাহা সে নিজেই জানে না কিন্তু ভয়-সঙ্কোচ মিশ্রিত এই আনন্দ কাঁচা-মিঠা আমেরই মতন ভাল লাগে।

দুপুরের কিছু পরে রাজেশ্বর বৃন্দাবনের বাড়ী যাইয়া তার স্ত্রীর হাতে তিনখানা ধুতি ও একখানা শাড়ী দিল। বিলাতী মিলের ধুতি এ অঞ্চলে নূতন চলন হইয়াছে। লোকের ভারী ঝোঁক এই ধুতির উপর। শাড়ীখানা গ্রামেরই ক্ষেরণ কারিকরের তৈয়ারী, সাদা জমির উপর নীল চেক। জবা বেশ খুশি হইল কিন্তু বলিল, এ আবার কিসের জন্য?

রাজেশ্বর বলিল, ওরা ভাইরা এই কাপড় পরে আমার সঙ্গে যাবে, আর তুমি কাল এই শাড়ী পরে নতুন বৌকে ঘরে তুলবে।

জবা অনুযোগের সুরে কহিল, কত আর করবে তুমি আমাদের জন্যে?

রাজেশ্বর বলিল, এ আর কি দিলুম, আমার সবই ত' হয়েছে বৃন্দাবনের দৌলতে।

জবা বলিল, কি রকম?

সে না থাকলে কারবারই চলত না।

এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জবা তার মুখের দিকে চাহিল।

রাজেশ্বর বলিল, ভারী খাঁটি মানুষ তোমার এই বৃন্দাবন। ওর উপর টাকা পয়সায় ভার দিয়ে আমি গঞ্জে গঞ্জে মাল খুঁজে বেড়িয়েছি। অন্য কাউকে অতখানি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

জবা বরাবরই শুনিয়াছে তার স্বামী নির্বোধ, অপদার্থ, সেও যে কাজে লাগিতে পারে এবং মানুষ হিসাবে তারও যে একটা মূল্য আছে, ইহা শুনিয়া তার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

ত্রিগুণার বাড়ীতে তার মা ও বৌদিদিরা ধানদুর্বা দিয়া রাজেশ্বরকে আশীর্বাদ করিলেন। ত্রিগুণার মা বলিলেন, কাল বৌ এলে আমরা যাব।

ত্রিগুণার মার কাছে তার টাকা থাকিত। রাজেশ্বর তাঁর নিকট হইতে আজ রাত্রির খরচের জন্য দশটি টাকা লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরশু খাওয়াতে কত লাগবে?

বিশ পঁচিশ টাকা। জ্ঞাতি কুটুম্বদের শুধু বলেছি। লোক অল্পই হবে।

রাজেশ্বর সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বারান্দার নীচে মাটির সিঁড়ির দু'ধারে দুটি মঙ্গল কলস, ঘরের মধ্যে দরজার সামনেই ঘট, তার উপরে সিঁদুরের পুতুল আঁকা, ঘটের মুখে ধান, আম্রপল্লব ও দই। এক কোণে বসিয়া জবা একটা কুলায় কি সব সাজাইতেছে। রাজেশ্বর বলিল, এ সব করলে কখন?

পাশেই ছিল বৃন্দাবন, সে বলিয়া উঠিল, বৌ কইল আমারে লইয়া চল। আমি যাত্রার সব ঠিক করিয়া দিয়া আসি। ও তোমারে খুব ভালবাসে!

বৃন্দাবন ও জবা পরস্পরের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া নিল।

ক্রমে দশ বারটি বরযাত্রী আসিয়া জুটিল, কেহ আত্মীয়, কেহ বন্ধু। সমাগতদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলিয়া সাগরবাসীই বরকর্তা হইলেন। কপালে চন্দন-তিলক পরিয়া, টোপর পাশে রাখিয়া রাজেশ্বর প্রথমে ঘটের সম্মুখে প্রণাম করিল, তারপর লইল পুরোহিত ও গুরুজনদের পদধুলি। প্রণামীর টাকার বিনিময়ে পুরোহিত গুপীঠাকুর আশীর্বাদ করিলেন,—

"কাস্তব কান্তাং কাস্তব পুত্রং, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রং।"

কান্তা মানে বৌ, বোঝলা রাজু, আব পুত্র ছাওয়াল, বউ আনতেছ এবার ছাওয়াল হউক, সংসার হোক এই আশীর্বাদ করলাম। বাওনের আশীর্বাদ ফলবেই।

এবার চলিল শোভাযাত্রা। সর্বাগ্রে পুরোহিত, পিছনে সাগরবাসী তারপর রাজেশ্বর, এইভাবে একজনের পর একজন সারি বাঁধিয়া পায়ে চলা অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে লাগিল। সবার পিছনে কুলা মাথায় করিয়া চলিল বৃন্দাবনের ছোট ভাই ডল্লন। রাজেশ্বরের মাথায় টোপর, পরনে ত্রিগুণার মায়ের দেওয়া ধুতি, জামা ও আলোয়ান।

একসঙ্গে বাঁধা দর্পণ, কাঁচি ও কলার কচি পাতা। নগ্নপদ সকলেই, বর ভিন্ন আর কারও কাপড় হাঁটুর নীচে নামে নাই, প্রায় সকলেরই গায়ে ক্ষেরণ কারিগরের বুনানো সুতীর মোটা চাদর।

চাঁদিনী রাত, পথের দু'ধারেই শিশির ভেজা ঘাস। একটু দূরে খালধারে জয়দুর্গা খোলার মাঠ সাদা কাশের ফুলে ছাইয়া গিয়াছে।

চার পাশের এই শুভ্রতার মাঝখানটায় বরযাত্রীদের চলমান ছায়া গুটিকত কালো ঢেউএর মতন মনে হয়। ছায়া গুলিকে অনেক বড় দেখায়।

শোভাযাত্রীরা পথের দু'ধারে দেবস্থানের উদ্দেশে প্রণাম করে, পুরোহিত স্তব আবৃত্তি করেন। নেংটা শিবতলার সামনে যাইয়া বলেন,

"প্রভাতে য স্মরেন্নিত্যং দুর্গাং কালীং ক্ষরদ্বয়ং"—

খালের উপর বাঁশের বড় সাঁকোটা পার হইলেই হাঁটু সমান জলকাদা। তারপর কটাইর বাড়ী। তার ঘরের পিছন ও একটি বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়া হাঁটা পথটা পুবদিকে মনসা বাড়ীর উঠানে গিয়া মিশিয়াছে। পুরোহিত কাদা পার হইয়া সবে মাত্র শুকনা জায়গায় পা দিয়াছেন, এই সময় একটা কালো মূর্তি তাঁর সামনে আসিয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া দাঁড়াইল।

কেডারে? জামাই লইয়া বাড়ীর উপর দিয়া যায় কেডা,—বলিয়াই সেই কালো মূর্তি দুর্বল হস্তে নিজের মাথার উপর লাঠি ঘুরাইতে লাগিল।

পৈতৃক মাথাটা বাচাইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে পুরোহিত বলিলেন, ও কডাই, আমি গুপীঠাকুর, তোমার গো পুরোইত গুপী।

কটাই হাঁপাইতেছিলেন। তিনি কহিলেন, পুরোইত সাজে এখন সগল ব্যাটা।

একটু পরেই কি যেন ভাবিয়া লাঠির কসরৎ থামাইয়া কহিলেন, ও আপনে! এতক্ষণ ঠাহর করতে পারি নাই। পায়ের কাদা দেন আমার বাড়ীতে। কিন্তু বর লইয়া যাইতে দেব না।

এই পথে গ্রামের সবাই যাতায়াত করে, বাদ্যভাণ্ড লইয়া বরের মিছিলও যায়। তাই কটাইয়ের বাধা প্রদানে সবাই বিস্মিত হইল। গুপী ঠাকুর অনেক বুঝাইলেন, সাগরবাসী তর্ক করিলেন। কিন্তু কটাইর ঐ এক কথা,

আমার খুশি আমি যারে ইচ্ছা যাইতে দি। তোমারগো দেব না। যাও দেখি, কার ঘেঁটির উপর কয়টা মাথা।

একজন দুইজন করিয়া একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাশের বাড়ীর দক্ষিণা চক্রবর্তী আসিলেন, আসিলেন জনার্দন সেন, লোচন মধু আর অগ্নি মণ্ডলের ছেলে ঈশান। জোঁকের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বর ও বরযাত্রীর দল পাঁক ছাড়িয়া আবার বাঁশের সাঁকোর উপর আসিয়া বসিল। এধারে চলিল চেঁচামেচি, কখনও বা মারামারির উপক্রম। শেষটায় মীমাংসা হইল, বরযাত্রীরা একসঙ্গে দুইজনের বেশী যাইতে পারিবে না। আর রাজেশ্বরকে দর্পণ, মুকুট প্রভৃতি আলোয়ানের তলায় ঢাকিয়া যাইতে হইবে।

কটাইর বাড়ীর সীমানা এইভাবে পার হইয়া যুবা বরযাত্রীর দল চেঁচাইয়া উঠিল, বল হরি, হরিবোল।

অগ্নি মণ্ডলের বাড়ীতে সানাই বাজিতেছিল। তার মধুর তান জ্যোৎস্নাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিল। রাজেশ্বরের বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল ঐ সুরের তালে তালে। এই বাজনা তাদের মিলনের বাজনা, তার ও চাঁপার মিলন যেন এরই মতন মিষ্ট ও মধুময় হইয়া ওঠে। কিন্তু সে রাত্রে ঐ সুরকে ছাপাইয়া উঠিল আর এক কলরব। বংশে কারা বড়, শুধু বর ও কনে নয়, কৌলিন্যে উভয়পক্ষের উপস্থিতদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তর্ক। এই আলোচনা মাঝে মাঝে গালা-গালির সীমা ছাড়াইবার উপক্রম হয়, কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়ে। বিবাহের পূর্বে বরযাত্রীদের খাইবার নিয়ম নাই, ক্ষুধিতের দল চেঁচাইয়াই আসর সরগরম রাখে।

উঠানের মাঝখানে একটা আলোর ঝাড়, চারকোণে চারটা আলো। ঝাড়ে বারটা এবং কোণের গুলিতে একটা করিয়া মোমবাতি জ্বলে শতরঞ্জির উপর বর ও বরযাত্রীরা বসিয়া আছে। গ্রামের মাতব্বর

স্থানীয়ও আছেন কয়েকজন। শিশুরা ফরাসের উপরই এখানে ওখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কারও মুখ দিয়া লালা গড়ায়, কেহ নাক ডাকাইতে থাকে।

নানাবিধ সামাজিক কচকচিতে রাত প্রায় কাটিয়া গেল, শুভকার্য আরম্ভ হইল ভোরের দিকে। তাদের সমাজে প্রায় প্রতিটি বিবাহেই এইরূপ হয় তবুও রাজেশ্বর আশা করিতেছিল রাত্রে বিবাহ হইয়া গেলে অন্ততঃ ভোরের দিকটায়ও সে একবার চাঁপার ঐ সুন্দর হাত দু'খানা নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে পারিবে। কিন্তু শুভদৃষ্টি হইতেই সকাল হইয়া গেল। রাজেশ্বর পিঁড়ায় দাঁড়াইয়া। চাঁপাকে একখানা পিঁড়ায় বসাইয়া দুইটি যুবক বরের চারিদিকে সাতপাক ঘুরাইল। তাদের দু'জনের মাথা চাদরে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বাহিরের জগৎকে আড়াল করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিবে এই প্রথম। এই শুভদৃষ্টির মধ্য দিয়া আরম্ভ হইবে তাদের দাম্পত্য জীবন। চাঁপা চোখ বুজিয়া ছিল। পাঁচ সাতজন সমস্বরে বলিল, চাও, বরের দিকে চাও।

তার সেজ বৌদি বলিল, ভাল করে দেখে নে চাঁপা।

রাজেশ্বর এতক্ষণ একদৃষ্টে চাঁপার দিকে চাহিয়াছিল। বহু অনুরোধের পর একবার চোখ মেলিয়াই চাঁপা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কী সুন্দর দু'টি চোখ, কী মিষ্ট হাসি!

দুপুরটা খাওয়া দাওয়ায় কাটিল। প্রায় তিনশ' লোক খাইল। ভাত, দু'রকম ডাল, দু'রকম মাছ, শাক, অম্বল, দই ও জিলিপি।

তারপর মেলেকের ছেলের বাজনা। এই গ্রামেরই বাদ্যকর মেলেক। গ্রামের দক্ষিণে, হাটের অপর পারে খালধারে তার বাড়ী। ছেলেটির বয়স আন্দাজ তের। গলায় একটা ঢোল ঝুলাইয়া, সরু আঙুলের আঘাতে ঢোলের শুকনা চামড়ার উপর সে ভারি মিষ্টি বোল তোলে।

মনে হয় তার আঙুলে কি যেন যাদু আছে। সঙ্গে মেলেক শুধু একখানি কাঁসি বাজায় আর ছেলেকে উৎসাহিত করে, বাঃ বাচ্ছা বাঃ। ছেলে মকরম তালে তালে নাচে, বৈঠকের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওস্তাদি দেখায়। তার চোখের চাহনির মধ্যে ফুটিয়া ওঠে নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস। রাজেশ্বরের সামনে আসিয়া সে উবুহাঁটু বসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলে রাজেশ্বর দুটা টাকা বকশিস দিল। মেলেক বলিল, বৌ লইয়া সুখে থাক, মল্লিকের পো।

সন্ধ্যার পর রামায়ণের গান। গ্রামের ছেলেদের কেহ রাম, কেহ লক্ষ্মণ, কেহ বা সীতা সাজিল।

বিবাহের পরের রাত্রে বেহুলার স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই হইতে বাঙ্গালীব কাছে এই রাতটা অশুভশংসী, স্বামী-স্ত্রীর মিলন এই রাত্রে নিষিদ্ধ। এই বিধান যাঁরা করিয়াছেন, রাজেশ্বর তাঁদের প্রতি অবশ্য খুশি হইতে পারিল না।

বিবাহের পর হইতে অগ্নি মণ্ডল গম্ভীর হইয়া ছিলেন। চাঁপা স্বামীর সঙ্গে রওনা হইব্যর সময় বৃদ্ধ তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজেশ্বরকে বলিলেন, ওকে যত্ন করিও। ও আমার বড় আদরের ছিল—

আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রাজেশ্বরের বাড়ী। এয়োতিরা চাঁপাকে উঠানে দুধভরা পাথর বাটিতে দাঁড় করাইয়া, বরণ করিয়া ঘরে আনিল। সেখানে জবার সঙ্গে ত্রিগুণার দুট বৌদিও ছিলেন। তাঁরা উলুধ্বনি করিলেন, শাঁখ বাজাইলেন।

বর কনে প্রথমে ত্রিগুণার মাকে প্রণাম করিল।

রাজেশ্বর তাঁর বাড়ীতে সিধা পাঠাইল। বাড়ীতেও লোক খাওয়াইল ত্রিশ চল্লিশ জন। নিজহাতে নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করিয়া চাঁপা আজ প্রথমে মল্লিক গোষ্ঠীভুক্ত হইল।

অগ্নি মণ্ডল আসেন নাই। দৌহিত্র না হইলে মেয়ের বাড়ী আসা নিষেধ। আসিয়াছিল ঈশানরা চার ভাই, চার বউ ও ছেলেমেয়েরা। রাজেশ্বর তাদের খুব যত্ন করিল। বিনা প্রয়োজনেও পাঁচবার দাদা, বৌদি বলিয়া ডাকিল। পরাণ তার সমবয়সী, হয়ত' বা ছোটই হইবে। কিন্তু সেও চাঁপার বড় বলিয়া তাকে দাদা ও আপনি সম্বোধন করিল। আগে ডাকিত তুই বলিয়া।

রাত প্রায় দুপুর। নূতন বিছানায় ফুল ছড়াইয়া এয়োতিরা চলিয়া গিয়াছে। সবার শেষে গেছে জবা। পরিষ্কার বিছানায় ফুলের মধ্যে চাঁপা ঘুমাইয়া আছে। এককোণে একটি মোম জ্বলিতেছে। দরজা বন্ধ করিয়া মোমটি তুলিয়া আনিয়া রাজেশ্বর চোখ ভরিয়া চাঁপাকে দেখিতে থাকে।

সিঁদুর চর্চিত সিঁথির দু'পাশ দিয়া শুষ্ক চূর্ণকুন্তল ছোট ছোট গোছায় ললাটের উপর পড়িয়াছে। লেপের উপর দেখা যায় সুডৌল একখানা বাহু, নাকের উপর মুক্তার দানার মতন দু' ফোঁটা ঘাম।

দু' ফোঁটা গরম মোম বাহুর উপর পড়ায় চাঁপা বলিয়া উঠিল, উঃ—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসিয়া ফেলিল।

ওঃ এতক্ষণ জেগে ছিলে, তুমি ত' ভারী দুষ্টু, বলিয়া রাজেশ্বর চাঁপাকে এক হাত দিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া আর এক হাত দিয়া তার বাহুখানাকে মুখের কাছে তুলিয়া মোমের ফোঁটার উপরই বারবার চুমা খাইতে লাগিল। চাঁপা এলাইয়া পড়িল তার কাঁধের উপর। নারীর কোমল দেহের স্পর্শ জীবনে এই প্রথম। এই বাহু, এই চোখ মুখ, কলাগাছের ছোট চারার মতন কোমল-স্পর্শ, ধবধবে সাদা এই উরু, সবই তার, একান্তই তার এ ভাবিতেও কী আনন্দ।

এই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য রাজেশ্বর বৃষ্টিরৌদ্রে, ঝড়ঝঞ্ঝায় ছয়টা মাস কী অক্লান্ত শ্রমই না করিয়াছে। উপেক্ষা করিয়াছে চোর ডাকাতের

ভয়, ঝড় তুফানের রুদ্ররূপ। ব্যবসায়ের অজানা পথের ঝুঁকি লইয়াছে—সেও ঐ চাঁপার জন্য। যে জিনিস পাইতে যত আয়াস, তার ভোগে তত তৃপ্তি।

চাঁপাকে আদর করিতে করিতে রাজেশ্বর বলিল, কত যে সাধনা করেছি তোমার জন্য। চাঁপা মৃদুকণ্ঠে কহিল, জানি।

রাজেশ্বরের এই সাধনা যাতে সফল হয় সেইজন্য সেও ঠাকুরকে ডাকিত, কিন্তু লজ্জায় কিছু বলিল না।

আলোটা নিভিয়া গিয়াছিল। রাজেশ্বর দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালাইবামাত্র ঘরের বাহিরে কারা যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজেশ্বর বলিল, চোর, চোর!

যারা আড়ি পাতিয়াছিল তারা এবার ছুটিয়া পলাইল। চাঁপা বলিল, বৃন্দাবনের বৌ না?

রাজেশ্বর বলিল, তার গলাও পাচ্ছি।

ভোরের দিকে চাঁপা বলিল, তোমায় একটা জিনিস দেব।

কি, চুমু?

না, সে তুমি ভাবতেও পার না। চাঁপা তার পরে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, বাবা দিয়েছে তোমায়।

কেন?

তোমার দেড়শ' ফেরত দিয়েছেন। আর নিজে দিয়েছেন দেড়শ', জামাই-যৌতুক। এই দিয়ে জমি কিনো।

রাজেশ্বর বলিল, ওঃ তোমার বাবা দেড়শ' টাকা চেয়ে আমায় একবার বাজিয়ে নিলেন বুঝি?

চাঁপার বিবাহের পর হইতে অগ্নি মণ্ডল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইলেন। দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া ও অতীতের স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া নিজের চারদিকে একটা স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া তুলিলেন।

পুত্রবধূরা সাধ্যমত সেবাযত্নে ত্রুটী করে না, ছেলেরাও খোঁজ খবর লয়। কিন্তু তাতে তাঁর মন ওঠে না। চাঁপা পিতাকে লইয়া সর্বক্ষণ যেরূপ ব্যস্ত থাকিত বধূদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, বৃদ্ধ ইহা বুঝিতেন না। অভিমান করিতেন, বলিতেন, বুড়া হইয়া বাঁচিয়া থাকার মতন কেলেশ আর কিছু নাই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি যতই ক্ষীণ ও ঝাপসা হইয়া আসে, অতীতকে ততই বেশী করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে চান। মনে পড়ে অতীতের যত স্মৃতি, কোন গরুটা হাল ভাল টানিত, কোনটা তার গায়ে আসিয়া কাঁধ ঘষিত, ছেলে বেলায় বেগুন পাতায় ভাত দিয়া কোন পথচারী বৃহদাকায় কুকুরকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিলেন। বাঁশের কঞ্চি দিয়া লেজ মাপিয়া কঞ্চিটা মাটিতে পুতিয়া রাখিলেন অথচ কুকুরটা পোষ মানিল না। সে আবার অজানা পথেই চলিয়া গেল।

সেনের বাড়ীর পূজার বাজনা তখন কী মিষ্টিই না লাগিত, প্রভাতের আলো ছিল কত উজ্জ্বল, পাখীর কাকলী কী মধুর। পূজা মণ্ডপের চারধারে ছেলেরা রঙিন পোশাকে ঘুরিয়া বেড়াইত, নগ্ন দেহে তিনি এককোণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ঐ বাড়ীর বড়

ঠাকুরুন একখানি আটহাতি কাপড় দিলে কী আনন্দই না উপভোগ করিতেন—আজ পঞ্চাশ বিঘা জমি কিনিলেও সে আনন্দ হয় না।

তারপর আসিলেন চাঁপার মা যাদুবালা। মণ্ডলের জীবনের একমাত্র নারী তিনি। সূর্যকিরণস্পর্শে পদ্মের পাপড়ি যেমন উন্মীলিত হয় প্রেমের স্পর্শে তাঁর নারীত্বের মাধুর্যও তেমনি বিকশিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাদুবালা স্বামীর জীবনে শুধু গৃহিণীরূপেই আসেন নাই, আসিলেন লক্ষ্মীরূপে, ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে। দু'খানার বদলে মণ্ডল চারখানা বাহুর বল পাইলেন। তাঁরই মঙ্গল স্পর্শে ভগবানের করুণা বর্ষাব বারিধারার মতন বর্ষিত হইতে লাগিল।

আজকাল অগ্নিমণ্ডল বসিয়া বসিয়া তামাক টানেন আর ভাবেন এই সব কথা। ছেলে মেয়েদেব চরিত্রের খুঁটিনাটি জিনিসগুলি মনে করিতেও তাঁর ভাল লাগে। বয়স্ক ঈশান, নারাণ আজ তাঁর কাছে যেমন সত্য—তেমনই সত্য তাদের শৈশবের রূপ। কিন্তু সব চেয়েই বেশী ভাবেন চাঁপাব কথা। শিশু চাঁপা, বালিকা চাঁপা, কিশোরী চাঁপা—মেয়ের কত ছবিই যে তাঁর স্মৃতিপটে আঁকা আছে, তা' শুধু তিনিই জানেন। স্মৃতির পুরানো পুঁথির পাতা খুলিয়া এক একবার দেখেন আবার সযত্নে বন্ধ করিয়া রাখেন।

শরীরের অবস্থা ফাটল ধরা নদীতটের মতন। কালের ক্রুদ্ধ ঢেউগুলি ফণা তুলিয়া পাঁজরের হাড়ে আসিয়া আছাড় খায়। মাঝে মাঝে কম্পন অনুভব করেন। বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা যে কি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু বাঁচার এই দীর্ঘদিনের অভ্যাস জীবনকে প্রিয়তর করিয়া তোলে। আরও কিছুদিন হয়ত বাঁচিতেন। কিন্তু এই সময় একটা দুর্দৈব ঘটিল।

ঘাঘরের নদীতে সেদিন বাইচ খেলা। প্রতি বৎসর বিজয়ার পরদিন বৈকালে ফকিরবাড়ী হইতে বাহির-সিমুলিয়ার পুরানো বটগাছ

পর্যন্ত বাইচ খেলা হয়। এক একটা প্রতিযোগিতায় আট দশখানা নৌকা থাকে। নৌকাগুলি ত্রিশ চল্লিশ হাত হইতে সত্তর আশি হাত পর্যন্ত লম্বা। গড়ন ছিপের মতন। গলুইয়ে পিতলের চোখ বসান, তার উপর সিঁদুর লেপা। এক একটা নৌকায় চল্লিশ পঞ্চাশজন বৈঠা টানে, কোন কোন খানায় থাকে সত্তর আশিজন। নৌকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন লোক বৈঠার তালে তালে কাঁসর বাজায় আর নাচে। মাঝিদের উৎসাহিত করিবার জন্য নানারকম ধ্বনি করে, কখনও বা গান গায়—বল, জয় বরুণ রাজার—

মাঝিরা সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়া বলে, হেঁইও।

লোকটি বলে, দয়া তার তুফান সমান।

মাঝিরা টানে—হেঁইও।

লোকটি গায়, আমরা সব সিন্ধু ঘোটক,

মার টান হেঁইও-বলিয়া মাঝিরা আরও জোরে টান দেয়। নৌকা তীরের মতন ছুটিতে থাকে। সামনে গলুইয়ে দাঁড়াইয়া বল্লম হাতে একটি যুবা, যেন ব্রোঞ্জের স্থির অচঞ্চল মূর্তি।

ঐ বল্লম দিয়া সে আকাশের বুক বিঁধিতে চায়। বাইচ খেলায় জয়ের পুরস্কার একটি পিতলের কলসী, কখনও বা ধুতি চাদর। তার মূল্য পিতলে কিংবা সুতায় নয়,—মূল্য আনন্দ ও উল্লাসে।

বাইচের সময় সমস্ত পরগনা যেন এখানে ভাঙিয়া পড়ে, আসে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা নরনারী সকলে। নেপালপুরের এ একটা জাতীয় উৎসব।

পুরুষরা খোলা নৌকায় বা ছইএর উপর দাঁড়াইয়া দেখে, মেয়েরা দেখে ছইএর বা ঘেরা-টোপের মধ্য হইতে। দর্শকদের নৌকায়ও নিশান উড়ান থাকে। কোনটায় বা বাজনা বাজে।

বৈকালী সূর্যের মিঠা আলো আনন্দ ছড়াইয়া দেয়। দূর হইতে জলে-ঘেরা গ্রামগুলিকে সবুজ রংএর বজরার মত দেখায়।

বাইচ দেখার জন্য যুবার দলের কেহ কেহ গাছে চড়িয়াছে, পাশেই আর এক গাছে বসিয়া একঝাঁক বক। সবুজ প্রকৃতির বুকে যেন কতকগুলি জুঁই ফুল।

হিন্দুরা হিন্দুর, মুসলমানেরা মুসলমানের জয় কামনা করে, তাদের উৎসাহ যোগায়। নৌকার গলুইর বৈশিষ্ট্য, সামনের বল্লমধারী যুবার সৌন্দর্য, অনেক সময় এগুলির উপরও সহানুভূতি নির্ভর করে। কোনও নৌকাখানিকে সুন্দর মনে হইল, কোনও নৌকার বল্লমধারী কিংবা হালের মাঝি সুপুরুষ—সহানুভূতি গেল তার দিকে। দর্শকরা উৎসাহিত করিবার জন্য চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

কান্দির বৈকুণ্ঠ মালের অসুখ করায় রাজেশ্বর তার নৌকার হাল ধরিয়াছিল। তার সুন্দর চেহারা, উন্নত গড়ন অনেককেই আকৃষ্ট করিল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। রাজেশ্বর মাথা নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহের কেশরের মতন সেগুলি আন্দোলিত হয়। তার কপালের সিঁদুরের ফোঁটা পড়ন্ত সূর্যের কিরণে চকচকে করে, ঘর্ম্মসিক্ত ললাট পিতলের শিরস্ত্রাণের মত দেখায়।

কেহ কেহ বলে মানুষটা কেডারে? উত্তর আসে, অগ্নি মণ্ডলের জামাই। সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিত হয়—জয় কান্দির জয়। সাবাস মোড়লের জামাই।

চাঁপা একখানা দো-মাল্লাই ছইওয়ালা নৌকায় পিতার পাশে বসিয়াছিল। অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, দেখলি জামাইর কি জয়-জয়কার পড়েছে। চাঁপা ছই-এর ফাঁক দিয়া স্বামীকেই দেখিতেছিল, লজ্জায় চোখ ফিরাইয়া নিল। এই সময় কলরব উঠিল, জয় কান্দির জয়।

অগ্নি মণ্ডল বলিলেন, রাজুই জেতল বোধ হয়। এবার কলরব উঠিল সামাল, সামাল। মুহূর্ত মধ্যে লগি বৈঠায়, লেজা সড়কিতে আকাশ ছাইয়া গেল।

রাজেশ্বরের নৌকার সঙ্গে কুরপালার মিয়াদের নৌকার ধাক্কা লাগে। দুই নৌকা হইতে কয়েকজন লোক জলে পড়িয়া যায়। ঐ দু'য়ের মধ্যেই একটির জয় ছিল স্থিরনিশ্চিত। জয়ের পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় উভয় পক্ষ নৌকায় লুকান লেজা সড়কি বাহির করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কয়েক জনের মাথা ফাটিল, রক্তপাত হইল। দোষ যে কার, অথবা কাহারও ইচ্ছাকৃত ত্রুটী ভিন্নই ধাক্কাটা লাগিল কি না, এ সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধান করিল না, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং অবকাশও তাদের ছিল না।

এই দুই নৌকা হইতে জিঘাংসা লুর মতন হিন্দু মোসলেম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে ঘাঘরের নদী রক্তে সেদিন রাঙা হইয়া যাইত। এই সময়ে মৌলবী ওলফাত কাজী সাহেব নৌকার ছই-এর উপর দাঁড়াইয়া শিঙা বাজাইলেন। সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইল তাঁর উপর। তিনি বলিলেন, খবরদার মুসলমান ভাইয়েরা।

দুই জনে ধরাধরি করিয়া অগ্নিমণ্ডলকে ছইএর উপর দাঁড় করাইয়া দিল। ঈশান শিঙা বাজাইল। মণ্ডল দুই দিকে দুইজনের উপর ভর করিয়া উঁচু গলায় বলিলেন খবরদার, নমঃ ভাইরা!

উত্তেজনাটা আলেয়ার মতন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়া গেল।

কিন্তু অগ্নি মণ্ডল মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে রটিল, বৃদ্ধ মণ্ডল মুসলমানদের লগির আঘাতে মর মর হইয়াছেন! আবার শুরু হইল মার্ মার্ কাট্ কাট্ রব। ঈশান ও আর কয়েকজন মাতব্বরের সহযোগিতায় কাজী সাহেব কোন রকমে সকলকে শান্ত করিলেন। তিনি নিজে এবং আরও অনেক মাতব্বর অগ্নি মণ্ডলের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাঁকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

বাইচের নৌকা দু'খানায় ধাক্কা লাগিবামাত্রই রাজেশ্বর জলে পড়িয়া যায়। জলের তলায়ই মাথায় বৈঠার এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। একটু দূরে একটা নৌকায় ঘেরাটোপের মধ্য হইতে টগর ইহা লক্ষ্য করিয়া নগরবাসীকে বলিল, সর্বনাশ, রাজু জলে পড়ে গেছে। ক্ষিপ্রহস্তে ঐ জায়গায় নৌকা লইয়া গিয়া উদ্যত বৈঠা, লগি বর্ষার জঙ্গলের মধ্যে মাথা গলাইয়া নগরবাসী নিজের নৌকায় রাজেশ্বরকে টানিয়া তুলিল। রাজেশ্বরের তখন সংজ্ঞা নাই, তার কপাল হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। টগর আঁচল ভিজাইয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া নগরবাসীকে কহিল, একে নিয়ে মঞ্জরীতে চল। নগরবাসী কহিল তা' কি সম্ভব? টগর কহিল, সম্ভব নয় কেন শুনি? আমরা ত' সেখানে গিয়ে বাস করছি না। তা ছাড়া কাঠিগাঁও-এ ওকে দেখবে কে? মঞ্জরীতে ওর নিজের পাঁচটা লোক আছে, ডাক্তার বদ্যি আছে।

সাগরবাসীর জমি বাটোয়ারা করিবার জন্য অগ্নি মণ্ডলের যেদিন তারাইল যাইবার কথা ছিল সেইদিনই নগরবাসী টগরকে লইয়া তারাইল পরিত্যাগ করে। পাছে মণ্ডল তাকে টগরকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন সেই ভয়ে সেই হইতে সে কাঠিগাঁও-এ বাস করিতেছে। মঞ্জরীতে আর যায় নাই।

আহত রাজেশ্বরকে লইয়া আজ শেষটায় তাকে মঞ্জরীতেই যাইতে হইল। সমস্ত পথটা রাজেশ্বরের রক্ত বন্ধ হয় নাই। পরিধানের কাপড় সম্পূর্ণ রক্তসিক্ত হওয়ায় টগর ঘেরাটোপের পর্দার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইল।

রাজেশ্বরের ঘর। একটা তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া টগর তার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে। একটু আগে গাঁদা পাতা ছেঁচিয়া দেওয়ায় রক্তটা বন্ধ হইয়াছিল। প্রদীপের ম্লান শিখা ধীরে ধীরে কাঁপে, পাশের বেড়ার উপর তাদের দুজনের ছায়া পড়ে। মনে হয় রাজেশ্বরের মাথা টগরের কোলের উপর।

রাজেশ্বর চোখ মেলিয়া বলিল, আঃ! তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া পাশেই টগরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখানে? টগর বলিল, কেন, আসতে নেই কি? রাজেশ্বর বলিল, না না, তা নয়। তা' তুমি—একটু থামিয়া বলিল, চাঁপা কোথায়? টগর স্মিত-মুখে কহিল, এখনই পাবে, তাকে আনতে গেছে। রাজেশ্বরের মনে পড়িল ঘাঘর নদী, বাইচ খেলা, প্রচণ্ড ধাক্কা। সে প্রশ্ন করিল, তোমরা বুঝি তুলে নিয়ে এসেছ আমাকে? টগর উত্তর করিল, চুপ কর এখন, সে কথা পরে হবে।

টগর এ গাঁয়ের দধিভুষণের মেয়ে। শৈশবে তার মাতার মৃত্যু হয়। ঘরে আর কেহ না থাকায় সে বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পুরুষের যে কাজ তার প্রায়ই সবই সে শিখিয়াছিল। সে নৌকা বাহিত, মাছ ধরিত, জমি নিড়াইত, বাপের মতন কাছা দিয়া কাপড় পরিত, মালকোঁচা মারিয়া হা-ডু-ডু খেলিত, ছেলেদের সঙ্গে পাঞ্জা কষিত।

বার তের বৎসর বয়সেই টগর রামায়ণের গান ও শিবকীর্তন শিখিয়াছিল। গলা মিষ্টি, চেহারা মিষ্টি, তাই দলের কর্তারা তাকে লব কুশ সাজাইত, কখনও সাজাইত শিবের তপোভঙ্গকারিণী অপ্সরা।

টগরের যেমন রূপ তেমনই ছিল অঙ্গসৌষ্ঠব। হাসিলে গালে টোপ পরিত। কটাক্ষে ছিল অগ্নিবাণ। তার যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণের দল আরও আকৃষ্ট হইল। দধিভূষণ ছেলেদের সঙ্গে তার মেলা মেশা বন্ধ করিয়া দিল।

টগর এবার আরম্ভ করে এক নূতন খেলা। আড়াল হইতে ছেলেদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকে, কখনও ছুটিয়া পালায়। শিউলির ডালে ঝাঁকানি দিয়া তরুণদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করে, স্নানের সময় ডুব দিয়া আসিয়া তাদের পা ধরিয়া চুবুনি খাওয়ায়।

দধিভূষণ ব্যস্ত হইয়া কন্যার বিবাহ দিল। যুবাদের সমবেত দীর্ঘশ্বাসের ফলেই হয়ত টগরের এই প্রৌঢ় স্বামীটির ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইল। টগর বাপের আদরের দুলালী, সিঁথির সিন্দুর সে মুছিল বটে, হাতের নোয়াও খুলিয়া ফেলিল কিন্তু চেকের শাড়ী, গহনা আলতা পরা কিছুই ছাড়িল না। তৈলহীন রুক্ষ চুলে যৌবন শোভা আরও যেন ফুটিয়া বাহির হইল।

নগরবাসী ছিল শিবকীর্ত্তনের পাণ্ডা, রামায়ণ-গানে সে রাম সাজিত। টগর তারই কাছে গান শেখে, শেখে অভিনয়। তার স্ত্রীর প্রেম নগরবাসীকে যখন বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, টগরের রূপ-যৌবন সেই সময় তাকে ঘর ছাড়া করে।

গ্রামের আর পাঁচজন যুবা মনে মনে নগরবাসীকে হিংসা করিত। রাজেশ্বর ছিল অন্য প্রকৃতির মানুষ। টগরের সঙ্গে কোন দিনই সে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে নাই। আজ সন্ধ্যায় তার সঙ্গে একাকী থাকিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। এই অবস্থা হইতে তাকে রক্ষা করিল; াপা ও বৃন্দাবন।

স্বামীর আঘাতের সংবাদ পাইয়া চাঁপা বৃন্দাবনকে সঙ্গে করিয়া মূৰ্ছিত পিতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু টগরকে স্বামীর শিয়রে দেখিবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। দেখিয়া প্রীত যে হইল না, ইহা বলাই বাহুল্য। টগর ইহা লক্ষ্য করিল। তবুও একটু আগাইয়া গিয়া চাঁপার হাত ধরিয়া কহিল, কী বিপদই না হয়েছিল, তোমার জিনিস তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

এ নিশ্চিন্ত হওয়ার অধিকার টগর কখন হইতে লাভ করিল এবং তাকে ইহা দিলই বা কে, চাঁপা ইহা বুঝিয়া পাইল না। এই সময় তার চোখ পড়িল টগরের রক্তসিক্ত কাপড়ের উপর। সে কহিল, এ কী! টগর কহিল, ভয় নেই, রক্ত বন্ধ হয়েছে।

কাঠিগাঁওয়ের পথে। টগরের নৌকা নদী বাহিয়া চলিয়াছে, বৈঠার ডগা বাহিয়া জলের বুকে যেন ঝুর ঝুর করিয়া রূপার গুঁড়া পড়ে। নগরবাসী বলে, দেখলে মোড়লের ঝির দেমাক? টগর কহিল, ওর বাপের এখনও জ্ঞান হয় নি, সোয়ামীর মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর কি এই কথা বলবার সময়?

চারদিন পরে অগ্নি মণ্ডলের জ্ঞান হইল, তখনও তাঁর মাথায় প্রলেপের পটি, শিয়রে বসিয়া বড়বৌ সুজন বাতাস করিতেছে। পায়ের কাছে ছোটবৌ হাস্য। অগ্নি মণ্ডল একটুক্ষণের জন্য চাহিয়াই চোখ বুজিলেন, খানিকটা পরে আবার চোখ মেলিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। সুজন কহিল, ঠাকুরঝি তার বাড়ী গেছে, বিকেলে আসবে।

অগ্নি মণ্ডল আর উত্থানশক্তি ফিরিয়া পাইলেন না। সর্বদা শুইয়া থাকেন। ঔষধ পথ্য চলে কিন্তু ফল কিছুই হয় না, ভালও লাগেনা কিছুই। কোন বিষয়েই আকর্ষণ নাই, আগ্রহ নাই।

একদিন ভোরে সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, চাঁপার? এই শিশুর প্রতীক্ষায়ই যেন এতদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আর ত' কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রায়। সঙ্গে সঙ্গেই চোখের মণি দুইটি সাদা পর্দায় ঢাকা পড়িল। ধীরে ধীরে বলিলেন, জমি দুবিবা।

দৌহিত্রকে জমি দানের এই আদেশ অগ্নিমণ্ডলের শেষ কথা।

একাদশ দিনে ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ, মছলন্দ কিছুই বাদ গেল না। তাঁর বাড়ীর উত্তরে, খালের ওপারে সারি সারি উনানে বড় বড় তামার ডেকচি চড়িল, সেগুলি এত বড় যে তার আংঠায় বাঁশ বাঁধিয়া নামাইতে হয়। নিমন্ত্রিতেরা মাঠের মধ্যেই সারি বাঁধিয়া খাইতে বসিয়া গেল। ভাত, ডাল, তরকারি,

মাছ, দই ও বাতাসা। খাদ্যের তালিকা সংক্ষিপ্ত কিন্তু খাইল প্রায় পাঁচ হাজার লোক। ভিন্ন জাতীয়েরাও সিধা পাইল। লোকে কহিল, সাধু, সাধু, মানুষটা সত্যিই পুণ্যাত্মা ছিল।

এই ভাবে সমাপ্ত হইল একটা মোড়লের জীবন। সেনের বাড়ীর বালক ভৃত্যরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া চরিত্রবলে ও স্ত্রীর সাহচর্যে তিনি একদিন সমাজপতি হইলেন। রাজধানী হইতে দূরে এই পল্লী অঞ্চলে দশ বিশটা মৌজায় তাঁর সম্মান ছিল বিদেশী বণিক-রাজের প্রতিনিধি দারোগা পুলিসের চেয়ে ঢেব বেশী। লোকে তাঁর কথায় উঠিত, বসিত। তিনি ছিলেন জাতির সহজ স্বাভাবিক নেতা।

অগ্নি মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে নেপালপুব পরগনায় একটা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

অগ্নি মণ্ডলের মৃত্যুর পর বিশাল নমঃশূদ্র সমাজের মাতব্বর কে হইবে ইহা লইয়া নানা জল্পনা চলিল। কেহ বলিল ঈশান, কেহ করিল লোচন মধুর নাম। কান্দির ভারত সিকদার ও বয়রাতলার পূর্ণ তলাপাত্রের নামও উঠিল।

নির্বাচন নাই, ভোট নাই, ভোটের দালাল ত' নাইই। পাঁচজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাঁর কাছে সালিসির জন্য যায়, বিপদে যাঁর সাহায্য লইবার কথা মনে পড়ে, ক্রমে ক্রমে তিনিই সমাজের মণ্ডল হন। ইহাই যুগ-যুগান্তের প্রথা।

সৎ ও নিরপেক্ষ বলিয়া লোকেরা এবার রাজেশ্বরের কাছে যাতায়াত শুরু করে। তাকে সালিস মানে, তার পরামর্শ নেয়।

এত অল্প বয়সে এ সম্মান আর কারও ভাগ্যে জোটে নাই। রাজেশ্বর ইহা অর্জন করিল নিজের চরিত্রবলের দ্বারা।

তবুও সে মনে করিল তার এই প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার অনেকটা কারণ তার শ্বশুর। অগ্নি মণ্ডলের জামাই না হইলে লোকে তাকে চিনিতই না। কথাটা হয়ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু চাঁপা ভাবিত ঐ সমস্তের মূল কারণ সে ও তার বাবা। সে যেন পিত্রালয় হইতে ডালি সাজাইয়া স্বামীর জন্য এই সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছে। কখনও কখনও সে এইরূপ ইঙ্গিতও করিত।

রাজেশ্বর বলিত, তা ত' ঠিকই। সুন্দর বৌ পাওয়াই বরাতের কথা তার উপর তুমি মণ্ডল মশাইর মেয়ে।

চাঁপার দাদা ঈশানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এতদিন সে মনে করিত, পিতার মৃত্যুর পর সেই মণ্ডল হইবে। তাই ভগ্নীপতির এই মান প্রতিপত্তিতে ঈশান মোটেই খুশি হইতে পারিল না। সে প্রায়ই বলিত, বাবা তিন শ' টাকা দিছিলেন বলিয়াই ত' রাজুর বরাত খোল্‌ল। তা ছাড়া, তানার জামাই না হইলে চেনতই বা কেডা?

কিন্তু অদ্ভুত মানুষের মন। কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রাজেশ্বরের উপর যিনি অত্যন্ত চটিয়া যান, বিবাহের শোভাযাত্রার পথ আটকাইয়া যিনি শীতের রাত্রে রাজেশ্বরকে সাঁকোয় বসাইয়া রাখেন, সেই কটাই মহাশয়ই আজ সবচেয়ে বেশী খুশি হইলেন। হাটে ঘাটে তিনি বলিয়া বেড়ান, অমন ছাওয়াল এ তল্লাটে আর নাই। জানতাম বলিয়াই মাইয়া দিতে চাইছিলাম। ও মোড়ল হওয়ায় ভারী তুরুষ্ট হইছি।

আর তুষ্ট হইল বৃন্দাবন ও জবা, তুষ্ট হইলেন ত্রিগুণার মা।

শ্বশুরের তিনশ' টাকায় রাজেশ্বর তিন বিঘা জমি কিনিয়াছিল, নিজের টাকায় কিনিল আরও বিশ বিঘা জমি এবং একটা ভিটা। তার কারবারের প্রধান সঙ্গী বৃন্দাবনেব অবস্থাও সচ্ছল হইল। জবাকে আর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ধান ভানিতে হয় না, স্বামীর রোজগারেই দিন বেশ চলে। তারাও দুই বিঘা জমি কিনিয়াছে আর একটা গাই। জবা গাইয়ের দুধ বেচে। রাজেশ্বর বরাবরই বৃন্দাবনকে সহকর্মীর মর্যাদা দিয়াছে, যখন যা' দরকার সাহায্য করিয়াছে। যাহাতে সে একটা ভাল গৃহস্থ হইয়া উঠিতে পারে তার বরাবরই লক্ষ্য সেই দিকে।

রাজেশ্বরের কারবারী নৌকা চলে তিনখানা, ভাড়া খাটে দু'খানা। পাঁচ সাতজন লোক রাখিয়াছে, কেহ জমির কাজ করে, কেহ কারবার দেখে। সে আরও একখানা ঘর তুলিয়াছে, ধানের মড়াই করিয়াছে দুটা, হালের লাঙ্গল ও বলদ কিনিয়াছে।

চাঁপার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবের পর চার বৎসরের মধ্যে সে একটা সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ হইয়া দাঁড়ায়। তার ধারণা চাঁপা খুব ভাগ্যবতী, লোকে বলে, স্ত্রীর ভাগ্যে ধন।

সমস্ত কাজ একা দেখা সম্ভব নয় তাই খানিকটা কাজের ভার পড়ে বৃন্দাবনের কনিষ্ঠ পরশুরামের উপর। রাজেশ্বরের অনুপস্থিতিতে সেই টাকা পয়সার হিসাব রাখে, দেনা-পাওনা চুকাইয়া দেয়।

বৃন্দাবন ইহাতে ভারী খুশি, সে বলে, আমারে ভালবাসে কিনা ভাই আমার ভাইরে কত্তা করছে।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করে, তোমায় করেনি কেন, বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন বলে, আরে, আমার কথা ছাড়িয়া দেও, মশায়।

এই মানুষটিই রাজেশ্বরের সব চেয়ে বড় মঙ্গলাকাঙ্খী। তার স্বার্থরক্ষার প্রতি বৃন্দাবনের সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বদাই সজাগ, কেহ রাজেশ্বরের একটা জিনিস ছুঁইলেই সে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। তার সামনে রাজেশ্বরের কোন কাজের সমালোচনা করারও উপায় নাই। কেহ কিছু বলিলেই গর্জিয়া ওঠে, কি কইলা মশায়, আর একবার কও দেহি।

বাহিরে যেমন বৃন্দাবন, অন্দরে তেমনি জবা। সদা কৌতুকময়ী, হাস্যময়ী এই নারী সর্বকার্যে চাঁপাকে সহায়তা করে। সে মনে করে, এই পরিবারের নিকট ঋণ তার অপরিশোধনীয়। তাই এদের সেবায় তার কোন কুণ্ঠা নাই, কার্পণ্য নাই। নিজে নিঃসন্তান, রাজেশ্বরের ছেলে মহেশ্বরকে সে সন্তানের অধিক স্নেহ করে, যত্ন করে। মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটায় মহেশ্বরকে আদর করিয়া। মহেশ্বর তাকে বড়মা বলিয়া ডাকে। এই ডাক শিখাইয়াছে রাজেশ্বর।

চাঁপা ইহাতে খুশি নয়। সে কখনও ভুলিতে পারে না যে, সে অগ্নি মণ্ডলের মেয়ে, বর্তমান মণ্ডল রাজেশ্বরের স্ত্রী। তার ছেলে বৃন্দাবনের বৌকে বড়মা বলিবে এ যেন কেমন বেমানান। কিন্তু তাহা হইলেও

চাঁপা মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। জবা ছেলের যত্ন করিলে নিজেরই ঝক্কি কমিয়া যায়। তা ছাড়া চাঁপা এমনিই নির্বিরোধী ধরনের মানুষ। তর্ক করা, প্রতিবাদ করা, এ সবের মধ্যে সে নাই। চলতি জিনিস মানিয়া লইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে থাকিতেই পছন্দ করে।

গত রাত্রি হইতে চাঁপার প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে। বেদনা একবার বাড়ে, একবার কমে। মহেশ্বরের জন্ম চাঁপার পিত্রালয়ে। চাঁপার সে দিনের কষ্ট সম্বন্ধে রাজেশ্বরের কোন ধারণাই ছিল না। বড় হইয়া অবধি প্রসূতির যন্ত্রণা সে কখনও দেখে নাই। চাঁপা এক একবার চীৎকার করিয়া ওঠে আর রাজেশ্বরের বুক কাঁপিতে থাকে, নিজের দেহে সে চাবুকের আঘাতের মতন বেদনা বোধ করে। কী অসহ্য বেদনা চাঁপার, কী মর্মন্তুদ আর্তনাদ! রাজেশ্বরের ইচ্ছা হয় একবার ছুটিয়া যায়। কিন্তু যাইবার উপায় নাই। লোক-লজ্জা উপেক্ষা করিয়াও হয়ত সে যাইত, যাইয়া চাঁপার গায়ে হাত বুলাইত, চেষ্টা করিত তার যাতনা লাঘব করিবার কিন্তু আঁতুড় ঘরের কাছে গেলেও চাঁপা রাগ করে, বলে, যাও, যাও।

সন্তান বাপ মা দু'জনেরই প্রেম ও আনন্দের ফল, কিন্তু মা এত কষ্ট পায় কেন? ভগবানের এ কী অবিচার?

দাইকে সে জিজ্ঞাসা করিল, অমন নরম শরীর, পারবে ত' সহ্য করতে?

বৃদ্ধা ধাত্রী স্নেহভরে কহিল, পারবে নিশ্চয়। ওর চেয়ে নরম শরীরেও পারে।

ডাক্তার ডাকব?

দাইয়ের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। সে বলে, তোর ছাওয়ালরে ধরছে কেডা? তোরে, তোর মায়রে? অমন যে তোমার সোনার চাঁপা, সেও এই হাতের উপরেই পেরথম জগৎটারে দেখছে।

কিছু মনে ক'র না, দাইমা। তুমি খুব ভাল ধরতে পার, সবাই জানে তবে কিনা ওর শরীর দুর্বল, মাথা ঘুরত, বমি করত, এবার খেতেও পারত না কিছু।

দাই একটু হাসিয়া বলিল, সব পোয়াতিরই অমন হয়।

চাঁপা এই সময় খুব চীৎকার করিয়া উঠিলে রাজেশ্বর বলিল, এক হয় বেদনা বন্ধ করে দাও, নয় তাড়াতাড়ি যাতে হয় তাই কর।

দাই বলিল, দুইটাতেই খারাপ হৈতে পারে। এও একটা ফসল! ধানের চারার মত এয়ারও একটা নিয়ম আছে।

সন্ধ্যার দিকে শোনা গেল নবজাত শিশুর কান্না। রাজেশ্বর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি হয়েছে ?

ধাত্রী একটু নীচু গলায় বলিল, মাইয়া।

তা' হোক, ও কেমন আছে ?

তোমার রকম দেইখ্যা চাঁপা হাসতে৷

যে একটু আগেও চেঁচাইতেছিল সে হাসিতেছে শুনিয়া রাজেশ্বর বিস্মিত হইল। তার মনে হইল সন্তানের জন্ম ব্যাপারটা আগাগোড়াই বিস্ময়কর।

বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গেলে রাজেশ্বর দেখিল কন্যা সন্তানের জন্মে সে খুশি হইতে পারে নাই। সে চায় ছেলে। তার অত জমি, আরও জমি সে কিনিবে। এত যার চাষের জমি, হাল, গরু বাছুর, ছেলে তার চাই-ই। ছেলে মানুষের আর একখানা হাতের মতন, ভাল একটি ভাইয়ের মতন।

কিন্তু ভগবানের উপরও তার অগাধ বিশ্বাস। রাজেশ্বর মনকে শেষটায় প্রবোধ দিল, 'হরি ঠাকুর ভালর জন্যই মেয়ে দিয়েছেন।' স্ত্রী ও নবজাতের মঙ্গল কামনায় সে কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে পাঁঠা মানত করিল।

পিছনের উঠানে আঁতুড় ঘর। ঘুণে-খাওয়া কয়টি খুঁটির উপর হাত আড়াই লম্বা খড়ের চালা। প্রবেশপথ এত নীচু যে কুঁজো হইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। জানালার বালাই নাই। তবে জীর্ণ হোগলার বেড়ায় আলো বাতাস ও জল ঢুকিবার ছোট বড় অনেকগুলি ছিদ্রই বর্তমান। ভিত নাই, একটু বৃষ্টি হইলেই উঠানের জল ঘরে ঢোকে।

এক পাশে একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বৃদ্ধা দাই প্রসূতিকে সেক দিয়া একটু আগেই তার পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেঁড়া কতকগুলি ন্যাকড়া ও আধপোড়া তোশকের উপর চাঁপা ও নবজাত শিশু শুইয়া। ওদের ছুঁইতে নাই, এই ঘর স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয়, সমস্ত জিনিসই ফেলিয়া দিতে হইবে, তাই এই দীন ব্যবস্থা। বেড়ার ফাঁক দিয়া রাজেশ্বর চাঁপাকে দেখিল। যন্ত্রনা ও রক্তস্রাবের ফলে চেহারা ম্লান হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিলে মনে হয় একটা মুক্তার দানা কোথা হইতে যেন ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোলে তার চাঁপার কলি।

রাজেশ্বর ডাকিল, দাই-মা। চাঁপা কহিল, ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কি চাই তোমার?

সেক দিয়েছে?

হ্যাঁ।

কেমন আছ তুমি?

ভাল।

একবার হাতখানা বাড়িয়ে দেবে?

চাঁপা বলিল, ছিঃ আমি যে ভারী নোংরা। রাজেশ্বর বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

চাঁপা কহিল, লজ্জা করে। দাই-মা যদি এখুনি উঠে পড়ে?

শেষটায় রাজেশ্বরের আগ্রহেরই জয় হইল। চাঁপা হাত বাড়াইয়া দিলে রাজেশ্বর হাতখানা ধরিয়া কত আদরই না করিল। যেন দীর্ঘ বিরহ অবসানে আজ আবার মিলন হইয়াছে।

সে জিজ্ঞাসা করে, খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে? চাঁপা হাসিয়া বলে, এত রাত্রে আবার খাব কি?

তোমার জন্য গাছ থেকে পাকা ডালিম পেড়ে রেখেছি। এতে খুব রক্ত হয়। রাজেশ্বর রাখিয়াছিল অনেক কিছু। ডাব, নারিকেল, শশা। সে পীড়াপীড়ি করায় চাঁপা শেষটায় বলিল, বেশ একটু ডালিম দাও। আচ্ছা, মেয়ে হয়েছে বলে তুমি বোধ হয় খুশি হতে পারনি?

রাজেশ্বর বলিল, তুমি হয়েছ?

চাঁপা উত্তর করিল, ছেলে হলে আরও হতুম, তাতে তুমিও খুশি হতে কি না।

রাজেশ্বর বলিল, বেঁচে থাক্ আমার খুকী। আমি তোমাদের জন্য কালিঘাটে পাঁঠা মানত করেছি।

চাঁপা বলিল, আমি একটি ছেলে তোমায় শিগ্গীরই দেব।

সন্তান-জন্মের এত ক্লেশের পর চাঁপা আজই আবার পুত্র কামনা করে—এও এক বিস্ময়! রাজেশ্বরের আনন্দও হইল, তার চাঁপা তার কাছে আবার পুত্র চায় বলিয়া।

ক্রন্দনরত মহেশ্বরকে লইয়া জবা বাহিরের উঠানে বেড়াইতেছিল। একবার সে বলে, ঐ চাঁদে তোমার শ্বশুরবাড়ী, ওখানে গিয়ে কত দুধ কলা খাবে। কখনও একখানা বাতাসা তার মুখে দিয়া বলে, খাও বাবা। কিন্তু মহেশ্বরের কান্না কিছুতেই থামে না। সে খালি চেঁচায়, মার কাছে যাব—

জবা বলে, মা বোন নিয়ে আসবে। তোমার ছোট লাল টুকটুকে বোন।

মহেশ্বর বলে, না, বোন চাই না, জিলেপি দাও।

এই সময় পুকুরে স্নান সারিয়া রাজেশ্বর ঘরে ফিরিতেছিল। জবা জিজ্ঞাসা করিল, চাঁপা আছে কেমন ?

রাজেশ্বর যেন লজ্জায় মরিয়া গেল।

পরের দিন সকালে গেল ধানের খেত দেখিতে। একই সঙ্গে পাশাপাশি তার বিশ বিঘা জমি, তার উপর যেন সবুজ একখানা গালিচা পাতা, ত্রিগুণাদের সবুজ গালিচা খানার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। গতরাত্রে মানবশিশুর জন্ম-রহস্য যেমন বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল আজ খেতের দিকে চাহিয়া ধানের প্রতিটি শিষের জন্ম ও জীবন-কথাও তেমনি রহস্যময় মনে হইল। জমির ফসলের উপরে দরদ তার অপরিসীম। সে জানে লক্ষ্মী ঐ সবুজ গালিচায় উপর পা ফেলিয়া চাষার ঘরে আসেন, জমির যত্ন দেবীর পূজারই নামান্তর। তার গৃহে দেবী আসিয়াছেন শস্যের শ্যামলিমার মধ্য দিয়া, আসিয়াছেন ব্যবসায়ের শুচি শুভ্র সাধু পথে।

কিছুদিন হইল রাজেশ্বর হাটে বিলাতী কাপড়ের দোকান করিয়াছে। হাটবারে বাড়ী হইতে কাপড় লইয়া গিয়া ছোট একখানা চালা ঘরের তলায় বসিয়া বিক্রয় করে। খাজনা বছরে তিন টাকা। রাজেশ্বর নানারকম পাড়ের কাপড় আনে, খুব অল্পলাভে বেচে, টুটা-ফাটা হইলে ফেরত নেয়, তাই দোকানখানা অল্পেই বেশ জমিয়াছে।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে দুর্গাপূজার গঙ্গাজল আনিবার জন্য এ অঞ্চল হইতে অনেকগুলি নৌকা কলিকাতায় যায়। বড় বড় জালা ভরতি জল আসে, পূজার সমস্ত কাজই ঐ জলে সম্পন্ন হয়।

সেবার রাজেশ্বর দুর্গাদাস রায়ের নৌকায় কলিকাতায় গেল। পূজার বাজারে বেচার জন্য কয়েক গাঁট কাপড় ও তৈয়ারী ছিটের জামা আনিবে। লাভ তাতে অনেক বেশী। ভবিষ্যতে যাতে কলিকাতা হইতে চালান আসে, তারও ব্যবস্থা করিবে।

কলিকাতায় একটা নূতন জগতের সঙ্গে রাজেশ্বরের পরিচয় হইল। বড় বড় বাড়ী, গ্যাসের মালা-পরা প্রশস্ত রাজপথ, গড়ের মাঠে ঘোড়ার উপর দাঁড় করানো মূর্তি, আকাশচুম্বী মনুমেণ্ট, ঘোড়ার ট্রাম, জলের কল, সবই তার কাছে নূতন, সবই বিস্ময়কর। কল টিপিলেই জল পড়ে, এই পরিস্কার জল আসে কোথা হইতে, এত জল আসেই বা কেমন করিয়া?

সে যাদুঘরে তিমি মাছের প্রকাণ্ড দাঁত দেখিল। চিড়িয়াখানায় সিংহ গণ্ডার, জেব্রা, জিরাফ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। গ্রামে ছোট বাঘ দেখিয়াছিল—আলিপুরে দেখিল ভীষণ সুন্দর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পৃথিবীটা কত বড়, কত সুন্দর আবার কত কুৎসিত, কত ভীষণ জিনিসই না এখানে আছে! হাতীর সামনে রাজেশ্বর একটা রূপার দোয়ানি ফেলিয়া দিলে বৃহদাকার জানোয়ারটা শুঁড় দিয়া ছোট্ট মুদ্রাটিকে তুলিয়া লইয়া দাতাকে সেলাম করিল।

দু'আনা দিয়া রাজেশ্বর হাতীর পিঠে চড়িল। নিজের খরচায় সহযাত্রীদেরও চড়াইল। সঙ্গী কুশাই কহিল, এ আর দেখলা কি রাজু, তাজ্জব আরও কত আছে!

দল বাঁধিয়া তারা আরও তাজ্জব দেখিল। হাওড়ার পুলে বেড়াইল। ইডেন উদ্যানে বাজনা শুনিল। হাইকোর্টের জজেদের ঘরে ঢুকিয়া, তাঁদের দেখিয়া ঈশ্বর বদ্দি মন্তব্য করিল, এনারা মানুষগো ফাঁসি দেয়, কী সুরুক্ষু মাথা!

রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদের বড় বড় মারবেল পাথর ও সুবৃহৎ আয়না দেখিয়া কহিল, ময়দানবের কাণ্ডরে, ভাই!

রাজেশ্বর কলিকাতায় একেবারে নূতন, কোচমান সহিসের "এই সামনেওয়ালা" শুনিয়া সে আঁতকাইয়া ওঠে, সুন্দর জুড়ি দেখিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। ঘোড়ার চলনের শব্দ-ঝঙ্কার শোনে জীবনে এই প্রথম।

ঘোড়ার গা বাহিয়া দুগ্ধ-ধবল ফেনা গড়াইতে দেখে, দেখে চলার তালে তালে ঘাড়ের উপরে তার চুলের দোলা। চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না।

নিজের দেশে গরুর গাড়ী চলারও পথ নাই। বর্ষার কয়টা মাস ঘরে বন্যার জল থৈ থৈ করে। মানুষকে সাপ ও জোঁকের সঙ্গে একত্র থাকিতে হয়।

কী দরিদ্রই না তাদের দেশ! দু'হাজার টাকা যার বছরে আয় অমন চৌধুরী, বোস ও রায়েরা দেশের মস্ত এক একজন জমিদার। এমন জমিদারও আছে যারা আঙুলে পৈতা পেঁচাইয়া মেছোদের হাত ধরিয়া বলে, দু'টো পয়সা ছেড়ে দে ভাই। বামুনের ছেলেমেয়েরা খেয়ে আশীর্বাদ করবে।

সে নিজেও তাদের গ্রামের একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কেহ দুই পয়সা ধার পাওয়ার জন্য, কেহ বা বিনা স্বার্থেই তার সুখ্যাতি করে। প্রশংসা করে রাজেশ্বরের জমির, তার হাল, গরু-বাছুরের।

এইসব কারণে নিজের সম্বন্ধে তার বেশ উঁচু ধারণা হইয়াছিল। আজ তাহা ভাবিলেও হাসি পায়।

রওনা হইবার আগের দিন দলের সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া কালীঘাটে ডালি দিল। রাজেশ্বর দিল পাঁঠা। দেবীকে মনে মনে বলিল, মা আমায় বড় কর, খুব বড়—এই কলকাতার বাবুদের মতন। বলিয়াই লজ্জা বোধ করিল। ভয়ও হইল, মা যদি এই লোভের জন্য তার উপর রাগ করেন।

ছেলেবেলা হইতেই রান্নার অভ্যাস, তাই রাজেশ্বর নিজের হাতে মহাপ্রসাদ রাঁধিল। সকলকে খাওয়াইয়া নিজের জন্য রাখিল মাত্র এক টুকরা মাংস। মায়ের প্রসাদী না হইলে তাহাও রাখিত না। খাইয়া সকলেই সুখ্যাতি করিল। একজন বলিল, একটা সোটেলে

রাঁধলেও মাসে তিনডা টাকা মাইনা পাইথা রাজু। তোমার বড়লোক হওয়া কোনো শালা আটকাইতে পারত না।

কথাটা রাজেশ্বরের কানে বাজিল। তিন টাকার বড় লোক! দারিদ্র যেন মানুষগুলার হাড়ে বাসা বাঁধিয়াছে।

সে দেশে ফিরিল কতকগুলি রঙিন জামা ও নানা নক্সার, নানা পাড়ের দুই গাঁট ধুতি ও শাড়ী লইয়া। চাঁপার জন্য আনিল এক জোড়া হাতী পেড়ে, পাছা পাড় শাড়ী। পাড়ের একদিক লাল, একদিক হলদে। আর একখানা আনিল পার্শী শাড়ী। চাঁপার মেজদা নারাণের বৌর ঐ রকম শাড়ী আছে, পরিয়া সে নিমন্ত্রণে যায়, সকলে তার দিকে চাহিয়া থাকে।

দেশে পৌঁছিয়া দ্বিতীয় দিনেই রাজেশ্বর লোকের মুখে শুনিল তার হাতী চড়ার গল্প। অনেকেই বলিল, শুধু নিজে চড় নাই, আর সগলডিরেও পয়সা দিয়া চড়াইছ। এরেই কয় বড় মানুষ!

জবা একদিন প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে বল দেখি, মণ্ডল? কলকাতা থেকে এসে অবধি গম্ভীর হয়ে থাক। সদা সর্বদা কি যেন ভাব। হ'ল কি তোমার?

রাজেশ্বর বলিল, আমরা নেহাত ছোট, নেহাত গরিব। ভাবি এই কথা।

জবা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, তুমি গরিব?

হ্যাঁ জবা, শুধু আমি নই। আমার এ দেশটাই গরিবের। রাজেশ্বর এবার কলিকাতার ধনৈশ্বর্য ও প্রাচুর্যের গল্প করিয়া বলিল, আমাদের যেন পুঁটি মাছের প্রাণ, দু'পয়সায় মরি বাঁচি।

জবা বলিল, তুমিও বড় হবে, খুব বড়, ঐ ওদের মতন।

কথাটা রাজেশ্বরকে যেন নূতন প্রেরণা দেয়। চাঁপা ইহা বলিলে সে আরও খুশি হইত। কিন্তু সে স্বামীর কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করে নাই। দুর্গোৎসবের কয়দিন আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে ও পূজা বাড়ী-গুলির নাটমন্দিরে নূতন পার্শী শাড়ী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

রবিবারের হাট। হাটের নীচের খাল এবং দুপাশের জলের ডাঙা নৌকা ও তালের ডোঙায় ছাইয়া গিয়াছে। জলের বুকে নৌকার মতন ডাঙায় কালো কালো মানুষেব অসম্ভব ভিড়। স্বল্প পরিসর স্থানে ঠেলাঠেলি করিয়া কোন রকমে তারা চলাফেরা কবে। কারও পবনে লুঙ্গি, কারও বা জোলার ধুতি, কাঁধে গামছা।

গরিব চাষী মাচার লাউ, কুমড়া, খেতের বেগুন, লঙ্কা লইয়া আসিয়াছে। বেচিয়া চাল কিনিবে। কেহ বা দু'সের চাল আনিয়াছে, বিনিময়ে তেল-নুনের সংস্থান করিবে।

খালের বকচরে নীচের হাট বা নামাহাটে চাল, তরকারি ও মাছের কারবার। উপরের হাটে দু'সারি বড় দোকান, এগুলিতে চাল, ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেনেতি মসলা, কাপড়, গেঞ্জি অনেক কিছুই বিক্রয় হয়। এদের ঘরে গৃহস্থের সোনাদানা, গরিবের থালা, বাসন বন্ধক পড়ে। বন্ধক পড়িলে খালাস আর বড় হয় না।

এই দুই সারির মাঝখানে ছোট ছোট চালাঘরে অস্থায়ী দোকান বসে। হাটের সময় দোকানীরা বেসাতি লইয়া আসে। আনে ছুঁচসুতা, খেলনা, সাবান, তেল, নুন, পেটেন্ট ঔষধ, তাবিজ, কবচ, অর্শের মলম আরও কত কি। এরই একখানা ঘরে রাজেশ্বর বিলাতী কাপড়ের দোকান করিয়াছে। কাপড়ের সঙ্গে সে তৈয়ারী জামা, ফ্রক, পেনি, এবং জোলার তৈরী শাড়ী ও গামছা বেচে। অন্য দোকানীদের মতন হাটবারে সন্ধ্যার পরে ব্যবসা

গুটাইয়া চলিয়া যায়। পরের হাটবার পর্যন্ত শূন্য চালাগুলি খাঁ খাঁ করিতে থাকে। মাঝে মাঝে হয়ত একটা পথচারী কুকুর আসিয়া ঝিমায়।

সেদিন দেখা গেল এক নূতন ধরনের ব্যাপার। হাটের পূর্ব প্রান্তে বটগাছে ঝুলান লাল শালু, তার উপর লেখা,—

"দয়াল প্রভু তোমাদের তরাইতে আসিয়াছেন"

এর পূর্বে কোন প্রভুর আগমনবার্তাই এ ভাবে ঘোষিত হয় নাই। কেহ মনে করিল, হিমালয়ের গুহাবাসী কোন বাবাজী আসিবেন। তার চেলাদের সঙ্গে নিখরচায় গাঁজা টানিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া একদল উল্লসিত হইল। পুরাতন রোগীরা কবচ, তাবিজের আশা করিল। কেহ স্থির করিল, এই সাধুর পা জড়াইয়া ধরিবে। বলিবে, কিছু পাইয়ে দাও প্রভু। বড় জড়িয়ে পড়েছি।

কিন্তু জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর পরিবর্তে দেখা দিল অতি সাধারণ চেহারার কয়েকটি লোক। তাদের দু'জনের গায়ে গলাবন্ধ কোট, পায়ে চীনাবাড়ীর সস্তা জুতা। আর দুজন নগ্নপদ। একজনের গলায় দড়ি দিয়া ঝুলান হারমনিয়াম। অপরের পিঠে মথি, জন ও লুক লিখিত সুসমাচারের বোঁচকা। তারা শালুর তলায় দাঁড়াইয়া প্রথমে কাশিল, তার পর মুখ মুছিল, আবার কাশিল পরে সমস্বরে শুরু করিল খৃষ্ট সঙ্গীত। গানটি এইরূপ—

জয় জগত তারণ প্রভু ক্রুশ-সুশোভন
অপার করুণা তব মেরীর নন্দন।
মোদের মঙ্গল তরে চিন্ত নিশিদিন
পাপীদের ত্রাতা পাতা, জয় নাজারিন।
আধি-ব্যাধি নাশ কর প্যালেষ্টাইন পতি
ঈশ্বর তনয় বট পাপীদের গতি
নাজারিন জয়, জয় ক্রুশ-সুশোভন
করুণনিধান প্রভু, বেথলেম-রঞ্জন।

হারমনিয়মের বাজনার সঙ্গে গান এর আগে অনেকেই শোনে নাই। তাই দলে দলে আসিয়া ভিড় করিল। গায়কদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল।

গানের পর আরম্ভ হইল বক্তৃতা। দলের মধ্যে সবচেয়ে বেঁটে, মোটা-সোটা লোকটি একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, হে ভ্রাতাগণ, উনিশ শত বৎসর পূর্বে, আপনার ও আমার মতন পাপী তাপীদের উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র প্যালেষ্টাইনের অন্তঃপাতী বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন। পরম পিতাই তাঁকে পাঠাইয়া দেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করিল, ও মশয়, আমি পাপী না।

বক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বলিলেন যে তিনি পাপী নন?

আমি চূড়ামণি শীলের ছাওয়াল জগন্নাথ।

প্রচারক কহিলেন, বন্ধো, উত্তম, তবে প্রশ্ন এই যে কদাচ কি আপনার পরের দ্রব্যে লোভ হয় নাই, আপনি কি কখনো কাহারও কুৎসা করেন নাই? প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি কি কভুও কুটিল কটাক্ষপাত করেন নাই।

প্রশ্নগুলিতে বিব্রত বোধ করিয়া জগন্নাথ সরিয়া পড়িল। প্রতি-পক্ষের এই পরাজয়ে আরও উৎসাহিত হইয়া প্রচারক পাপ, অনুতাপ ক্রুশ ও জর্দন নদী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কহিলেন, মুক্তির একমাত্র উপায় যীশুর চরণে শরণ লওয়া। আমরা তাঁর দীন পতাকাবাহী।

তার সহকর্মীরা পুস্তিকা বিতরণ আরম্ভ করিলে প্রচারক কহিলেন, পড়ে দেখবেন। যাঁরা পড়তে জানেন না তাঁরা অপরকে দিয়ে পড়াবেন। দেখবেন, কী অপূর্ব বাণী।

কাছে কোন খৃষ্টীয় মিশন নাই. ক্রুশ, জর্দন প্রভৃতি সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না, তাই লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগিল। কে এই

মহাপুরুষ? অজানা মঞ্জরীর মানুষের জন্য প্রাণই বা তিনি দিলেন কেন? তিনিই কি ভগবানের একমাত্র পুত্র? তবে কার্তিক, গণেশ এঁরা কি?

এতদিন তারাও দেব দেবীকে মা বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে, তারা নিজেরা কি ভগবানের কেহ নয়?

এই বক্তৃতায় ছেলেদের উৎসাহই বেশী, তারাই ভিড় করে। সুসমাচার সংগ্রহ করিতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া তারা ঘুড়ি বানায়, বেতের কাঁটা দিয়া ছবিগুলি বেড়ায় আটকাইয়া রাখে।

প্রতি হাটেই প্রচার চলে। খৃষ্টধর্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, জগতের বেশীর ভাগ লোকই তাই এই ধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছে। তাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়াই খৃষ্টানরা জগতের রাজা। মহারাণী ভিক্টোরিয়া খৃষ্টান। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খৃষ্টান, পুলিশ সাহেব খৃষ্টান। রাজার ধর্ম অথচ ইহাতে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নাই। সবাই সমান।

বক্তা বলেন, ধরুন আমার কথা। হিন্দু সমাজে আমি ছিলাম অন্ত্যজদের একজন। কোন অধিকারই ছিল না। ভগবানের প্রিয় বিগ্রহ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিতাম না। আজ আমি পুরোহিত হইয়াছি। এই অধিকার আপনাদের মধ্যে কি কেহ কল্পনা করিতে পারেন?

এই কথাটা রাজেশ্বরের চিত্তে দোলা দিল। সত্যই ত, মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা কতটুকু? সে যে সমাজপতি, তারও কিছুমাত্র নাই, অগ্নি মণ্ডলেরও ছিল না৷ অনেক দিন আগের কথা। ত্রিগুণাদের উঠানে সে খাইতে বসিয়াছে। পরিবেশন করিতেছেন ত্রিগুণার মা। মহিলা নিজেই রাজেশ্বরকে ছুঁইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, এ্যাঁ তোকে ছুঁয়ে ফেললাম, আবার নাইতে হবে।

একটু আগেই একটা বিড়াল তার কাপড়ে মুখ ঘসিয়াছিল, তখন স্নানের কথা মনে পড়ে নাই। পড়িল মানুষকে ছুঁইয়া। ত্রিগুণার মা তাকে পুত্রের মতনই স্নেহ করিতেন কিন্তু সংস্কার পুত্রস্নেহকে ছাপাইয়া গেল।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিগুণা। সে তাদের মানুষ মনে করে, মানুষের মর্যাদা দেয়। কিন্তু সে নিজেই সমাজের কেহ নয়।

রাজেশ্বর একবার অগ্নি মণ্ডলকে বলে, বামুনের পায়ের ধূলো পর্যন্ত আমরা নিতে পারি না। এ কী অবিচার।

অগ্নি মণ্ডল নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেন, পারব কেমনে, আমারগো ত' ছুঁইতে নাই।

যুগপরম্পরাগত সংস্কারই শেষে এমন ভাবে যুক্তিতে পরিণত হয়। রাজেশ্বর মনে করে এই যে অবিচার, এর জন্য দায়ী সমাজ-ব্যবস্থা।

এই সময় অনেকদিন পরে ত্রিগুণা বাড়ি আসিল। এবার সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। রান্নাঘরে প্রবেশ নিষেধ। থাকে বৈঠকখানায়, খায়ও সেখানে। বৃদ্ধা মা দরজায় দাঁড়াইয়া খাওয়া দেখেন। তার মেজদা কালীচরণ হাটে ঘাটে এই ব্যবস্থার বড়াই করিয়া বেড়ায়। বলে ভাইয়ের জন্য ত আর সমাজ ছাড়তে পারি না।

পণ্ডিতের দেশ বলিয়া তখনও নেপালপুরের খ্যাতি যথেষ্ট। কিন্তু ত্রিগুণা দেখিল, বর্তমান জগতের সঙ্গে চলিতে হইলে চাই ইংরেজী শিক্ষা। সে দেশে আসিল একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প লইয়া। স্কুলটি যাহাতে সাধারণের হয় সেইজন্য সে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিল। সকলের নিকট সাহায্য চাহিল। রাজেশ্বরকে বলিল, তুমি কি ক'রতে পার?

রাজেশ্বর বলিল, পারি সবই। তুমি যা বলবে, করব। সব কাজেই আমি তোমার পেছনে আছি।

ত্রিগুণা বলিল, তা আমি জানি।

রাজেশ্বর বলিল, কিন্তু একটা কথা আছে ভাই, যদি কিছু মনে না কর ত' বলি।

কি কথা ?

স্কুলে আমাদের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে একত্র বসতে পারবে ত' ? সকল বিষয় সমান অধিকার পাবে ?

ত্রিগুণা উত্তর করিল, ওঃ এই কথা ? নিশ্চয় পাবে।

বন্ধুর আশ্বাসবাণীতে রাজেশ্বর অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাদের ছেলেরা বামুন কায়েতের ছেলের সঙ্গে একত্র পড়িবে, পাশ দিবে, এ কি কম সুখের কথা ? ভাবিলেই তার চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের পর মুক্তির অরুণ আভাস।

স্কুলের কথা শুনিয়াই একদল প্রাচীনপন্থী মন্তব্য করে, ম্লেচ্ছ-শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, সর্বনাশ! ষ্টীমার পরগনার কাছে এসে পড়ায়ই কত অনাচার ঢুকেছে, তার উপর স্কুল হলে ত' আর কথাই থাকবে না।

রাজেশ্বরের প্রস্তাব শুনিয়া তারা বলিল, এই ত' অনাচারের প্রথম ধাপ। আর বেটার আস্পর্দ্ধাও কম নয়। মুনি ঋষিদের ব্যবস্থা ভেঙে মুড়ি-মিছরির একদর করতে চায়!

এই কটুক্তি রাজেশ্বরের কানে গেল। ত্রিগুণা বলিল, কিছু মনে ক'র না ভাই।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিল, মনে করব কি ? ও আমাদের সয়ে গেছে। তোমাদের অবিচার আছে সত্য। কিন্তু এও ত' ভুলতে পারি না, যে আমাদের রক্ষেও করেছ তোমরা। যেখানে তোমরা আছ সেখানে অন্ততঃ আমার জাত ভাইরা দলে দলে ধর্মত্যাগী হ'য়ে যায়নি। আর অন্য জায়গায় দেখ ধর্মত্যাগীর বহর।

স্কুলের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা বসে। জাতির ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাজেশ্বর প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত থাকে। চাঁদার জন্য জাত-ভাইদের বাড়ি বাড়ি ঘোরে। কিছু টাকা সে সংগ্রহ করিয়াছে। কয়েকটি মৌজায় মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি বসাইয়াছে। নিজে দিয়াছে দুই বাঁধ টিন, চারটা শালের খুঁটি। স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন দিবে আরও পঁচিশটা টাকা এবং বড় একটা ঘড়ি।

কাঠিগাঁওয়ে চাঁদা আদায় করিতে গিয়া রাজেশ্বরের মনে পড়িল নগরবাসী বাড়ৈর কথা। একদিন এই নগরবাসী তার জীবন দান করিয়াছিল, তারপর কাটিয়াছে অনেক দিন। আর দেখাশুনাও হয় নাই। কয়েকদিন আগে রাজেশ্বর শুনিয়াছিল সে অসুস্থ। স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তার বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল।

উঠানে হোগলার চাটাইয়ের উপর একটি নর-কঙ্কাল বসিয়া আছে। নগরবাসী বলিয়া তাকে চেনাই যায় না। অস্থিপঞ্জর বাহির করা এই মানুষটিরই মতন তার আবাসগৃহ।

কিন্তু এই দৈন্যের মধ্যেও সবই যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গোবর নিকান, ঝাঁট দেওয়া উঠান, পাশেই বেল, চাঁপা, জুঁইএর বাগান, আর একধারে বেগুন লঙ্কার খেত। মাচায় লাউ-কুমড়া। এই সবের সবুজ শোভা দুঃখ-দারিদ্র্যকে যেন আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

এস রাজু—বলিয়া রাজেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই নগরবাসী কাশিতে আরম্ভ করে। খুক্ খুক্—থক্ থক্ সঙ্গে তাজা রক্ত। কাশির শব্দ শুনিয়া টগর ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিতেছিল। সামনে রাজেশ্বরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া নগরবাসীর কাছে আসিয়া বসিল। তার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরম স্নেহভরে বলিল, এখনই কমে যাবে।

গাঢ় গয়ের টানিয়া তুলিতে কষ্ট হয়, কাশিতে কাশিতে নগরবাসীর বুক যেন ভাঙ্গিয়া যায়। ধীরে ধীরে সে কাঁধের উপর এলাইয়া পড়ে। টগর ভিজা ন্যাকড়া দিয়া তার মুখের মধ্য হইতে রক্ত মিশানো গয়ের টানিয়া বাহির করে। নগরবাসী তার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। শিশুর মতন তার হাতের চুড়ি দুইগাছা লইয়া নাড়াচাড়া করে। তাদের প্রেমের নিবিড়তায় রাজেশ্বর মুগ্ধ হইয়া যায়।

নগরবাসী একটু সুস্থ হইলে রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, আমায় খবর দাওনি কেন?

টগর হাসিয়া উত্তর করে, দেব কোন্ সাহসে?

রাজেশ্বরের মনে পড়ে তার সঙ্গে চাঁপার ব্যবহারের কথা। সে বলে, যমের হাত থেকে তোমরা আমায় টেনে তুলেছ। তোমাদের দাবি যে অনেকখানি।

নগরবাসী হাত তুলিয়া জানায়, রক্ষা তারা করে নাই, করিয়াছেন যিনি রক্ষা করার মালিক—তিনিই।

নগরবাসী ভুগিতেছে আজ প্রায় দুই বৎসর। মাঠে একটি ছেলেকে ষাঁড়ে তাড়া করে। নগরবাসী তার শিং ধরিয়া আটকায়। ছেলেটি রক্ষা পায় বটে কিন্তু নগরের সেই হইতেই অসুখ। প্রথমে বুকে বেদনা, পরে আরম্ভ হয় জ্বর, কাশি ও রক্তবমন।

সংসার চালায় টগর। আগে সে বাড়ি বাড়ি ধান ভানিত। এখন ধান নিজের বাড়িতে লইয়া আসে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমাস্পদের কাছে ছুটিয়া যায়। টগর গাঙে বঁড়শি পাতিয়া মাছ ধরে, গাছের ফল পাকুড় গাঁয়ের ছেলেদের দিয়া হাটে পাঠায়, বেতের ধামা, কুলা তৈয়ারি করিয়া বেচে। আগে এতেই বেশ চলিত। এখন নগরের সেবা, করিয়া সময় পায় না। তারই ফলে আরম্ভ হইয়াছে

দারিদ্র্য। বাপের দেওয়া তাগা, বালা রূপার মল যা ছিল সবই বেচিয়াছে। ঔষধের পয়সা জোটে না, তার বদলে দেয় দূর্বা ও বাসকের রস আর সপ্তাহে দুবার নারঙ্গী ফকিরের কবচ ধোয়া জল।

সেই দিনেই রাজেশ্বর নগরবাসীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিল। মঞ্জরীর হরসুন্দর কবিরাজের উপর দিল চিকিৎসার ভার। সে নিজে মধ্যে মধ্যে কাঠিগাঁওয়ে গিয়া নগরকে দেখিয়া আসে। একবার তাদের নিকট মঞ্জরীতে আসিয়া থাকিবার প্রস্তাব করিলে নগর আপত্তি করিল। তার ইচ্ছা, শেষ কয়টা দিন টগরকে লইয়া এইখানেই একটু নিরালায়, নিরিবিলিতে থাকে। এখানে যেমন আত্মীয়, স্বজন নাই, তেমনই নাই নিন্দা-কুৎসা। নাই গায়ে-পড়া স্নেহের অত্যাচার।

রাজেশ্বরের মনে পড়ে আর একটি নারীর কথা—সে নগরবাসীর স্ত্রী নৃত্যকালী। সেও নগরকে ভালবাসে। দাবি তার আরও বেশী। কিন্তু সে পায় নাই কিছুই। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাকে বঞ্চিতই থাকিতে হইবে। কে জানে?

স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিন রাজেশ্বরের বড় ছেলে মহেশ্বর সপ্তম শ্রেণীতে ভরতি হয়। সেই প্রথম নমঃশূদ্র ছাত্র। তারপর আসিল আরও কয়েকজন। অবস্থা প্রায় সকলেরই সচ্ছল। কিন্তু অভিভাবকরা মনে করিলেন, এ আবার এক অপব্যয়। ত্রিগুণা কয়েকটিকে হাফ ফ্রি করিয়া নিল। সেক্রেটারী আপত্তি করিলে কহিল, অভ্যেস হ'ক তখন আপনা থেকেই মাইনে দিয়ে পড়বে। একটি গরিব ছেলের বেতনের ভার নিল রাজেশ্বর।

কমিটিতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। রাজেশ্বর ছিল, ছিলেন ওলফাত কাজী সাহেব। তিনি উপলব্ধি করিতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে পিছন ফিরিয়া থাকার অর্থ, তাঁর জাতির অকল্যাণ। তাঁর চেষ্টায় কয়েকটি মুসলমান ছেলে স্কুলে ভরতি হইল। মহেশ্বর ক্লাস প্রমোশনের সময় প্রথম হইল। তার পরের বার হইল সকল বিষয়ে প্রথম। কেহ কেহ ইহাতে খুশি হইতে পারিল না, বলিল, ঘোর কলি কি-না, তাই এসব অঘটন ঘটছে।

মহেশ্বরের সাফল্যে জবার বড় আনন্দ। দুর্গা ও মহেশ দুজনকে চাঁপা একা সামলাইতে পারিত না। দুর্গা ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুদিন আগেই মহেশের লালন-পালনের ভার পড়ে জবার উপর। তার কোলেই মহেশ্বর মানুষ হয়। তাই নিঃসন্তান এই রমণীর তার উপর একটা অদ্ভুত টান ছিল। ছেলেবেলা মহেশ কাঁদিলে সে তাকে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইত, কত খেলনা দিত। এখনও আর সকলকে লুকাইয়া খাবার দেয়। বড়

মাছখানা, মাছের মুড়োটা পড়ে মহেশ্বরের পাতে। জবা তার সাফল্যে আনন্দিত হইয়া আশীর্বাদ করে, তুই রাজা হ,—রাজ-রাজেশ্বর—বলিয়াই লজ্জায় জিভ কাটে।

আর আনন্দ ত্রিগুণার। ছাত্রদের সে বলে, মহেশের মত হবার চেষ্টা কর। বর্ণাশ্রমীদের সঙ্গে তর্ক করে, শিক্ষার অধিকার যে বর্ণবিশেষের একচেটে নয় তার প্রমাণ এবার পেলেন ত' ?

একদিন কোনও ব্রাহ্মণ ছাত্র নীচ জাতীয় কোন সহপাঠীকে জাতি তুলিয়া গালি দিলে ত্রিগুণা অপরাধীকে উঠানে দাঁড় করাইয়া সকলের সামনে বেত মারে। ছেলেদের বলে, এরূপ অপরাধে ভবিষ্যতে আরও অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

ছেলেটির অভিভাবকগণ তুমুল আন্দোলন তুলিল, ধর্ম রসাতলে যাইবে, দেবতা বামুনকে আর লোকে মানিবে না।

ত্রিগুণার বিরুদ্ধে একটি ছোটখাটো দল গড়িয়া উঠিল।

কথাটা তার কানে গেলে ত্রিগুণা স্কুলের সেক্রেটারীকে দিয়া স্কুলের হিতৈষীগণের এক সভা ডাকাইল। কমিটির সভ্যগণ, ছেলেদের অভি-ভাবকেরা এবং গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত হইলেন।

ত্রিগুণা সভায় পদত্যাগ-পত্র পেশ করিয়া বলিল, আমি মনে করি জাত তোলা আর বাপ মা তুলে গালাগালি, দুইই সমান। সেদিন এইজন্য কোন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে আমি শাস্তি দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁদের জাত্যভিমানে আঘাত লেগেছে। তাঁরা চান যে আমি পদত্যাগ করি। সেইজন্যই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনারা আমাকে মুক্তি দিন!

অনেকেই পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিল।

ত্রিগুণা বলিল, ভবিষ্যতেও ছাত্রদের এরূপ অশিষ্টতা আমি বরদাস্ত ক'রব না। এই নিয়ে গোলমাল চলতেই থাকবে, অভিভাবকেরা অসন্তুষ্ট হবেন। তার চেয়ে এখনই আমায় বিদায় নেওয়া ভাল।

মানুষ হিসাবে ত্রিগুণাকে সকলেই পছন্দ করিত। জানিত সে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। এই পদ গ্রহণ তার পক্ষে একটা বড় ত্যাগ। এণ্ট্রান্স হইতে এম, এ পর্যন্ত সব পরীক্ষায়ই সে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। চেষ্টা করিলেই ভাল চাকরি পাইত। উকিল হইলেও উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু নেপালপুরের বিলে আসিয়া পঞ্চাশ টাকায় মাষ্টারী নিল শুধু দেশের মঙ্গলের জন্য। ছাত্রজীবন হইতেই সে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে জেলায় জেলায় স্বদেশী প্রচার করিল। বাংলার বাহিরে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে ঘুরিল।

যাহা সত্য বলিয়া বোঝে তাহার জন্য সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার করিতেই সে প্রস্তুত। এমন মানুষ দুর্লভ। সে চলিয়া গেলে স্কুল চালানোই অসম্ভব হইবে। তার স্থান দখল করিতে পারে এরূপ লোক পরগনায় আর নাই। প্রেসিডেণ্ট নীলকান্ত রায়, সেক্রেটারী প্রবোধ বাবু, ওলফাত কাজী সাহেব অনেকেই তার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিল রাজেশ্বর। সে বলিল, জীবনে এই আমার প্রথম বক্তৃতা, আপনারা আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। হেড মাষ্টার মশাইর আমি ভিটাবাড়ির প্রজা, আমি তাঁর ধর্মভাই, তাঁরা আমার প্রতিপালক। কিন্তু এইজন্যই যে আমি তাঁর সপক্ষে কথা বলছি তা মনে করবেন না। ছেলেবেলা থেকে আমি তাঁকে দেখে এসেছি, পুবের সূর্য পশ্চিমে ওঠা সম্ভব কিন্তু আমার ত্রিগুণ ভাইর দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আপনারা তাঁকে রাখুন, বেঁধে রাখুন, না হলে ঠকবেন।

বলিয়া একটা নমস্কার করিয়া সে বসিয়া পড়িল। ত্রিগুণার সহকর্মী শিক্ষকগণ এই মতের প্রতিধ্বনি করিল। ছাত্ররা পতাকা লইয়া আসিয়াছিল, তাতে লেখা We want our dear Headmaster. সভার বাহিরে দাঁড়াইয়া তারা মধ্যে মধ্যে ত্রিগুণার জয়ধ্বনি করিতে

লাগিল। বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় নগণ্য, তারা আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সকলের অনুরোধে ত্রিগুণা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিল।

তার এই জয়ে, তার এই লোকপ্রিয়তায় রাজেশ্বরের ভারী আনন্দ হইল। বাড়ি ফিরিবার পথে সে বন্ধুকে বলিল, দেখ্‌লে ত' ভাই, ধর্মের কেমন জয় হল? রাজেশ্বরের বিশ্বাস ভগবান তার জাতির দিকে এবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। ত্রিগুণ ভাই চলিয়া গেলে নমঃশূদ্রদের পড়াশুনার অসুবিধা হইত। উন্নতিতে বাধা পড়িত। তার দেশ ছাড়িয়া যাওয়া ভগবানের ইচ্ছা নয়।

সে বলিল, তুমি গেলে আমাদের জাতের লেখা পড়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যেত। তারপর একটু থামিয়া কহিল, আমাকে লেখাপড়া শেখাবে ভাই? তোমাদের ঐ কালো কালো হরফগুলোর মধ্যে কি যেন যাদু আছে, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

ত্রিগুণা বলিল, বেশ ত'। স্থির হইল রাজেশ্বর রাত্রে যাইয়া তার কাছে পড়িবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে যাওয়া হইত না। সংসার, চাষবাস, কারবার, দোকান, এর উপর আছে সালিশি পঞ্চায়তি।

সে ঠিক করিয়াছিল পড়ার সময় সালিশির কোন কথা কানে তুলিবে না। কিন্তু উপায় নাই। বাহির হইবে এমন সময় কেহ আসিয়া বলিল, চল মণ্ডল, একবার আমাদের জমিতে চল। কালা আমার জমির আইল ভাইঙ্গা নিজের জমি বাড়াইতেছে। কেহ বা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, মোড়ল যখন হইছ তখন তুমিই মা বাপ বড়কুটুম ছোটকুটুম সকলই তুমি। গোপাল কি মাইরটাই না আমারে মারছে। এই দেখ দাগ।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মারল কেন?

কেডা তার ফাপুরা চুরি করছে, জানে কোন্ শালা। কিন্তু আমারে চোর কইয়া একেবারে রক্ত বরিষণ করিয়া ছাড়ছে! ভীমসেন যেমন জরাসন্ধরে মারছিল রকমডা সেই প্রকার।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করেছ ?

গেছিলাম করালী ভুঁইয়ার কাছে, তিনি কইল টাকা লইয়া আইস, চল থানায়।

করালীর উদ্দেশ্য রাজেশ্বর ভালই জানে। করালী ও ঐ শ্রেণীর লোকেরা ফরিয়াদি এবং আসামী উভয় পক্ষের নিকটই টাকা খায়। যে গরিব তার ঘটি, বাটি বাঁধা পড়ে। একবার তাদের কাছে গেলে ফিরিবার উপায় নাই। তুমি ফরিয়াদী, তুমি দরিদ্র, কিন্তু তোমাকে শোষণ না করিয়া ছাড়িবে না।

রাজেশ্বর বলিল, বেশ, আমি এর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটা কথা, গোপাল রোগা মানুষ আর তুমি এতবড় জোয়ান, সে একা তোমায় মারল কি করে ?

লোকটা হাসিয়া বলিল, এই বুদ্ধি লইয়া তুমি মোড়লগিরি করবা ? সে হৈল টাকাতিয়া মানুষ, কত তার পয়সা।

লোকটা এক কথায় ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি রেখা-চিত্র আঁকিয়া দিল। ব্যক্ত করিল তার জীবন-দর্শন।

প্রতি বছরই আশ্বিন মাসে নেপালপুর অঞ্চলের বিলের জল নদীর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। জল পচিয়া গন্ধ হয়, তাব রূপ হয় নিকষ কালো।

এবার পুজার পর আর বৃষ্টি হয় নাই। পুজার বলির মহিষের ছিন্নমুণ্ড ও ধড় খাল ও গাঙের ধাপদলে আটকাইয়া পুতিগন্ধ ছড়াইয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে হাজারো রোগে জীবানু।

কার্তিক মাস হইতেই লোকের অজীর্ণ শুরু হয়। অগ্রহায়ণের নূতন জল, নূতন গুড় এবং সর্বোপরি নবান্ন মহামারীকে ডাকিয়া

আনে। ঘরে ঘরে কলেরা লাগে। সুস্থের চেয়েও রোগীর সংখ্যা বেশী। গুজব ওঠে নানারকম। কেহ কালীর জিহ্বা কাঁপিতে দেখিয়াছে, কেহ ভট্টের বাগানে কান্না শুনিয়াছে—সে কান্না কুকুর, কেঁদো ও মানুষের কণ্ঠস্বরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। একদল গাঁজা টানিতে শুরু করিয়াছে। তাদের ধারণা গাঁজার মাহাত্ম্যে রোগ আর দেহের ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। আর একদল কীর্তন করিয়া ওলাদেবীকে তাড়াইতে চায়। কীর্তনে যে কম্পন হয় তার চোটে রোগের জীবাণু নষ্ট হইবে এই তাদের বিশ্বাস। কম্পন সত্যই গুরুতর। করতালের বাজনা, কীর্তনীয়াদের বেসুরো গলা, ঢোলের আওয়াজ আর তার সঙ্গে মেশে পেঁচার ডাক, বাজকুড়াল পাখীর বিকট চীৎকার। ওলাদেবীর শ্রবণশক্তি থাকিলে তিনি এই শব্দের ভয়ে নিশ্চয়ই পলাইয়া যাইতেন।

ত্রিগুণা রোগীর সেবায় লাগিয়া গেল, সঙ্গে নামিল রাজেশ্বর এবং আরও দু'চার জন। সংখ্যায় তারা কম, সে তুলনায় কাজ খুব বেশী। শুধু রোগীর শুশ্রূষাই নয় তার উপর আছে খবরদারি, রোগের সংক্রামকতা যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে সেই জন্য চৌকিদারের কাজ।

এদিকে লোকে তাদের ফাঁকি দিতে পারাই একটা বাহাদুরি মনে করে। এদের চোখের আড়ালে খাল ও গাঙে রোগীর মলমূত্র ফেলে, ময়লা কাপড় ধোয়। অথচ এই জলের উপরই পনর আনা লোকের নির্ভর।

চিতায় মড়া তুলিবার লোকও সর্বসময় পাওয়া যায় না। মুখে আগুন ছোঁয়াইয়া লোকে মড়া ভাসাইয়া দেয়। শকুন চিলে শব ঠোক্রাইয়া খায়। মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকে!

পূর্ণ ঘরামির ঘরে পাশাপাশি তিনটি রোগী তিন ভাই। শুশ্রূষাকারী রাজেশ্বর একা। পাশে বসিয়া তাদের বৃদ্ধা মা।

মধ্যরাত্রে বড় ভাই যাদব মারা গেল। মা ছেলের বিছানার উপর পড়িয়া আর্তনাদ শুরু করিলেন। কখনও যাদবকে বুকে টানিয়া নেন, কখনও তার মুখে চুমা খান। শয্যাশায়ী আর দুই পুত্রের মঙ্গলের দোহাই দিয়া রাজেশ্বর তাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

মায়ের চীৎকার শুনিয়া ছোট ভাই লেছু খানিকক্ষণ শিবনেত্র হইয়া চাহিয়াছিল। সে একটু উঠিবার চেষ্টা করিল এবং সেই আয়াসে তারও শেষনিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তার জননী ইহা লক্ষ্য করিলেন না। তখনও তিনি যাদবের জন্য চেঁচাইতেছেন।

এই সময় আসিল জগু ধোপার মৃত্যুসংবাদ। রাজেশ্বরের এখনই যাওয়া দরকার। পুত্রের মৃত্যুর পর জগুর মা আগুন লইয়া নাচিতেছে। নিজের ঘরে সে আগুন দিবে। সে চেঁচাইতেছে, এ সকলই মিছা, পুড়িয়া সব ছাই হইয়া যাউক।

জগুর বাড়িতে আর কেহ নাই। রাজেশ্বর না গেলে পুত্রশোকাতুরা পাড়াকে-পাড়া জ্বালাইয়া দিবে।

জগুর মা চিকিৎসা করায় নাই। নারঙ্গী ফকিরের মন্ত্র-পড়া মাটি দিয়া ছেলের সর্বাঙ্গ লেপিয়া রাখিয়াছিল। ফকিরের এই মাটিতে একজনের অসুখ সারে। সেই হইতেই তার চিকিৎসার নামডাক।

নারঙ্গীর কুশলার বাড়িতে রোগীদের প্রদত্ত শশা, কলা বাতাসার স্তূপ জমিয়া ওঠে। ফকির তাহা গরুকে খাওয়ায়। তাকে খাইতে অনুরোধ করিলে হাসিয়া উত্তর করে, গরুর মধ্যেও নারঙ্গী আছে ভাই।

একদিন চাঁপার কোলের শিশু তার তৃতীয় পুত্র ছয় ঘণ্টার কলেরায় মারা গেল। চাঁপা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। রাজেশ্বরও চলার মাঝ-পথে যেন একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। চাঁপা কহিল, এবার নিজের ঘরের দিকে একটু ফিরে চাও।

এই সময় মহামারী ত্রিগুণাকে আক্রমণ করিল। তার অভিযানের বিরুদ্ধে ত্রিগুণাই ছিল প্রধান শত্রু। তাই ব্যাধি আসিল প্রতিশোধের সঙ্কল্প লইয়া। দু'বার ভেদের পরেই ত্রিগুণার নাড়ী ছাড়িল। চিকিৎসকের মুখে হতাশার ভাব দেখিয়া রাজেশ্বরের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

পাঁচজনের জন্য ত্রিগুণা এতটা করিয়াছে, নিজের দিকে কখনও তাকায় নাই অথচ তার অসুখে শুশ্রূষার লোক পাওয়া যায় না। দেশের কি দুর্ভাগ্য! রাজেশ্বর বলে, আমরা আবার করি ধর্ম্মের বড়াই?

ত্রিগুণার মা ডাক্তারের জন্য মহকুমায় লোক পাঠাইলেন। সদা-সর্বদা তিনি ছেলের শিয়রে বসিয়া থাকেন, আহার নাই, নিদ্রা নাই —একটি কথাও বলেন না। মধ্যে মধ্যে একবার ডাকেন, মা তারা। রাজেশ্বর বলে, এ কী করছ মা, তোমারও যে অসুখ করবে। সুখদা বলেন, এর পরও কি আমার বেঁচে থাকতে হবে রাজু?

রাজেশ্বরও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা করিল। ক্রমে ক্রমে স্কুলের উচ্চশ্রেণীর দু'একটি ছাত্রও আসিল, আসিল মহেশ্বর।

চাঁপা স্বামীকে বলিল, নিজে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ, আবার ছেলেকেও টেনে নিলে?

আমি ত' নেইনি। নিজে গেছে। চাঁপা বলিল, ওকে ফেরাও।

রাজেশ্বর উত্তর করিল, পরের ছেলেকে যে ডাকে নিজের ছেলেকে সে নিষেধ করতে পারে না।

ত্রিগুণার মা ছেলেকে দেবদেবীর চরণামৃত খাওয়াইলেন। গলায় ও হাতে পরাইলেন অসংখ্য তাবিজ কবচ।

ত্রিগুণা সারিয়া উঠিল। মহামারীও দেশ হইতে বিদায় লইল। সুখদা পুত্রের অন্নপথ্য করার দিন মহাসমারোহে কালীপূজা দিলেন।

ত্রিগুণার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে গেলে সে মাথা সরাইয়া নিল না। বরং কপাল একটু আগাইয়া দিয়া জননীর পদধুলি লইল।

সুখদাসুন্দরী বলিলেন, হবেই ত' শ্বশুরঠাকুরকে দেখেছি, মোষবলির পর গায়ে রক্ত মেখে দুর্গার সামনে নাচতেন। তাঁর ত' নাতি, চিরকালের শাক্তবংশ।

বেগুনের চারা পুঁতিবার জন্য রাজেশ্বর নিজের বাড়ীতে মাটি কোপাইতেছিল। প্রত্যহ খানিকক্ষণ সে জমির কাজ করে। সে মনে করে চাষীর লক্ষ্মী থাকেন মাটিতে, নিজের হাতে তার সেবা দরকার। বাড়ীর পতিত জমিতে বেগুন, লঙ্কা, লাউ, কুমড়ার কৃষি করে। নূতন ভিটায় দেয় আলুর চাষ। এ অঞ্চলে আলুর চাষ কেউ করে না, জানেও না কি করিয়া মাটি কোপাইতে হয়, বীজ পুঁতিতে হয়। প্রথম দু'এক বছর রাজেশ্বরের ফসল ভাল হয় নাই। কারবারের কাজে বিদেশে ঘুরিবার সময় একবার সে আলুর চাষ ভাল করিয়া শিখিয়া আসিল। সেই হইতে তার ভিটায় আলু না যেন সোনা ফলে, লাভ হয় প্রচুর।

জমি কোপাইতে কোপাইতে সে বেশ ঘামিয়া গেল।

বেলা তখন প্রায় বারটা। এই সময় টগর আসিয়া বলিল, বাড়ৈ-বাড়ি একবার চল মণ্ডল, না হলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।

রাজেশ্বর তার আগের দিন নগরবাসীর মৃত্যু-সংবাদ পায়। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই খুনাখুনি বাধিবার মতন এমন কি হইল রাজেশ্বর তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করে, কেন হ'ল কি?

টগর বলিল, তাড়াতাড়ি চল। পথে সব শুনবে।

কাঁধের উপর গামছা ফেলিয়া হাতে লাঠি লইয়া রাজেশ্বর টগরের সঙ্গে চলিল। যাইবার আগে চাঁপাকে বলিল, বাড়ৈ বাড়ী যাচ্ছি, সেখানে খুব গোলমাল।

চাঁপা বলিল, বেলা হয়েছে এখন না খেয়ে যাবে? টগর বলিল, দেরি করলে ভারী অনর্থ ঘটবে যে বোন।

চাঁপা যেন তাকে দেখিতেই পায় নাই এমনভাবে স্বামীর উদ্দেশে বলে, গোলমাল ত' সঙ্গে লোক নিয়ে যাও।

রাজেশ্বর উত্তর করে, আজ অবধি লোকের ত' আমার দরকার হয়নি কখনও।

টগর বলিল আমার সঙ্গে একা দিতে বোধ হয় ভয় করছে, তাই না ভাই?

কথাটা অন্য কেহ বলিলে হয়ত তাদের কানে বাজিত কিন্তু টগরের বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন সহজ স্বাভাবিকতা ছিল যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।

চাঁপা বলিল, ভয় কিসের? আমার সোয়ামীকে কি আমি চিনি না?

নগরবাসীদের বাড়ীর পথে রাজেশ্বর টগরেব কাছে সবই শুনিল।

একদিন নগরের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়ে। সে টগরকে বলে, ওকে ব'ল আমায় যেন ক্ষমা করে। টগর বুঝিল, সে তার স্ত্রী নৃত্যকালীর কথা বলিতেছে।

টগর আগে হইতেই তাকে খবর দেওয়ার কথা ভাবিতেছিল কিন্তু পাছে নগরবাসী চটিয়া যায় এই ভয়ে খবর দেয় নাই। আজ বলিল, নেত্যকে একবার আনাই তাহ'লে?

উত্তরে নগরবাসী কহিল, একটু তাড়াতাড়ি না এলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আশ্চর্য ব্যাপার! টগরের খবর পৌছিবার আগেই নৃত্যকালী ছেলে দু'টিকে সঙ্গে করিয়া নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়। এর আগে টগরের সঙ্গে সে কথা বলিত না, সেদিন পৌছিয়াই তার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, মন হু হু করছিল তাই ছুটে এলাম তোমাদের কাছে।

কিন্তু সে আর স্বামীকে সজ্ঞানে দেখিতে পাইল না। নৃত্যকালী পৌঁছিবার কিছু আগেই নগরবাসীর জ্ঞান লোপ পায়। তারপরও সে কয়দিন বাঁচিয়াছিল। নৃত্য কী সেবাটাই না করিল!

পথে যাইতে যাইতে টগর রাজেশ্বরকে বলে, সে একটা দেখবার মতন জিনিস, মেয়েরা যাকে ভালবাসে তার জন্য না করতে পারে এমন কিছু নেই।

রাজেশ্বর বলিল, সে ত' কাঠিগাঁওয়ে নিজের চোখেই দেখে এসেছি!

কি আর এমন দেখেছ? নেত্যর সেবা যদি দেখতে।

রাজেশ্বর বলিল, শেষ কটা দিন নেত্য তবু স্বামীর সেবা করতে পেয়েছে, এও একটা সান্ত্বনা।

টগর বলিল, মেয়েদের তোমরা বড় ভুল বোঝ মণ্ডল।

কি রকম?

আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিতে জানি তা সত্য এবং জানি বলেই পাওনা-গণ্ডা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমরা অনেক সজাগ। নেত্য কিছুই পায়নি এ যে কত বড় দুঃখ তা তুমি বুঝবে না।

আজ সকালে নগর বাসীর ছেলেরা কাঠিগাঁও হইতে ফিরিয়াছে। নগরের বৈমাত্রেয় ভাইরা তাদের বাড়ীতে উঠিতে দেয় নাই। তারা দাবি করে বাড়ী তাদের। এতে নগরবাসীর কোন অধিকার ছিল না, তার স্ত্রী পুত্রের ত' নাই ই।

রাজেশ্বর বলিল, সাগর জেঠা মরেছেন আজ চার বছর। কই একথা তো আগে কখনও শুনিনি।

টগর বলিল, আমিও আজই শুনলাম।

নগরবাসীর বৈমাত্রেয় ভাই শহরবাসীরা তিনজনেই বেশ জোয়ান, লম্বা-চওড়া গড়ন, বাহুর পেশীগুলি লোহার গুলতির মতন শক্ত।

তিনজনেই বাস্তুভিটার পথ আগলাইয়া লাঠি হাতে একটা আমগাছের চায়ার নীচে দাঁড়াইয়াছিল। নীচে পথের উপর নগরবাসীর দুই ছেলে ব্রজ ও মথুরা, বয়সে তারা কাকাদের চেয়ে ছোট। বড় ব্রজের হাতে বৈঠা, মথুরার হাতে ঐ আমগাছেরই একটা ভাঙা ডাল। উভয় পক্ষই মারমুখো, রোদ যত চড়ে, তাদের মেজাজ ততই গরম হয়।

নিষ্করুণ সূর্য ব্রজদের মাথার উপর যেন আগুন ঢালিয়া দেয়। কুষ্ঠরোগীর শুকনা ক্ষতের মতন ফাটল ধরা মাটির উপর পা আর রাখা যায় না।

অদূরে একটা গাছতলায় কাঠের বাক্সের উপর নৃত্যকালী বসিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় একটু আগে সে কাঁদিতেছিল। তার পাশেই ঘরকন্নার সামান্য তৈজসপত্র, আর হোগলার চাটাইয়ে জড়ানো বালিশ ও কাপড়।

চেঁচামেচি শুনিয়া আশেপাশের অনেক লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। সর্বাগ্রে আসিয়াছেন বৃদ্ধ কটাই মহাশয়। ব্রজদের হলদে রংএর বাঘা কুকুরটা পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শহরবাসীদের ব্যবহারের প্রতিবাদে তার কণ্ঠই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও উগ্র। তার ঘোলাটে চোখ দুটা ক্রমেই হিংস্র হয়, মুখ দিয়া লালা গড়াইতে থাকে। ঘেউ ঘেউ করিয়া শহরবাসীদের দিকে সে ছুটিয়া যাইতে চায়। ব্রজ মাথায় চাপড় দিয়া বলে, থাম, বাঘা থাম।

কটাই মহাশয় উচ্চকণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, পশুতেও বোঝে কার ন্যায় আর কার অন্যায়।

শহরবাসী কটাইর কথার প্রতিবাদেই যেন বলিল, শালা বাঘাটা কি নিমকহারাম, যেমন পাজী তেমন মেশছে গিয়া পাজীর দলে।

ব্রজ বলিল, পাজী আমরা হব কেন? পাজী তুই, তোর মা।

তবে রে—বলিয়া শহরবাসী লাঠি ঘুরাইতে আরম্ভ করে। সে কী আস্ফালন, ব্রজকে খুন না করিয়া সে ছাড়িবে না।

তার ছোট ভাই প্রয়াগ তার কোমর জড়াইয়া ধরে। দর্শকদের মধ্যে বামাচরণ ধুপী বারবার অনুরোধ করে, ভাইপো হয়। অরে ক্ষ্যামা কর।

শহর আরও রাগিয়া ওঠে, না আজ অর একদিন আর আমারও একদিন, আজ যদি অরে খুন না করি—

কটাই বলিল, থামো বামাচরণ। যারা অত চিল্লায় তারা খুন করতে পারে না।

এই সময় রাজেশ্বর আসিয়া উপস্থিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে শহর?

আমার মায়রে ও পাজী কয়।

ব্রজ বলিল, পাজী ওরাই আগে বলেছে।

শহর চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি কইছি তোরে, তুই আমার মায়রে কইলি কেন, হারামজাদা?

ব্রজ কহিল, দেখলেন ত' মণ্ডলখুড়া, হারামজাদা কে। রাজেশ্বর দুই দলকে থামাইয়া দেয়।

ব্রজর ছোট মথুরাবাসী বলে, কাকারা আমাদের বাড়ীতে উঠতে দেবে না।

রাজেশ্বর বলিল, কেন দেবে না শহর?

শহরবাসী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তার কনিষ্ঠ প্রয়াগ বলিল তুমি থামা কর দাদা, আমি ওনাগো বুঝাইয়া কই।

শহরবাসী বলিল, তুই ত' মোটা বুদ্ধিমান, আচ্ছা ক', তুইই ক'। প্রয়াগ রাজেশ্বরের দিকে চাহিয়া কহিল, বাবা বাড়ী আমাগো দিয়া গেছে। জান ত', বড়দা বাবারে কি রকম জ্বালাইত।

রাজেশ্বর বলিল, সে কথা এখন থাক। কুঞ্জসখী ছেলেদের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন জেঠিমা?

কুঞ্জসখী নিতান্ত ভাল মানুষটির মতন বলিল, যে দেবার মালিক সে দিয়া গেছে, আমি আর কি বলব বাবা ?

আপনি তা হলে কিছুই জানেন না ?

আমি মাইয়া মানুষ, জানব কি করিয়া ? তা হৈলেও শুনছি যে তোমার জেঠা শহরগো তিনজনরে লেইখ্যা দিয়ে গেছে।

রাজেশ্বর বিস্মিতভাবে বলিল, লিখে দিয়ে গেছেন !

হ'। কয় ত সকলটি।

প্রয়াগ বলিল, হ'। লেখাডা করালী ভুঁইয়ার কাছে আছে।

করালী অনুপস্থিত। অপরের মামলা উপলক্ষে সদরে গিয়াছে। তার নাম শুনিয়াই রাজেশ্বর নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

নৃত্যকালী এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল। সেদিন স্বামী মরিয়াছে। আজ পথে দাঁড়াইতে হইল।

জীবনে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সে কখনও প্রতিবাদ করে নাই। করে নাই বলিয়াই লোকে তার প্রতি বেশী করিয়া অন্যায় করিয়াছে। এই বোধ হয় প্রথম সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল। সে উঠিয়া ছেলেদের কাছে আসিয়া কুঞ্জসখীকে বলিল, বল ত' মা, তোমার ছেলেদের মাথা ছুঁয়ে একবার বল দেখি যে, এ কথা সত্যি।

কুঞ্জসখী একটু থতমত খাইয়া গেল। পরমুহূর্তেই নিজকে সামলাইয়া লইল বলিল, এ সব জানার কথা তানার ছাওয়ালগো। আমি জানব কি করিয়া ? তবে মান্যমানত সাক্ষী আছেন শুনছি।

রাজেশ্বর বলিল, আপনার ছেলে বৌ কি তবে ভেসে যাবে জেঠিমা ? শুনেছি এ বৌকে আপনিই যত্ন ক'রে এনেছেন।

তা ঠিকই শোন্‌ছ বাবা। ওরা যাই কউক, নগরারে আমি সৎছাওয়ালের মতন দেখি নাই। ওই নেত্যই কউক।—একটু থামিয়া কুঞ্জসখী আবার বলিল, অরা ভাসিয়া যায়, তা আমি চাই না। থাকুক্ অরা আমার

কাছে ছ মাস, এক বছর। এর মধ্যে নিজেরগো বাড়ী ঘর করিয়া লউক।

প্রস্তাবের মুনশীয়ানায় সকলে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। তাদের আরও হতবাক্ করিয়া বৃদ্ধা কহিল, কিন্তু কথা দিতে হবে তোমার। অরা ছ' মাস পরে যে বাড়ী ছাড়বে, তার জামিন হবা তুমি। আমার ছাওয়ালগো তা হৈলে আমি বুঝাইয়া রাজী করাব।

ব্রজবাসী বলিল, ঐ এক বছরই সই, মণ্ডল খুড়ো। মাকে নিয়ে ত' এমন করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি না।

রাজেশ্বর ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবে বাধা দিল টগর। সে সকলকে শুনাইয়াই বলিল, এ কথায় তুমি থেকো না মণ্ডল, শেষটায় এই ব্রজরাই হয়ত তোমার কথা রাখবে না।

সকলে টগবেব দিকে চাহিল।

রাজেশ্বর বলিল, ওরা এখন গিয়ে দাঁড়ায় কোথায়?

টগব বলিল, দাঁড়াবে কাঁঠিগাওয়ে। সে বাড়ী ওদের আমি দিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে হয় আমায় রাখবে নইলে বাপের ভিটায় এসে থাকব।

তার এই উদারতায় সকলেই মুগ্ধ হয়। সবচেয়ে বেশী খুশি হয় বৃন্দাবন। সে চেঁচাইয়া বলে, ও টগর ভাই, তোমার কলিজাখান আমার মাথারির সমান দরাজ।

ব্রজবাসী রাজেশ্বরকে বলিল, আমরা নয় কাঠিগাঁওয়ে গেলাম। কিন্তু এর ফয়সালার ভার তোমার উপর। তুমি আছ, কটাই মশায় আছেন।

কটাই কহিল, রাজুই সকল করবে। ও হৈল সমাজের পতি।

প্রয়াগবাসী বলিল, আমরা কিন্তু রাজী নই তা'তে। উনি বাড়ীর ভাগ ছাড়তে কইলে আমরা আদালতে যাব।

কটাই বিস্মিতভাবে বলিল, পঞ্চায়েত ফেলিয়া আদালত!

প্রয়াগবাসী মন্তব্য করিল, মহারাণীর কাছারি পঞ্চায়েতের থন নিশ্চয়ই বড়।

রাজেশ্বর এবং কটাই তাদের খাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল কিন্তু নৃত্যকালী বলিল, না, শ্বশুরের ভিটেয় বসে যদি না খেতে পাবি তাহ'লে মঞ্জরীর খালের জল আর মুখে তুলব না।

রাজেশ্বর ধীর পদক্ষেপে একা একা বাড়ী ফিরিতেছিল। মন ভারাক্রান্ত। প্রখর রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যায় কিন্তু সেদিকে খেয়াল নাই। বক্সীবাড়ীর পুবের পুকুরটা মজিয়া গিয়াছে, জলের বুকে ছোট ছোট পাহাড় প্রমাণ ধাপ দল, তার উপর দিয়াই হাঁটিয়া যাওয়া চলে। পুকুরের পুব পার দিয়া হাঁটাপথ কিন্তু পারটা এত নীচু যে সামান্য বৃষ্টিতেই ডুবিয়া যায়। পথের কোন চিহ্ন থাকে না। তখন পিছনের বেতের ঝোপটাই হয় জলাশয়ের পশ্চিম সীমানা। কিন্তু দশ বছর আগে ঐ পারটা ছিল কত উঁচু, পুকুরটা কী সুন্দর! পুকুরের পারে গরু চরিত, টল টল জলে নীল ও রক্তকমল ঢল ঢল করিত।

মণ্ডল যেন চোখের উপর দেখিতে পাইল, অল্পদিনের মধ্যে পঞ্চায়েতের দশা হইবে ঐ পুকুরেরই মতন। এর মর্যাদাও ঐ পারের মতন ভাঙিয়া ধ্বসিয়া যাইবে। বাড়ে বাড়ীতে দেখিল তার সূত্রপাত।

কিছুদিন হইতেই সে ইহা উপলব্ধি করিতেছিল। পঞ্চায়েতে তেমন ভিড় হয় না, লোকে সব সময় কথা শোনে না, গজর গজর করে। দেশের ভূস্বামীরা কেহ ছোট জমিদার, কেহ বা তার চেয়েও ছোট খারিজা তালুকের মালিক। আগে মণ্ডলকে বলিলেই খাজনা আদায় হইত। অনেক সময় বলিবার দরকারও হইত না। আর আজ-কাল খাজনার জন্য মনিবদের আদালতে যাইতে হয়, তাতে জলের মতন টাকা ব্যয় হয়। চাষীর দুর্দশা আরও বাড়ে।

শহরবাসীরা তিন ভাই পরিশ্রম করিয়া সংসারের অবস্থা সবে একটু ফিরাইয়াছে। নগরের ছেলেরাও সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে। আজ এই উঠতি পরিবারে মামলা লাগিল।

জবা বেশীর ভাগ সময়েই রাজেশ্বরের বাড়ীতে থাকে। কাজ অনেক। চাঁপাকে প্রায় সর্বদাই সাহায্য করিতে হয়। জবা কথায় কথায় বলিল, মেয়ের মতন মেয়ে বটে এই টগর।

চাঁপা বলিল, কেন কি করেছে?

শোননি মণ্ডলের কাছে?

চাঁপা বলিল, তোমাদের মণ্ডল সেই মানুষ আর কি?

জবা বলিল, শুনলাম কাঁঠিগাওয়ের বাড়ী ও নগরের ছেলেদের দিয়েছে। তারা মঞ্জরীতে থাকবে না।

কেন?

তা নিয়ে কত তাণ্ডব হয়ে গেল। গাঁ শুদ্ধ লোকের মুখে ওই এক কথা। কুঞ্জবুড়ী সৎ-ছেলের বৌ ও নাতিদের কেমন ঠকিয়ে দিলে।

এক বৎসরের মধ্যে বাড়েদের প্রায় সমস্ত জমি বন্ধক পড়িল। এক নম্বর ফৌজদারিও হইয়া গেল। শহরবাসীরা শাঁসালো, করালী গেল তাদের পক্ষে। তারই জ্ঞাতি অভিমন্যু ব্রজদের পরামর্শ দাতা হইল।

থানায় এদের ভারী খাতির। দারোগা তাদের কথা শুনিয়া রিপোর্ট লেখে, হাকিম সেই রিপোর্টের উপর রায় দেন। হাকিমের রায়ের মূলে ঐ তিনজনের মতামত। সকলেই এই শ্রেণীর লোককে খুশি করে। দারোগাকে পান তামাক খাওয়াইবার জন্য এরা উভয় পক্ষ হইতেই টাকা লয়। দারোগা যত পায়, এই দালালরা পায় তার

চেয়ে ঢের বেশী। এর উপর জুটিল দীন দাস। জমি বন্ধক রাখিয়া সে টাকা দিল। পঞ্চাশের জায়গায় দিল দশ।

দীন বলিত, তোমাদের জমি ত' বিশ বাঁও জলের তলায়, এর বেশী দেই কি করে?

উকিল, মোক্তার, পেশকার, মুহুরীদের ন্যায্য ও অন্যায্য পাওনার টাকা যোগাইতে গিয়া উভয় পক্ষেরই অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে মামলায় জিতিলেও কাহারও আর জমি ভোগের সম্ভাবনা রহিল না।

রাজেশ্বর নির্বাক সাক্ষীর মতন সব দেখিল। পঞ্চায়েতে মধ্যে মধ্যে যে অবিচার হইত না এরূপ নয় কিন্তু বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই শোষণের এমন সুন্দর উপায় পঞ্চায়েতের লোকেরা জানিত না।

রাজেশ্বরের রাগ হইল থানার ঐ দালাল শ্রেণীর উপর। সচ্ছল সরল চাষীকে এরা ধ্বংসপথে লইরা চলিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? বিদেশী বণিকের শক্তিশালী এই শাসনতন্ত্র চলিবেই—আর তার চলার পথে এই দালালদের প্রয়োজন। কল-কব্জা বলটুর মতন ঐ শাসনযন্ত্রের তারাও এক একটা ক্ষুদ্র অংশ।

রাজেশ্বর আবার কখনও ভাবে, হয়ত এটা কালেরই ধর্ম—কলির খেল।

লোকে ছুটির সময় প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে দেশে যায়, ত্রিগুণা যায় কলিকাতায়। আত্মীয় স্বজন, মা ভাই সবই মঞ্জরীতে তবুও এখানে মন বসে না। তার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেলে মা কাপড় ছাড়িয়া তবে ঘরে যান। মেজভাই কালীচরণ বলে, ইংরেজী শিখে ত্রিগুণ ম্লেচ্ছ বনে গেছে।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে তার পাতা পড়ে পৃথক জায়গায়। এর মধ্য হইতে কলিকাতায় যাইয়া ত্রিগুণা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, পায় মুক্তির আস্বাদ। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে মনের যোগ সুনিবিড়। রক্তের সম্পর্ক না থাকিলেও তারাই আজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভগবানের নাম করে, প্রার্থনা করে একই মন্দিরে। জাত বিচার নাই, ছোট বড়র ভেদাভেদ নাই।

সেবার কলিকাতা হইতে আসিয়া ত্রিগুণা স্কুল কমিটিতে পদত্যাগ-পত্র পাঠাইল। রাজেশ্বর ব্যাপারটা জানিত, সে কহিল, তা হলে ঐখানেই বিয়ে স্থির করলে?

কেন, তা'তে দোষ কি?

রাজেশ্বর বলিল, দোষ কি তা' জানি না, কিন্তু বিধবা—

ত্রিগুণা তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তোমরা দুঃখিত হবে তা জানতাম। কিন্তু সব সময় লোককে খুশি করা চলে না, ভাই।

রাজেশ্বর প্রশ্ন করিল, মাকে বলেছ?

হ্যাঁ, বলেছি।

তিনি কি বললেন ?

বললেন না কিছুই, একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন।

রাজেশ্বর বলিল, স্কুল না ছাড়লে হত না ?

না ভাই। বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তুমিই কি আমায় রাখতে মত দিতে ? তার চেয়ে মানে মানে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

রাজেশ্বর বলিল, কিন্তু আমাদের জাতের ভারী অসুবিধা হবে। তোমার জন্য শিক্ষার একটু সুবিধে আমরা পেয়েছিলাম এখন আবার—

বাধা দিয়া ত্রিগুণা কহিল, আটকাবে না কিছুই, সাড়া যখন একবার পড়েছে তখন অগ্রগতি চলতেই থাকবে। জগৎ চলে চলার তাগিদে।

স্কুল কমিটির সভায় শিক্ষক হারাণ চাকলাদার ভিন্ন পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে কেহ কিছুই বলিল না। হারাণ বিধবা-বিবাহ সমর্থক এক প্রবন্ধ পাঠ করিল। বিদ্যাসাগরের দোহাই দিল। বলিল, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।"

ওলফাত কাজী বলিলেন, এ সম্বন্ধে আমার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। ব্যাপারটা হিন্দু প্রধান শিক্ষককে নিয়ে। ছাত্রের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন হিন্দু। তাদের সংস্কারে বাধলে মাষ্টার বদলান হয়ত দরকার। কিন্তু একজন মুসলমান মাষ্টারকে নিয়ে এই সমস্যা উঠলে আপনারা তখন কি করতেন ?

সেক্রেটারী বলিলেন, তখন এ প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু উনি যেটা কচ্ছেন সেটা আমাদের সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত প্রতিক্রিয়া করবে।

ত্রিগুণা বলিল, আমার আচরণ কিছু গর্হিত নয়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

শশী শিরোরত্ন কহিলেন, সেটা শাস্ত্রই নয়।

সভাপতি রাজেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলে—সে একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, আমি কিছু বলতে চাই না।

সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে সে শেষটায় বলিল, বিধবা বিয়ে করলে ওঁকে হেডমাষ্টার রাখা আমি ভাল মনে করি না—বলিয়াই হাই বেঞ্চে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ত্রিগুণার বিরুদ্ধে আজই সে প্রথম প্রকাশ্যে কথা বলিল। না বলিয়াই বা উপায় কি?

পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে সনাতনীরা মনে করিল এবার আপদ শান্তি হইয়াছে। ত্রিগুণা হেডমাষ্টার থাকিলে ছেলেদের স্লেচ্ছাচারী না করিয়া ছাড়িত না।

অন্যবারের মতন ত্রিগুণা ও রাজেশ্বর একসঙ্গেই বাড়ী ফিরিতেছিল। রাজেশ্বর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া ত্রিগুণা কহিল, তুমি ঠিকই করেছ ভাই, যা সত্য বলে বোঝা যায় তার জন্য এমন কঠিন হওয়াই দরকার।

রাজেশ্বর বলিল, তুমি যে ভুল বুঝবে না তা আমি জানতাম।

লোক্যাল বোর্ডের উঁচু রাস্তা, বাঁদিকে খানকয়েক ধেনো জমির পরেই একটি গৃহস্থের ঢেঁকিশালা। দুইটি স্ত্রীলোক ঢেঁকিতে পার দেয়, ঢেঁকির ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরও দোল খায়। ডান দিকে ফেরধরা গ্রামের নীচে গাঙের উপর নৌকাগুলি সাদা পাল তুলিয়া রাধাগঞ্জের দিকে চলিয়াছে।

ত্রিগুণাদের সামনেই মঞ্জরীর খালের ওপারে কাঁসার চক। কাঁসার চকের গাছের ছায়া খালের জলে গভীর কালো রেখা টানিয়াছে। প্রকৃতির বুকে দুর্দৈবের মতন ঐ রেখার উপর ছেদ কটিয়া মাধাই সেনের আড়তের শালের খুঁটিগুলা খালের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া আছে—মহাসমরের পর শুইয়া আছে যেন কতকগুলি ক্লান্ত দৈত্য।

কাঁসার চকের মধ্য দিয়াই পথ। পথের বাঁয়ে গ্রামের প্রান্তে বৈরাগী বাড়ীর উনানের ধোঁয়া আকাশে বেতসলতার মতন লিক লিক

করে। পাহাড় নাই, ঝরণা নাই, নাই বড় নদী, নাই সাগর। কিন্তু এ দেশের তবু কি তুলনা হয়?

মঞ্জরীর খালধারের ঝোপঝাড়, জলের উপর গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, পদ্মে ভরা বিলের বুকে ধানের শিষের কম্পন—প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধ মাতৃরূপ নিজেকে যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে।

তারা বাড়ী ফিরিল দুপুরের পর। সুখদাসুন্দরী তখন ঠাকুর ঘরে জপ করিতেছিলেন। ত্রিগুণা বৌদিদিদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তারা স্কুলে যাওয়ার পরেই মা সেই যে ঠাকুর-ঘরে গিয়া বসিয়াছেন তারপর আর ওঠেন নাই। বধূরা খাবার জন্য ডাকিলে ইশারায় জানাইয়াছেন, এখন নয়, পরে হবে।

ত্রিগুণা বলিল, মা তাঁর ঠাকুরকে ডাকছেন, আমার মতি গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

রাজুকে সঙ্গে করিয়া সে যাইয়া মাকে ডাকিল, ওঠ মা, বেলা হয়ে গেছে। তুমি না উঠলে আমিও খাব না কিন্তু।

ছেলেকে সুখদা ভালই চিনিতেন। খানিকটা পরে জপ শেষ করিয়া তিনি উঠিলেন।

রাজেশ্বরের দিনটা নিরানন্দেই কাটিল। ত্রিগুণা কিছু মনে করে নাই বটে কিন্তু সে তো সভায় তার বিরুদ্ধেই কথা বলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বর নিজের জাতির কথাও ভাবিতেছিল, এ রকম দরদ দিয়া কে তাদের লেখাপড়া শিখাইবে, সকলকে সমান চোখে দেখিবে কে? দ্বিতীয় এমন মানুষ ত' এ দেশে আর নাই।

ত্রিগুণা আজ মঞ্জরী ছাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় আকর্ষণ যথেষ্ট, সেখানে সবিতা আছে, আছেন শ্রদ্ধেয় বন্ধু কালীপ্রসন্ন রায়, আছে তার

প্রার্থনা, সমাজ, ব্রাহ্ম মন্দির। অবশ্য, সব চেয়ে বড় আকর্ষণই সবিতা।

এই বালবিধবা নিজের চেষ্টায় বি, এ, ও এম, বি পাশ করিয়াছে। কলিকাতায় ডাক্তারী করে। প্রাকটিস মন্দ নয়। শিক্ষিত বলিয়া তার কোন গর্ব নাই, অভিমান নাই। বাঙ্গালীর ঘরের আর পাঁচটি মেয়েরই মতন শান্ত শিষ্ট। স্বাধীনভাবে লেখাপড়া করার অপরাধে তাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হয়। তখন আশ্রয় দেন তার এটোয়া প্রবাসী এক কাকা। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। তাঁর বন্ধু কালীপ্রসন্ন রায়ের বাড়ী থাকিয়া সে লেখাপড়া করে। সেখানেই ত্রিগুণার সঙ্গে সবিতার পরিচয়।

কলিকাতা টানে, টানে সবিতা। এদিকে দেশ ছাড়িয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না। মঞ্জরীর খাল, খালের ধারের বটগাছ হাটখোলা ফকির-বাড়ীর গাঙে জলের ঘুর্ণি, পশ্চিমে বিলের শেষে সূর্যাস্ত, এসব তার কত পরিচিত, কত যে প্রিয় আর কেহ তাহা বুঝিবে না।

খালধারের বটগাছে দড়ি বাঁধিয়া তারা দোল খাইয়াছে, বাঁশের সাঁকোর উপর হইতে কখনও চিৎ হইয়া জলে পড়িয়াছে, ফকিরবাড়ীর ঘোলায় নৌকা ভাসাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়াছে। জলের বেগ সেখানে তীব্র, নৌকা ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। গাঙের পার হইতে চীৎকার করিয়া কেহ ডাকে, সামাল সামাল। কেহ বা নৌকা লইয়া ছুটিয়া আসে। তাদের তখন পড়ে হাসির ধুম।

ত্রিগুণার সঙ্গে রাজেশ্বর থাকিত, থাকিত উত্তরের বাড়ীর মথুর সেন, পশ্চিমের হাউলির দেবু কাকা। কোনদিন বা সে একা থাকিত। মা বলিতেন, ছেলেটা একেবারে লক্ষীছাড়া।

গাঙের ঘোলায় নৌকা ছাড়িয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশ দেখা কি আরাম। নৌকা ঘোরে, সঙ্গে তীরের গাছগুলিও ঘুরিতে থাকে। ঘোরে আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারা।

বিপদকে ডাকিয়া আনিয়া অমন করিয়া হাসিবার, জীবনকে অমন করিয়া উপভোগ করিবার সে দিনগুলি আর নাই। আজ সে সব কথা মনে হয় স্বপ্ন। অতীতের এই স্বপ্ন-সাথীগুলির জন্য কষ্ট হয়, তার চেয়েও বেশী বেদনা অনুভব করে মায়ের জন্য।

সুখদা নৌকা পর্যন্ত আসিয়া কহিলেন, ধর্মে তোব মতি হোক।

ত্রিগুণা মনে মনে বলিল, হ্যাঁ, মা সেই আশীর্বাদই কব।

কিন্তু উভয়ের আদর্শের ব্যবধান কত বিশাল।

মঞ্জরীর খাল হইতে গাঙে পড়িয়া ত্রিগুণা কহিল, খালটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

রাজেশ্বর বলিল, গাঙটাও দু'পার থেকে ভরে আসছে। ত্রিগুণা বলিল, কষ্ট হয় খালটার জন্যই বেশী। ও যে মঞ্জরীব খাল।

গাঙের দু'দিকেই প্রায় আধ মাইল জুড়িয়া শুঁটকি মাছেব আড়ত। দড়িতে ঝুলাইয়া জেলেরা মাছ শুকায়। বিদেশী বণিকেব দালালেরা এগুলি চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম এবং আরও দূরদেশে চালান করে।

এ দৃশ্য আগে ছিল না। কাছেই পাটগাতিতে ষ্টীমার ষ্টেশন হওয়ার পব এরূপ অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আগে মাছ, দুধ, তরী-তরকারি দেশেই থাকিত। এখন জেলেরা ঝুড়ি ঝুড়ি তাজা টাটকা মাছ চালান দেয়। শত শত মন যায় শুঁটকী মাছ। গোয়ালরা দই, ক্ষীর করিয়া শহরে পাঠায়। দুধেও তারা জল মিশাইতে শিখিয়াছে। কাঁসা পিতলের তৈজসপত্রের বদল ঘরে ঘরে আজ ঠুনকো কাঁচের আমদানি, তেলের বদল সস্তা রঙিন সাবান। জোলার ছিট আর কারও রোচে না। চাষীর গায়ে উঠিয়াছে রামধনু রং এর বাহারি জামা।

থানা কাছে আসায় যেমন মামলা বাড়িয়াছে, পাটগাতিতে ষ্টেশন আসায় তেমনই বাড়িয়াছে পোশাকের ব্যবহার। ব্যবসায়ী হিসাবে

বুদ্ধিমান রাজেশ্বর ইহার সুবিধা লইতে ত্রুটি করে নাই। জালি গেঞ্জি, বাহারী ছিট এসব দেশে সেই প্রথম আমদানি করে।

যুগে যুগে এইরূপ কত পরিবর্তনই না আসে। পুরাতন নিয়ম ধুইয়া মুছিয়া যায়। জন্মে নব নব মানুষ, নূতন ভাবধারা।

এইরূপই একজন মানুষ—রাজেশ্বরের বন্ধু ত্রিগুণা। অনেক নূতন জিনিস সে আনিল। ছাড়িল কত কিছু পুরাতন। মধ্যে মধ্যে তাদের এ সম্পর্কে কথাও হয়। রাজেশ্বরের প্রগতিমুখী এই যে মনের গড়ন এর জন্য ত্রিগুণার কাছে সে ঋণী। সেই বন্ধু দেশ ছাড়িয়া যাওয়ায় রাজেশ্বরের মন এমনিই খারাপ ছিল। ষ্টীমারে করিয়া দেশের জিনিস বিদেশে চালান হওয়ার বিপুল ব্যবস্থা দেখিয়া তার বেদনা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। দরিদ্র দেশ। এতদিন তবু লোকে দুইটা মাছ ধরিয়া খাইত। আনাজ তরকারি পাইত, সে সুবিধাও আর রহিল না।

পারারহাটের অপর পারে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া করালী গাঙ পার হওয়ার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। ত্রিগুণা তাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে যে খুড়ো, কোন মামলা আছে বুঝি?

হ্যাঁ, এই লক্ষ্মী বেপারী ধরেছে তার একটা মামলার তদ্বির করতে হবে।

ত্রিগুণা বলিল, লক্ষ্মীর অবস্থা বেশ ভাল শুনেছি।

করালী বলিল, হ্যাঁ, সেদিনও একখানা নৌকা কিনেছে তিনশ টাকা দিয়ে। আর বউর গায়েও মেলা গয়না। লোকটা টাকার কুমির।

একটু পরে ত্রিগুণা বলিল, সাগরবাসীর ছেলে ও নাতিদের মামলাটা মিটিয়ে দাও, খুড়ো। নইলে একটা সংসারের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মেটাবার মালিক কি আমি?

তোমার কথা সবাই শোনে।

রাজেশ্বর বলিল, বিশেষতঃ শহরবাসীরা। তাদের দলিলও নাকি তোমার কাছে আছে।

করালী হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিল, কিসের দলিল?

রাজেশ্বর বলিল, সাগরবাসীর দান-পত্রের।

করালী বলিল, ঐ দান-পত্তরের মুখে আমি ই-য়ে করি। তোমার বড় বাড় হয়েছে, রাজু।

রাজেশ্বর বলিল, শুধু শুধু চটছ কেন খুড়ো? সেদিন প্রায় একশ লোকের সামনে শহরবাসী বললে, দলিল তোমার কাছে।

করালী বলিল, কী কাণ্ড বল দেখি ত্রিগুণা, অকারণে আমায় মিথ্যেবাদী বলবে। ছোটলোকের মরণ আর কাকে বলে?

রাজেশ্বরের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

ত্রিগুণা বলিল, তুমি পাঁচজনের কথায় থাক বলেই ত' এসব ওঠে! এই যে দারোগার দালালগিরি, এও কি সম্ভ্রান্ত কাজ?

তুমি ভাইপো হও। যাচ্ছ বিধবা বিবে করতে। ওটা একটা মস্ত সম্ভ্রান্ত কাজ—উত্তেজিতভাবে এই বলিয়া করালী গুম হইয়া বসিয়া রহিল। নৌকা ঘাটে লাগিতেই "কালী কুলাও, কালী কুলাও, মা" বলিতে বলিতে সে নামিয়া গেল।

ত্রিগুণা হাসিয়া বলিল, দেবতাদের কি বিপদ। টানাটানি করবে সবাই।

ফিরিবার পথে রাজেশ্বর টগরের বাড়ী নামিল। ফুল ও পাতা-বাহারের গাছে ঘেরা সেই বাড়ী, তবে আগের চেয়েও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাচায় লাউ কুমড়ার ফুল ফুটিয়াছে। কচি ডগাগুলা বাতাসে নড়ে বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা। লাউ-মাচার তলায় বসিয়া একটা বিড়াল দুর্বা চিবায়, সজিনার বকডালে দুইটি ছোট ছোট পাখী ঠোকরাঠুকরি করে। রাজেশ্বরের কানে আসে মৃদু গুঞ্জন। উঠানে আসিয়া শব্দটা সে আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইল—

কালীয় দমন হরি বংশী-বদন।

ছোট একখানা কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় বসিয়া টগর, তার সামনে মাটির তৈয়ারী রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সে গাহিতেছিল—

কালীয়-দমন হরি বংশী-বদন
রাধিকা রমণ হরি যশোদা নন্দন।

বাল্যে সে রাম-যাত্রায় গান গাহিত, কখনও সীতা সাজিত, কখনও বা লব কুশ। বয়স হইলে পাঁচজনের সমালোচনার ফলে গান গাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বহুকাল পরে, কাঠিগাঁওয়ে নগরবাসীর অসুখ করিলে আবার গান শুরু করে। এবার করিত ভগবানের নাম কীর্তন। নৃত্যকালী আসিবার পরে নগরবাসী যে কয়দিন বাঁচিয়া ছিল, সে কয়দিন টগর আর রোগীর কাছে যায় নাই, রান্না করিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছে ভগবানের নাম।

টগর ভাবিত, বেচারী নৃত্যকালী স্বামীর কাছে তো কিছুই পাইল না। অন্ততঃ শেষ কয়টা দিন সে আর তাদের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইবে না।

নৃত্যকালী পিত্রালয়ে। ব্রজ আর মথুরা কৃষাণ খাটিতে গিয়াছে। ফিরিতে দেরি হইবে। টগর একা একমনে ঠাকুরকে ডাকিতেছিল নিজের খেয়ালমত সে পদ বাঁধে, ঠাকুরের মূর্তি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে।

বৈকালী সূর্যের আলো আসিয়া পড়ে টগরের মুখের উপর। তাবে ভারী সুন্দর দেখায়, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, শান্ত, স্নিগ্ধ এক নারীমূর্তি।

পুতুলের গলায় মালা পরাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই টগর দেখিল, রাজেশ্বর দাঁড়াইয়া। বলিল, কতক্ষণ এসেছ, ডাকনি যে বড় ?

তোমায় দেখছিলাম।

চোরের মতন ?

ক্ষতি কি? তোমার ঠাকুরও ত' চোর ছিলেন। টগর কহিল, ইস্! মুখে বাধল না বলতে?

না খাওয়াইয়া রাজেশ্বরকে সে ছাড়িবে না, অথচ ব্রজ মথুরাও বাড়ী নাই যে বাহির হইতে দুধ, মাছ আনিয়া দিবে। অগত্যা টগর নিজেই বাহির হইল। রাজেশ্বরকে বলিল, একটু বস মণ্ডল, মণ্ডলের কাজ কর, বাড়ী পাহারা দাও। আমি আসছি—একটু দুধ মাছের যোগাড় ক'রে।

রাজেশ্বর অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু টগর কিছুতেই শুনিল না। রাজেশ্বর বলিল, রাত্তির হয়ে গেলে ফিরব কি করে? ত্রিগুণার নৌকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

টগর বলিল, এক দিন নয় নাই ফিরলে।

অতিথির জন্য সে দুধ ও বড় বড় কই মাছ আনিল। দুধের ক্ষীর করিল, ক্ষীরের পাটিসাপটা। মাছ ভাজা, ঝোল ও ঝাল, কলা ও পিঠা সাজাইয়া রাজেশ্বরকে খাওয়াইল।

রাজেশ্বর ভোজনরসিক, এমন রান্না সে খুব কমই খাইয়াছে। সে চাছিয়া পুঁছিয়া খাইল। খাইয়া তৃপ্তির ঢেকুর তুলিল। কহিল, রান্না শিখেছিলে বটে।

টগর হাসিয়া বলিল, তা বলে চাঁপার মতন নয়।

ওঠে অন্য কথা। টগর বলে, কলা, তরকারি, ফল-ফলারি কাঠিগাঁওএর বাড়ীর গাছের। ধান নিজেদের জমির।

রাজেশ্বর প্রশ্ন করে, জমি কোথায়?

এই গাঁয়েই।

নগরবাসী কিনেছে বুঝি?

না, আমি ছেলেদের কিনে দিয়েছি।

ওদের মামলার খবর কি?

জেলায় শহরদের হার হয়েছে শুনেছি। হাকিম ওদের দলিল বিশ্বাস করেনি।

রাজেশ্বর বলিল, তাই খবরটা মঞ্জরীতে গোপন আছে। আর দেখলাম করালীর রাগ-রাগ ভাব। পারারহাটে দেখা হল।

রাত্রে ছেলেরা বাড়ী ফিরিলে টগর বলিল, মণ্ডলকে রেখে এস। সঙ্গে যাবে ইয়াকুব।

মথুরা জিজ্ঞাসা করিল, তাকে খবর দিতে হবে?

না, তুমি খেয়ে নাও। সে এল বলে, দুধ আনতে গিয়ে আমি তাকে বলে এসেছি।

রাজেশ্বর কাঠিগাঁও হইতে রওনা হইল রাত দশটার পর। পথে মথুরা টগরের অশেষ সুখ্যাতি করিল। মা'র কথা তত বলিল না যত করিল টগরের গল্প। দিবারাত্র সে তাদের জন্য পরিশ্রম করে। আর করে ঠাকুরের নাম। খায় একবেলা, তাও নিরামিষ। মাছ ছোঁয় না।

রাজেশ্বর বলিল, অথচ আমার জন্য ত' রাঁধল।

মথুরা বলিল, তা রাঁধে বড়মা। বলে, অতিথি হল নারায়ণ।

কলিকাতায় রাজেশ্বর গতবারে দেখিয়াছিল সিংহ, হাতী, জেব্রা জিরাফ। এবার দেখে উত্তুঙ্গ প্রাসাদ, ল্যাণ্ডো, জুড়ি, ধনৈশ্বর্যের মহিমা। মঞ্জরীর বাহিরের বিশালতর জগতের সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়। এবার দেখিল, আর একটা নতুন দিক। দেশে ছুৎমার্গ, এ বড় ও ছোট সমাজের এই সব ধরা-বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে চলিতে হইত। ত্রিগুণার বিবাহে কলিকাতায় আসিয়া পাইল মুক্তির আস্বাদ।

ত্রিগুণা একটি নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল। তার বিবাহের দিন প্রাতে রাজেশ্বর সেই বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। একটু বেলায় ত্রিগুণা তাকে কালীপ্রসন্ন রায়ের নিকট লইয়া গেল। তিনিও তাদের জেলারই লোক, কলিকাতায় মাসিক পত্রিকা চালান, দেশের কথা ভাবেন। সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রচুর। রাজেশ্বরের তাঁর সঙ্গে আলাপ করিবার আগ্রহ ছিল।

ত্রিগুণা পরিচয় করাইয়া দিলে কালীপ্রসন্ন রাজেশ্বরকে বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, আপনার কথা অনেক শুনেছি, রাজেশ্বরবাবু। বড় আগ্রহ ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করবার। আপনি মস্ত বড় লোক, যাকে বলে Really great.

বয়োবৃদ্ধ কালীপ্রসন্নের এই আন্তরিকতায় রাজেশ্বর মুগ্ধ হইল। সে স্কুল-কমিটি, লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ডের মেম্বর। মধ্যে মধ্যে জজের জুরিও হয়। অনেক সূত্রেই ভদ্র ব্যবহার পায়। মিষ্টি কথা শোনে। বড় বড় উকিলরা জুরি রাজেশ্বরকে সম্বোধন করার সময় মনোজ্ঞ বিশেষণ প্রয়োগ করেন। ভোটপ্রার্থী তোষামোদ করে, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই ছেঁদো কথা। এতটা আন্তরিকতাপূর্ণ সম্ভ্রম জীবনে সে আর কখনও পায় নাই। এতদিন সব জায়গায়ই নিজেকে ছোট মনে হইয়াছে। সকলে মনে করাইয়া দিয়াছে। গ্রামে উচ্চ বর্ণের ছোট ছোট ছেলেরাও তাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করে। ডাকে রাজু বলিয়া। বড় জোর বলে, মণ্ডল।

রাজেশ্বর বলিল, অনেক দিন থেকেই আপনাকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আপনি যে এত বড় তা জানতাম না, রায় মশাই।

এক জেলার দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিভিন্ন কৃষ্টির ধারক ও বাহক দুইজনের মিলনের এই দৃশ্যে ত্রিগুণা বড় তৃপ্তি বোধ করিল।

যে কয়টা দিন কলিকাতায় ছিল সর্বত্রই সে এইরূপ ব্যবহার পাইল। ঠাকুরদের সে রান্না দেখাইয়া দিল, এই রান্না শিখিয়াছিল চাঁপার

কাছে। বৌ-ভাতের পরিবেশনের ভার পড়িল তার উপর। পরিবেশন করিতে করিতে ত্রিগুণাকে একান্তে পাইয়া কহিল, একদিন সমস্ত দেশে এই মুক্তি আসবে। কি বল ভাই?

এই সময় কালীপ্রসন্ন ডাকিয়া বলিলেন, এদিকে লুচি নিয়ে আসবেন রাজেশ্বর বাবু। মাংসও চাই, ঠাকুর, মাংসটা এদিকে।

রাজেশ্বরের মনে হইল, মঞ্জরীতে এই আবহাওয়া বহাইয়া দিতে পারিলে তার বিনিময়ে সে নিজের মান-সম্ভ্রম, অর্থ-সাচ্ছল্য সবই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

তারপর সবিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর দেখিল নারীর নূতন রূপ। ত্রিগুণা তার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল, ইনি রাজেশ্বর মল্লিক, আমার বাল্যবন্ধু। এঁর কথা তোমায় বলেছি।

সবিতা একটু হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, বসুন। এক রকম হাসি আছে যা মানুষকে মুহূর্তে আপনার করিয়া লইতে পারে, সেই রকমের এ হাসি। সবিতার উজ্জ্বল চোখ দুইটিতে তার সরল প্রাণখানি যেন প্রতিফলিত হইল।

আলাপ হইল অনেক বিষয়ে। ডাক্তারী পাশ মহিলার সঙ্গে কি কথা বলিবে সে সম্বন্ধে রাজেশ্বরের বেশ ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু সবিতার সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে প্রথমেই সে ভয় কাটিয়া গেল। সবিতা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, চাষ-বাস, চাষীর জীবনযাত্রা, তাদের অবস্থা। বলিল, বাড়ী আমাদেরও পূর্ববঙ্গে তবে বহুদিন দেশ ছাড়া। দেশের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করে।

রাজেশ্বর ত্রিগুণার বিবাহের পরও এক সপ্তাহ কলিকাতায় ছিল। সে রওনা হওয়ার দিন সবিতা কহিল, মাকে বলবেন, আমি তাঁকে গিয়ে প্রণাম করে আসতে চাই।

রাজেশ্বর কোন উত্তর না করায় সবিতা আবার বলিল, আমি বুঝতে পারি যে তাঁর সংস্কারে বাধে কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার দেখলে তিনি আমাকে না ভালবেসে পারবেন না। আমি ত' তাঁরই।

কিছু দিন পরে পুত্রবধুর এই আবেদন শুনিয়া সুখদা কহিলেন, আমিই গিয়ে বৌমাকে দেখে আসব রাজু। তাকে এখানে আনতে চাই না।

অনেক দুঃখের এই কথা। সমাজের ভয়, ভয় মধ্যমপুত্র কালীচরণের, দেশে আসিলে সবিতাকে হয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিতে হইবে।

পাঁচু সিকদারের ছেলে বনমালীর বিয়ের বৌভাত। সকালে পাঁচু আসিয়া বলিল, তোমারে নেমন্তন্নের রান্নার কথা কইতে আইছিলাম চম্পা পিসি, কিন্তু স্বল্প লোকে থাবে, তাই কইতে লজ্জা হয়ে।

চাঁপা কহিল, কেন, কম লোকের রান্না কি আমি রাঁধতে জানি না ?

পাঁচু বলিল, একে ত' থাবে মোটে দুকুড়ি, আড়াইকুড়ি মানুষ তার উপর শুধু কচু, কই মাছের বেগুন আর কুমড়ার ঘণ্ট। এই জন্য মোড়লের বউরে নিতে কেমন যেন লজ্জা করে। তা হৈলেও তুমি যাদু ঠানদির মাইয়া, তাই সাহস করিয়া আইছি। ঠানদিরে ডাকতাম দ্রৌপদী। তিনি রাগ হইতেন। তখন কইতাম, অন্য বিষয় কই না ঠাইরনদি। আপনি শুধু রন্ধন কর্ম্মেরই দ্রৌপদী।

ভাল রান্নার জন্য চাঁপারও তার মায়ের মতন সুখ্যাতি ছিল। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে প্রায়ই তার ডাক পড়িত। এ বিষয়ে যেমন ছিল তার নৈপুণ্য, তেমনিই উৎসাহ। দু তিন শ' লোকের ডাল, তরকারি মাছ, মাংস পায়েস সে স্বচ্ছন্দে রাঁধিয়া নামাইতে পারিত। ডেকচি কড়া নামাইতেও কারো সাহায্য দরকার হইত না।

তখন সবে মাত্র কলিকাতা প্রবাসী দু' একটি ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে শেমিজের প্রচলন হইয়াছে। চাঁপাদের সম্প্রদায়ে কেহই পরে না। চাঁপা রঙিন শেমিজ ও বাহারে শাড়ী পরিয়া, গায়ে দুখানা গহনা দিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যায়। মেয়েরা দাম শুনিয়া চোখ কপালে তোলে, চাঁপার ইহা বড় ভাল লাগে। কানে আসে পাঁচ রকম মন্তব্য, গায়ে

এত সোনাদানা তবুও একটু দেমাক নাই। কেহ বলে, পাঁচ ছাওয়ালের মা কিন্তু দেখতে যেন নতুন বৌ। এই সব কারণে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে রান্নার ডাক পড়িলেই সে যায়।

বেলা আন্দাজ চারটা। এক বৈঠকের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে বাকী শুধু পায়েস। বুভুক্ষু আর একদল তাদেব উঠিবার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

পাঁচু পুত্রকে ডাকিয়া কহিল, খোনা, তাড়াতাড়ি পায়স লইয়া আয়। ভদ্দর-ইতরবা পাত খালি কবিয়া বসিয়া আছে।

কথাটা চাঁপার কানে যায়। বনমালীও রান্নাঘরে দাঁড়াইয়া বার বার তাগিদ দিতে থাকে।

পাঁচু বলিয়াছিল বটে, শুধু কচু কইমাছের ঝোল আব কুমড়াব ঘ্যাঁট। সেটা নিছক বিনয় মাত্র। তিন বকম ডাল, পঞ্চ ব্যঞ্জন, কাছিমের মাংস, পায়েস, ত্রুটি কিছুবই ছিল না। বাড়ীতে বনমালীর মা ভিন্ন সাহায্য করিতে অন্য কেহই নাই। কিন্তু সে চোখে ভাল দেখিতে পায় না, নুনের বদলে হলুদ দেয়, হলুদের পরিবর্তে লঙ্কা। তাকে দিয়া সাহায্যের চেয়ে অসুবিধাই হয় বেশী।

কিছুদিন হইল, চাঁপার আঁতুড় গিয়াছে। শরীব এমনই দুর্বল। তার উপর সকাল হইতে পেটে কিছু পড়ে নাই। আসিয়াই হেঁশেলে ঢুকিয়াছে, বিশ্রাম পায় নাই এক মুহূর্তের। চাঁপার চোখের সামনে কতকগুলি জোনাকি জ্বলিতেছিল। বাহির হইতে চীৎকার শোনা যায়, পরমান্নের হৈল কি? ভিতরে বনমালী তাগিদ দেয়, যা হইছে তাই দাও ঠাইরনদি। তোমার রান্না তো অম্রেত। খাইয়া বাহবা দেবে হগল ভাঁতুয়া।

উনানের উপর হইতে পায়সের হাঁড়িটা তাড়াতাড়ি তুলিতে যাইয়া চাঁপার মাথা ঘুরিয়া গেল। হাত কাঁপিল। হাঁড়ি হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কেহ :পাত ফেলিয়া ছুটিয়া আসে। কেহ বাতাস করে, কেহ করে শুধু কলরব। বাড়িতে একটা হট্টগোল পড়িয়া যায়।

পাঁচু মনমোহন ডাক্তারকে লইয়া আসিলে তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অবস্থা গুরুতর। দুটো পা-ই পুড়ে গেছে, পেট পর্যন্ত। শুধু পোড়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত। ডান দিকটা অবশ। হয়ত পড়ার সঙ্গেই অজ্ঞান হয়েছিল।

দৈবক্রমে সেইদিনই সন্ধ্যার সময় রাজেশ্বর কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, মা তারা।

সারারাত চাঁপার জ্ঞান হইল না। মনমোহন বাবু পাঁচুর বাড়ীতেই রহিলেন। তাঁর উপর লোকের বিশ্বাস যথেষ্ট, তাঁকে গম্ভীর দেখিয়া রাজেশ্বর ভয় পাইয়া গেল। সকালে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারের জন্য মহকুমায় লোক পাঠাব নাকি, ডাক্তার বাবু?

মনোমোহন বলিলেন, পাঠালে ভালই হয়।

তৃতীয় দিনে কবিরাজী এক প্রলেপে রোগিণীর জ্ঞান হইল। ডান দিকটা তখন অবশ। চোখের পলক পড়ে না, হাত পা নাড়িতে পারে না। ডানদিক দিয়া কিছু খাওয়াইতে গেলে কশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে। এর উপর ছিল পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণা। চাঁপা স্বামীকে গোপনে বলিল, ভেতরটা বোধ হয় পুড়ে গেছে। এতদিন জ্ঞান ছিল না, ছিল ভাল। এখন আর সহ্য করতে পারি না।

কয়েকদিন পরে ঘায়ের জন্য দৈব-চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মহাদেব ভট্টাচার্য নৈষ্ঠিক বৈদিক ব্রাহ্মণ, পরগনার জমিদারদের একজন। তবে অবস্থা অসচ্ছল বলিলেও কম বলা হয়। সংসার প্রায় অচল। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং খাঁটি মানুষ বলিয়া লোকে তাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করে।

ভট্টাচার্য মহাশয় স্বপ্নে ঘট এবং পুঁথি পান। ঘট ওঠে তাদেরই পুরানো দীঘির পাঁকের মধ্যে হইতে। পুঁথি পান জীর্ণ এক মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। পুঁথিতে নানারকম ঔষধ ছিল। ঘায়ের ঔষধই বেশী। পাতার রস, ফলের বিচি, মন্ত্রপূত মাটি এইগুলিই তার উপাদান। ভট্টাচার্য মনসার পূজা করিয়া ঔষধ বিতরণ করেন। তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি এত যে বহু দূরদেশ হইতে এমন কি কলিকাতা হইতেও অনেক রোগী আসে। ঘাটে সব সময়ই দু চারখানা নৌকা বাঁধা থাকে।

এই চিকিৎসায় চাঁপার বাঁ পায়ের ঘাগুলি বেশ তাড়াতাড়ি সারিয়া গেল, ডানদিকের গুলিও কমিতে আরম্ভ করিল। রাজেশ্বর একদিন এক ঘটি দুধ, কিছু কলা ও একখানা শাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে মহাদেব বলিলেন, একি রাজু?

রাজেশ্বর কহিল, মায়ের পূজার জন্য এনেছি।

না, না ও নিয়ে যাও। উনি গরিবের মা, তাই বড় অভিমানিনী। আমার ছাড়া কারও ভোগই নেন না। অনেকে মায়ের কোঠা করে দিতে চেয়েছেন, তাঁদের বলেছি, ওঁর কোন বকশিশের দরকার নেই। ইচ্ছে যদি হত, নিজের কোঠাবাড়ী উনি করে নিতে পারতেন।

ঘায়ের এই চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজী ঔষধ চলিল। ঔষধের সোনা, মুক্তা, প্রবাল যোগাইতে জলের মতন টাকা খরচ হইতে লাগিল। যে যখন যাহা বলে, রাজেশ্বর তখনই তার ব্যবস্থা করে। রোগীকে মন্ত্রপূত গোমেদ, নীলা, পলা পরায়, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে। পূজা-ব্রত দক্ষিণা ও ভোজন দক্ষিণায় ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমেই স্ফীত হয়।

বৃহৎ সংসার, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পাঁচটি, দুটিই দুগ্ধপোষ্য। চাকর-বাকর, কিসান মজুরে মানুষ অনেকগুলি। এতগুলি মানুষের চিঁড়া, মুড়ি, ভাত, ডাল যোগানই এক বৃহৎ ব্যাপার। সমস্ত কাজেই

বিশৃঙ্খলা। গরু খড়কুটা পায় না। মাঠে সময় মত কৃষাণদের খাবার যায় না। মহেশকে কোন কোন দিন অভুক্ত অবস্থায়ই স্কুলে যাইতে হয়।

সংসারের ভার জবার উপর। সে খাটে খুবই। করে সবই নিজের মতন করিয়া। কিন্তু রোগীর শুশ্রূষার পর এতগুলি কাজ করিয়া ওঠা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তা' ছাড়া তারও ঘর-সংসার আছে। রাজেশ্বরের কৃপায় তারাও জমি-জমা, হাল-গরুর মালিক।

এদিকে বৃন্দাবনের স্ত্রী-প্রীতি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। জবাকে একটুক্ষণ না দেখিলেই সে হাঁক ডাক শুরু করিয়া দেয়, মাথারি গেল কোথায়? অ আমার মাথারি।

এতদিন রাজেশ্বর মনে করিত, চাঁপা নিজের রূপ লইয়াই ব্যস্ত। নিজের সৌন্দর্য পাঁচজনে দেখুক, তার প্রশংসা করুক—শুধু ইহাই সে চায়। কিন্তু আজ সে বুঝিল, এটা চাঁপার নিতান্তই বাহিরের রূপ।

রাজেশ্বর এতদিন জমি-জমা, কাজ-কারবার লইয়া ব্যস্ত ছিল। সংসারের কাজ কিভাবে চলে তাহা দেখে নাই, লক্ষ্য করে নাই যে খাটিয়া খাটিয়া দুরন্ত নদীর ভাঙ্গন ধরা কূলের মতন চাঁপার শরীর দিনের পর দিন ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। আজ সে জন্য তার অনুশোচনা হইল। রাজেশ্বর চাঁপাকে বলিল, আমার সংসারের সত্যিকার লক্ষ্মী তুমি। তুমি না থাকলে এ সব কিছুই হত না। তুমি খুব ভাল। খুব বড়।

একটু ক্ষীণ হাসিয়া চাঁপা বলিল, আমরা মেয়েরা হলাম আয়নার ছবির মতন। তোমরা বড়, তাই আমরাও বড়।

রাজেশ্বর একদিন জিজ্ঞাসা করিল, টগরকে নিয়ে এলে কেমন হয়?

চাঁপা বলিল, টগরকে!

হ্যাঁ, জবা একা পেরে উঠছে না।

একটু ভাবিয়া চাঁপা কহিল, বেশ আনাও।

টগর আসিয়া রোগিণীর সেবার ভার লইল।

এর আগেও জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা রাজেশ্বরকে দুর্গোৎসব করিতে অনুরোধ করিয়াছে। সে বলে, তা কী সম্ভব ?

কুটুম্বেরা উত্তর করে, কেন ? ভুঁইয়ারাও ত' করে। প্রায় সগলটিই তোমার চাইয়া গরিব।

কথাটা সত্য। যাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হয় তাদের অনেকের চেয়েই রাজেশ্বরের অবস্থা ভাল। তবু সে পূজা করে না। করিতে ভরসা পায় না। বলে, ওরা হ'ল মরা হাতী। ওদের দাম লাখ টাকা।

ভুঁইয়াদের চারধারে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শ্রী ও ঋদ্ধি! সুবিধা, সুযোগ তাদের কত। এক জনের দুঃসময়ে আর পাঁচজনে পিছনে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু তার সমাজে নিঃস্ব প্রায় সবাই। মাথার ঘাম, পায়ে ফেলিয়া, দিবারাত্র খাটিয়া দু' এক বিঘা যা জমি আছে তাহা চষিয়া হয়ত কোন রকমে ধান চালের সংস্থান করে। কিন্তু তেল, নুনও ত' চাই, চাই দুখানা কাপড়। ঐ সবের জন্য তাদের মাটি কাটিতে হয়, কুড়াল কোপাইতে হয়। যার চারদিকে আত্মীয়স্বজনের অবস্থা এই; তার পক্ষে দুর্গোৎসব সাজে না।

এবারও দু চার জন দুর্গাপূজার কথা বলিল। চাঁপার অসুখ সারে না। একটা লক্ষণ কমে ত' আর একটা বাড়ে। শরীর উত্তরোত্তর ক্ষীণ হয়। তাই রাজেশ্বরের ইচ্ছা স্ত্রীর আরোগ্য কামনায় এই বৎসরের জন্য দুর্গাপূজা করে। এ সম্বন্ধে সে ত্রিগুণাকে লিখিল,—

পূজনীয় ভাই, মহেশের মার অসুখ আবার বাড়িয়াছে। শরীরেব যে দিকটা অবশ তার ঘা এখনও শুকায় নাই। অবশও আগের মতনই আছে, তার উপর আজ কাল রোজ জ্বর হয়। ভারী দুর্বল, বোধহয় ইহা আমার পাপের ফল। জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে অন্য কিছু পাপ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে কলিকাতায় ব্রাহ্মণদের পর্যন্ত নিজের ছোঁয়া খাওয়াইয়াছি, অনেকের জাতি মারিয়াছি, হয়ত সেই জন্যই একটু ভাল হইয়া বউর অসুখ আবার বাড়িল। এ সম্বন্ধে তুমি কি বল? তোমাদের বইতেই বা কি আছে জানাইবে।

আমার জাতভাইরা গত দুই তিন বছর আমাকে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন। আমি করি নাই। কেন করি নাই, তুমি জান। কিন্তু এবার আমার ইচ্ছা যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, বাড়ীতে পূজার ব্যবস্থা করি। মাকে বলি, তিনি আমার চাঁপাকে সারাইয়া তুলুন। এ সম্বন্ধে তুমি তোমার মত জানাইবে। আর তোমার ঠাকুরকেও ডাকিও। তুমি পুণ্যাত্মা, ঠাকুর তোমার কথা শুনিবেন।

ইতি তোমার স্নেহের

রাজুভাই।

লেখা শেষ হইলে সে মহেশ্বরকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ঠিক হয়েছে ত' বাবা? এই আমার প্রথম চিঠি।

মহেশ্বর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু রাজেশ্বরের মনে হইল সে যেন কিছু বলিতে চায়। সে প্রশ্ন করিল, কি মহেশ, কিছু বলবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বামুনকে ছুঁলে পাপ হবে কেন? আগে ত' বামুনরা অন্য জাতের মেয়ে পর্যন্ত বিয়ে করতেন।

সে হল ত্রেতা দ্বাপরের কথা। কলির ধর্ম অন্য রকম। যাক, তুমিও ছোঁয়াছুঁয়ি কর নাকি?

মহেশ্বর বলিল, রঞ্জন ঠাকুর, মনাই গুপ্ত এদের সঙ্গে একই বাসনে সে রসগোল্লা খাইয়াছে। শুনিয়া রাজেশ্বর গম্ভীর হইয়া গেল, শুধু সে নিজে নয় তার ছেলেও বামুন বৈদ্য কায়স্থকে নিজের ছোঁয়া খাওয়ায়! ছেলেকে সে সাবধান করিয়া দিল, ওরকম আর ক'র না মহেশ।

কয়েক দিন পরে ত্রিগুণার উত্তর আসিল, তোমার স্ত্রীর অসুখ বেড়েছে জেনে দুঃখিত হলাম। আর লক্ষ্য করলাম যে তোমার মন খুব দুর্বল হয়েছে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। আমি বিশ্বাস করি না যে উচ্চবর্ণের লোককে ছোঁয়া খাওয়ালে নিম্নবর্ণের লোকের কোন পাপ হয়। হিন্দুদের গৌরবের যুগে যে সব শাস্ত্র রচিত তা'তেও এরকম কিছু ছিল বলে আমার ধারণা নাই।

তোমার যখন দুর্গাপূজা করতে ইচ্ছা হয়েছে, তখন কবাই ভাল। একমনে ভগবানকে ডাকলে অনেক দুঃখ কষ্টেরই লাঘব হয়। আমরা প্রার্থনার সময় প্রত্যহই পরম পিতার কাছে তোমার স্ত্রীর আরোগ্য কামনা করছি। আশা করি তিনি অচিরে রোগমুক্ত হবেন।

রাজেশ্বর দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিল। পূজামণ্ডপ ও নাটমন্দিরের জন্য অস্থায়ী আটচালা তুলিল। ধুম-ধাম করিবার কোন ইচ্ছাই তাব ছিল না। কিন্তু পূজার দুচার দিন আগেই গ্রামেব এবং আশে পাশের নমঃশূদ্ররা দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। কেহ প্রতিমার চাল চিত্তির করে, কেহ নাটমন্দির সাজায়, কেহ বা দেবীকে ডাকের সাজ পরায়। ছেলেরাই খালের ঘাটে তোরণ তুলিল, পথের দুধারে কলাগাছ পুঁতিল। এ যেন তাদের নিজেব কাজ, তাদের জাতীয় উৎসব।

পূজার সময় কেহ নৈবেদ্য সাজায়, কেহ বাদ্য বাজায়, একদল উৎসাহী বাজনার তালে তালে নাচে। শুধু নমঃশূদ্রেরা নয়, আসিল মুসলমান ভাইয়েরা। কেহ চাষী, কেহ জোলা, রাজেশ্বরের সঙ্গে তারা

হাল চষে, কেহ বা কাপড়ের কাজ করে। তারাও প্রতিমা দেখিয়া আনন্দ বোধ করে, এ যে তাদের রাজু ভাইয়ের ঠাকুর।

স্ত্রীর মঙ্গল কামনায় রাজেশ্বর প্রত্যহই কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তারা খাইয়া সাধুবাদ করিল। রাজেশ্বর একজন বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল, ভাই নসীরাম, আমার বৌর অসুখ। মাকে বল, তিনি ওকে সারিয়ে তুলুন।

নসীরাম বলিল, বলব নিশ্চয়। কিন্তু—ও বেটী কারও কথা শোনে না।

এত ধুমধাম কিন্তু রাজেশ্বর এর কিছুর মধ্যেই নাই। পূজার সময় সে চাঁপাকে পাঁজা কোলে করিয়া মন্দিরের বারান্দায় আনিয়া শোয়াইয়া রাখে। আনে এত যত্ন করিয়া যে, চাঁপা নড়াচড়ার কোন আয়াসই অনুভব করে না।

পুরোহিত যখন আবৃত্তি করেন, "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"—তখন রাজেশ্বর প্রতিটি নমস্কারের সঙ্গে মাথা নোয়াইয়া দেবীমূর্তির ধ্যান করে। প্রতিমার মুখে হাসি দেখিয়া তার চিত্ত প্রফুল্ল হয়। ভাবে চাঁপা সারিয়া উঠিবে। আবার কখনও মলিন দেখিলে ভয় পায়।

চাঁপার কিন্তু অতটা ভয় নাই। এই লোকজন, উৎসব-সমারোহ সবই তাকে কেন্দ্র করিয়া—এতেই তার আনন্দ। সকলে রাজেশ্বরের সুখ্যাতি করে। তার প্রশংসা করে, বলে, চাঁপার কী বরাত! চাঁপার চোখ তখন জলে ভরিয়া যায়। যন্ত্রণার কথা আর মনেই থাকে না।

আনন্দ রাজেশ্বরের জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রায় সকলেরই। কিন্তু সব চেয়ে বেশী কটাই মহাশয়ের। সে সকলের সামনেই গলা ছাড়িয়া তার সুখ্যাতি করে, রাজুয়া, তুই আমাদের আজ বাঁচালি। অমি দাদাও ছিল চক্রবর্তির আগুন, কিন্তু সে এতটা করতে সাহস পায় নাই।

একদিন এই প্রশংসার পর রাজেশ্বরকে একান্তে পাইয়া বৃদ্ধ গলা একটু নীচু করিয়া বলিল, একটা কথা কই তোরে, আমার মাইয়ার বড় সাধ ছিল তোর বউ হয়। আর বোধ হয় সেই দুঃখেই সে মারা পড়ল।

রাজেশ্বর কটাই মশায়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

নবমীর রাত্রে খেউড় গানের সময় টগর নৃত্যকালীকে বলিল, হেঁশেলেই ত' কাটালে। এস আজ নাটমন্দিরে বসে একটু খেউড় শুনি।

নেপালপুর অঞ্চলে দুর্গোৎসবের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ। নবমীর রাত্রে যুবারা দলে দলে আসে। নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া গান করে। বেশীর ভাগই দেবীর স্তুতি। দেশের সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়াও গান বাঁধে। এই গানকেই বলে খেউড়। কেহ কেহ বেশ গায়। যেমন কথা তেমনি সুন্দর কণ্ঠ।

নৃত্যকালী গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলে টগর বলিল, এ আর কি শুনছ, শুনতে যদি ওর গান।

উঠিল নগরবাসীর কথা, কী মিষ্টি ছিল তার গলা। যাত্রার দলে গেলে সে নাম-করা গায়ক হইতে পারিত। পাঠও বলিত ভারী সুন্দর। এই দুই নারী তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া তাদের স্বর্গত দয়িত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল। টগর নগরবাসীর চরিত্রের এমন কতকগুলি দিক বলিল যাহা নৃত্যকালীর জানা ছিল না।

রাত্রি গভীর, বাড়ী নিস্তব্ধ। পুরোহিত ঘুমাইতেছেন। মণ্ডপী বারান্দায় ঝিমায়। উৎসাহী যুবার দল এই কয়দিন খাইয়া, খাওয়াইয়া, নাচিয়া, গাহিয়া এতই ক্লান্ত হইয়াছিল যে আজ আর তারাও তাস লইয়া বসে নাই। জাগিয়া শুধু টগর ও নৃত্যকালী। বাড়ীর দক্ষিণের ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া দুইজন গল্প করিতেছিল, নগরবাসীর গল্প।

সম্মুখে, বামে ও দক্ষিণে দিগন্ত প্রসারী মাঠ, হু হু করে হাওয়া, ধূ ধূ করে ধানের খেত। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। তারাগুলি বিরহ ব্যথায় ছোট ছোট দীপ জালিয়া কার যেন প্রতীক্ষা করিতেছে।

নৃত্যকালী বলিল, শুনেছি মরার পরে মানুষ চাঁদ ও সূর্য্যিতে গিয়ে থাকে, কেউ বা তারায়। আচ্ছা, ও কোন্‌টায় আছে বলতে পার?

টগর ইহার উত্তরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল, হায়, যদি সে ইহা জানিতে পারিত।

মেয়েদের অসুখে সাধারণতঃ চিকিৎসাই হয় না। রোগ তারা গোপন করে, চিকিৎসাকে মনে করে বাহুল্য। কিন্তু চাঁপার বেলায় ইহার শুধু ব্যাতিক্রমই হইল না, যেরূপ চিকিৎসা হইল এ অঞ্চলে তার তুলনা মেলা ভার। তার উপর হইল দুর্গোৎসব। ভশ্চায্যির চিকিৎসায়ই যথেষ্ট ফল হইয়াছিল, দুর্গাপূজার পর চাঁপা উঠিয়া বসিল। রাজেশ্বর ত্রিগুণাকে লিখিল, মা ভগবতী এতদিনে বোধহয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

টগর কহিল, আমায় এইবার বিদায় দাও। আমার চিনি ত' সেরে উঠেছে।

রাজেশ্বর কহিল, সেবে উঠুক, তারপর বিদেয় নিও।

কিন্তু টগরের পক্ষে দেবি করা অসম্ভব। হাইকোর্টে ব্রজরাই জিতিয়াছে। ডিক্রি পাইয়াছে খরচা সমেত। দুচার দিনের মধ্যেই তারা বাটী ও জমিব দখল লইবে। টগরের তখন থাকা দরকার। সে বলিল, জানই ত' নেত্য কি রকম সোজা মানুষ। ছেলেদের ভার তার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

রাজেশ্বর বলিল, তা ঠিক। দেখো ব্রজরা যেন বাদ্যি বাজনা নিয়ে দখল করতে না যায়। শত হলেও শহরেরা ওদের কাকা। টগর বলিল, সে বিষয় নিশ্চিন্ত থেক। কোনরূপ সমারোহ করতে আমি দেবো না।

হাইকোর্টের রায়ের পর করালী ভুঁইয়াও রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। সাগরবাসীর দানপত্র লইয়া ব্রজরা কোনরূপ গোলমাল করিলে

বিপদেব আশঙ্কা তারই বেশী। সে রাজেশ্বরকে রীতিমত তোয়াজ আরম্ভ করিল। শহরবাসীরাও তার শরণাপন্ন হইল। ব্রজরা যাহাতে খরচা কিছু ছাড়িয়া দেয়, টাকা অল্প অল্প করিয়া ক্রমে-ক্রমে নেয়, রাজেশ্বরকে তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্রজ ও মথুরা প্রথমে ইহাতে সম্মত হয় নাই। দুপুরের খাড়া রৌদ্রে শহরবাসীরা কি ভাবে তাদের তাড়াইয়া দিয়াছে তাহা তারা ভুলিতে পারে নাই। ভোলা সম্ভবও নয়। টগর আশ্রয় না দিলে তারা ত' সেদিন ভাসিয়াই যাইত। শেষটায় টগরই মাঝে পড়িয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিল। ব্রজরা বলিল, বড় মায়ের কথা ত' আমরা ফেলতে পারি না।

চাঁপা শুনিয়া কহিল, চিনি আমার যাদু জানে।

যাদু জানিত নিশ্চয়ই। না হইলে যে চাঁপা তাব নাম শুনিতে পারিত না, টগর তার সঙ্গে চিনি পাতাইল কেমন করিয়া?

চাঁপার ঘা সারিল বটে কিন্তু দুই পায়েই বড় বড় পোড়া দাগ রহিয়া গেল। হাতেও ছোট দু-একটা। তার আশা ছিল যে এগুলি মিলাইয়া যাইবে কিন্তু গেল না। সে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িল। রাজেশ্বব প্রবোধ দিল, পায়ের দাগগুলি ত' কাপড়ে ঢাকা পড়বে।

চাঁপা বলিল, কিন্তু হাতের? কেউ যে আমার ছোঁয়াও খেতে চাইবে না!

কিন্তু ঐখানেই দুঃখের শেষ নয়। কয়েকদিন পরে চাঁপা দু' এক পা চলিতে গিয়া দেখিল যে পায়ে টান পড়ে। চলিবার সময় মনে হয় যেন লাফাইতেছে। সে সেখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদস্বরে বলিল, এমন করে সারিয়ে না তুললে কি চলত না?

রাজেশ্বর অপরাধীর মতন চাঁপার দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল এই সম্পর্কে কোথায় যেন তারও কিছু দায়িত্ব আছে। সে ভট্টাচার্যের নিকট গেলে তিনি কহিলেন, ওর চিকিৎসা আমার কিছু জানা নেই।

মনোমোহন ডাক্তার বলিলেন, কলকাতায় গিয়ে একবার চার্লস সাহেবকে দেখিয়ে নিয়ে এস। যদি তিনি কিছু কবতে পারেন, আর কারও কর্ম নয়।

কোন বিরাট জমিদারির মালিক একদিনে নিঃস্ব হইলে যেমন বিভ্রান্ত হইয়া যায়, নিজের বাড়ীর ধনসম্পত্তি হু হু করিয়া আগুনে পুড়িতে দেখিলে মানুষের মনে যে ভাব জন্মায় চাঁপার অবস্থা ঠিক সেই রকম। সে একজন নামডাকের সুন্দরী, এতগুলি সন্তানের মা কিন্তু লোকে তাকে দেখিলে বলে কনে-বউটি। অত রোগ ভোগেব পরেও মেয়েরা যার সঙ্গে লক্ষ্মীর উপমা দেয় আজ তার এই দুর্দশা। হাতে পায়ে পোড়া দাগ তার উপব খোঁড়া। কানা-খোঁড়া যে প্রকৃতির বীভৎস অনিয়ম। অনিয়ম বলিয়াই তাদেব দেখিলে শিশু ভয় পায়, কিশোর হাসে, যুবা ব্যঙ্গ করে।

চাঁপা সেই হইতে আর উঠিল না। লোকে জানিবে সে খোঁড়া, তাকে ব্যাঙেব মত থপ্ থপ্ করিতে দেখিবে—এ অসহ্য!

কলিকাতায় যাওয়া আর হইয়া উঠিল না। বাজেশ্বব কলিকাতার কথা তুলিলেই চাঁপা বলিত, আর একটু সাবি, তাবপর যা হয় ক'র।

খঞ্জতাব জন্য মনের যে গ্লানি তার ধাক্কা সে আর সামলাইতে পারিল না। মনের বল দিন দিনই কমিতে লাগিল, অঙ্গ শিথিল হইল, আসিল জ্বর।

আবার টগর আসিল। সে বলিল, এমন করে রোগকে আবার ডেকে আনলে, চিনি?

চাঁপা উত্তর কবিল, কে বললে যে ডেকে এনেছি?

বলে তোমার ঐ মুখ চোখ।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কেউ কি জানে যে আমি খোঁড়া হয়েছি?

জানিত অনেকেই। কিন্তু কথাটা টগর চাপিয়া গেল। চাঁপা বলিল, বুঝেছি সবই, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।

অমন সোয়ামী তোমার, অমন খাসা ছেলে মেয়ে, তাদের ফেলে যেতে ইচ্ছে করে?

চাঁপা বলিল, নিজের জন্যই যদি বাঁচতে না পারি তবে আর কারও জন্য বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই।

জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিল। চাঁপা কঙ্কালসার হইয়া গেল।

মৃত্যু দরজায় দাঁড়াইয়া। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেয় টগর ও রাজেশ্বর। মাঝখানে রোগী, তার দুধারে দুজন। একজন হাওয়া করে আর একজন হাত বুলায়। একে পথ্য দেয়, অপরে দেয় পাশ ফিরাইয়া।

চাঁপা জানে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। তা'তে দুঃখ নাই। খুঁতে হইয়া বাঁচিবার তার ইচ্ছা ছিল না, তাই মৃত্যুকে সে নিজেই যেন ডাকিয় আনিল।

তার স্বামী গ্রামের সেরা যুবক, স্বাস্থ্যে, রূপে, রোজগারে তার জাতির মধ্যে কেহই তার কাছাকাছিও যাইতে পারে না। নিজে সে অগ্নি মণ্ডলের মেয়ে। তার ছেলে মহেশ্বর স্কুলের সব চেয়ে ভাল ছাত্র, লোকে বলে একদিন জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে।

তাদের ঘরে এর চেয়ে আর বেশী কি হইতে পারে? চাঁপা পাইয়াছে সবই। কিন্তু এর কিছুতেই যেন আর আকর্ষণ নাই। আজকাল তার একটি মাত্র শখ, ছেলেমেয়েদের সাজানো। সাজাইয়া সামনে আনিয়া রেখে। আগে নিজে সাজাইত, এখন আর পারে না। সাজায় টগরকে দিয়া।

তার সন্তানরা সবাই সুন্দর। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তাদের মধ্যে কে বাপের মতন, তার মতনই বা কে ইহা লইয়া টগরের সঙ্গে আলোচনা করে।

চাঁপা বলে, দুর্গা দেখতে তোমারই মতন, চিনি। টগর বলে, আমার চেয়ে সুন্দর। চাঁপা প্রতিবাদ করে।

সেদিন বৈকাল হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বর্ষার বারিধারা টিনের উপর যেন ঘুমপাড়ানি গান ধরে। ঘুমায় সবাই। ব্রজবাসীদের বাঘা কুকুরটা অন্যদিন চীৎকার করিয়া সমস্ত পাড়া মাতাইয়া রাখে। আজ সেও নীরব। জাগিয়া শুধু দুইটি প্রাণী, টগর আর রাজেশ্বর।

এই দুইটি নরনারী পরস্পরকে কত ভাবেই দেখিল। একে অপরকে ভালভাবে চিনিল চাঁপার রোগশয্যায়। রাজেশ্বর মনে করে, এমন মেয়ে দুর্লভ। তার প্রতিটি কাজে থাকে নারীর মাধুর্য, নারীর নিষ্ঠা। বন্ধুত্বে সেবা-শুশ্রূষায় সে আদর্শ নারী। তার চরিত্র বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন জ্বলজ্বল করে।

নারী মাত্রেরই একটা অবলম্বন চাই' কিন্তু টগরের প্রতিষ্ঠা তার নিজের মধ্যে। কোন আশ্রয় সে চায় না। বরং নিজেই অপরের আশ্রয় হইতে পারে।

টগরও মুগ্ধ হয়। দেখে রাজেশ্বরের কী অপূর্ব চরিত্র, কী কর্ম ব্যস্ততা! পুরুষ মানুষ যে এতটা ভালবাসিতে পারে টগরের আগে এ ধারণা ছিল না, হইল রাজেশ্বরকে দেখিয়া। সে বলে, মণ্ডল, তোমার মতন সোয়ামী পেলে আমি কিন্তু মরতাম না। একথা আমি চিনির সামনেই বলছি।

শুনিয়া চাঁপা মৃদু মৃদু হাসে। এই কয়মাসে টগরের সঙ্গে তার পরিচয় এমন নিবিড় হইয়াছে যে টগরকে দিয়া তার স্বামী সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

জোর বাতাসে আলোর শিখা কাঁপিতে থাকে। একবার টগরের মুখের উপর আলো পড়ে, আবার পড়ে রাজেশ্বরের মুখে। চলে

আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। অন্ধকারের পর আলো পড়িয়া রাজেশ্বরকে বেশ দেখায়। আর টগরকে দেখায় অপূর্ব।

মধ্যরাত্রির পর বৃষ্টির ভাষা আরও মুখর হইয়া উঠিল। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের পর টগরের চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। সে বলিল, আমি এখন উঠি, বড় ঘুম পাচ্ছে। শেষরাত্রে আমায় ডেকে দিও। চিনি জাগলে ঝিনুকে করে একটু একটু জল দেবে। গলা যেন শুকিয়ে না যায়।

টগর চলিয়া যাওয়ার সময় রাজেশ্বর পিছন হইতে একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিল। দরজার উপরে প্রথমে পড়িল টগরের ছায়া। ছায়া প্রথমে বাহির হইয়া গেল, পিছনে বাহির হইল টগর। রাজেশ্বরের বুকে কোথায় যেন বাজিল। ছায়াও যদি আর একটুক্ষণ থাকিত!

তারপর কাটিল প্রায় এক ঘন্টা। রাজেশ্বরের সময় সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। কি যে ভাবে তা' সেই জানে। দৃষ্টি কেমন যেন উগ্র অথচ অর্থহীন। এক হাত দিয়া সে পাখা নাড়ে আর এক হাতের আঙুল কামড়ায়। এই দুটাই চলিতেছে তার অজ্ঞাতে।

খানিকটা পরে যন্ত্রচালিতের মতন উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল! কী গভীর সূচীভেদ্য সে অন্ধকার, তার হৃদয়ের কালিমারই মতন জমাট বাঁধা গাঢ় তমিস্রা। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, উঠানে জলের উপর জল পড়িয়া টগবগ শব্দ হয়। মনে হয় নীচের জল যেন ফুটিতেছে। বাহিরের মতন তার অন্তরেও দুর্যোগ চলিতে থাকে। মন বাহিরের দিকে টানে, ঘরের বন্ধন ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চায়। বাধা দেয় চিরন্তন অভ্যাস ও সংস্কার, কিন্তু শেষটায় বাহিরের টানেরই জয় হয়।

উঠানে দাঁড়াইয়া রাজেশ্বর অসহায়ের মতন ভিজিতে থাকে। এই বৃষ্টিতে পশুপক্ষীও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু

রাজেশ্বরের কোন খেয়ালই নাই। পায়ের পাতা পর্যন্ত জলে ডোবা, মাথার উপর বিরামহীন বর্ষণ, হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস কিন্তু তাতেও যেন তার দেহ-মনের উত্তাপ কমে না।

সে যাইয়া টগরের দরজায় মৃদু আঘাত করিতেই টগর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, এস মণ্ডল। আহা, বড্ড ভিজে গেছ দেখছি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বুঝি ?

এই অভ্যর্থনায় রাজেশ্বর কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। কি করা যায় ? ঘরেই ঢুকিবে না ফিরিয়া যাইবে, সে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিল এমন সময় টগর তার হাত ধরিয়া ঘরে তুলিয়া নিল। বাঁশের উপর হইতে একখানা শাড়ী তার হাতে দিয়া কহিল, কাপড় ছেড়ে এইখানা পরে ফেল, নইলে অসুখ করবে।

রাজেশ্বর মন্ত্রমুগ্ধের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। টগর কহিল, আশ্চর্য, অত ঘুম পেয়েছিল কিন্তু ঘরে এসে আর ঘুমুতে পারলাম না। ঠাকুরের নাম করছিলাম। শুনবে একখানা নাম গান ?

রাজেশ্বরের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই প্রদীপের পলিতা বাড়াইয়া দিয়া সে গাহিতে আরম্ভ করিল,

দয়াল হরি, দয়াল হরি
ননীচোরা রূপে ব্রজে
এলেন আমার দয়াল হরি,
গৌররূপে নদেয় এলেন
শচীর কোল উজল করি
দয়াল হরি, দয়াল হরি।

রাজেশ্বর অবাক বিস্ময়ে টগরের দিকে চাহিয়া রহিল। যে উগ্র আকাঙ্খা লইয়া সে আসিয়াছিল টগরের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, তার নামগান, সর্বোপরি তার দেওয়া ঐ শাড়ীখানা রাজেশ্বরের সে আকাঙ্খাকে

পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিল। সে তখন ছুটিয়া বাহির হইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু সেটুকু উৎসাহও তখন আর ছিল না। একটু পরে মহেশ্বরের ডাক শোনা গেল, বাবা, বাবা।

রাজেশ্বর যেন পরিত্রাণ পাইল। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। টগর তাহা লক্ষ্য করিল না। সে তখনও গাহিতেছে,

অহল্যাকে জিইয়ে দিলে
পাষাণে পদ স্পর্শ করি,
দয়াল হরি, দয়াল হরি।

রাজেশ্বর বাহির হইতে ঘরের দরজা ভেজাইয়া যায় নাই। হু হু করিয়া জোলো বাতাস ঢুকিয়াছে। বাতাস এত ঠাণ্ডা যে সুস্থ লোকের রক্ত তা'তে জমাট বাঁধিয়া যায়।

শীতে চাঁপার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে চাহিয়া দেখিল তার স্বামী বা টগর কেহই নাই।

এমনটি কখনও হয় না। রাত্রে তাকে একা ফেলিয়া তারা যায় না। আজ গেল কোথায় ?

খানিকটা প্রতীক্ষার পর সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাকিবার ক্ষমতা ছিল না, দরকারও ছিল না। সব সময়েই কাছে লোক থাকে, কেহ না থাকিলে সে একটা কাঁসার বাটিতে পিতলের ঝিনুক ঠুকিয়া ডাকে।

আজ তার এই শব্দও কেহ শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির রাত্রের গাঢ় ঘুম কাহারও ভাঙ্গিল না।

তার ভয় করিতে লাগিল। সে সমস্ত শক্তি দিয়া একবার ডাকিল, মহেশ। সঙ্গে সঙ্গেই হাঁপাইয়া পড়িল।

মহেশ বেড়ার আর এক পাশে শোয়। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কি মা ? উনি কোথায় ? বড় শীত।

চাঁপার সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছে। গলা দিয়া শব্দ যেন আর বাহির হয় না।

মহেশ্বর মাকে একটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, বাবা।

রাজেশ্বর যখন ঘরে ঢুকিল তখন তার সর্বাঙ্গ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কাঁধের উপর চক্‌চক্ করিতেছিল টগরের শাড়ীর বড় কালো পাড়। পাড়টা চাঁপার ভারী পরিচিত। দেখিবাই সে বিদ্যুতাহতের মতন একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। একটা মানুষকে শত বৃশ্চিকে দংশন করিলেও বোধ হয় এত চেঁচাইতে পারে না।

পিতাপুত্র পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। মহেশ কাতর কণ্ঠে কহিল, এ কী হ'ল বাবা?

চাঁপা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

রাজেশ্বরের এতদিন নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভাবিত কোন প্রলোভনই তাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। মানুষ নিজেকে কত কম চেনে তার প্রমাণ পাইল নিজের এই দুর্বলতা ধরা পড়ার পর। এখন দেখিল বরং চাঁপাই তাকে বেশী চিনিত। বুঝিল টগরকে আনিতে সে আপত্তি করিয়াছিল কেন। নিজের দুর্বলতার জন্য তার রাগ হইল টগরের উপর। তার সামনে যাইতেও সে সঙ্কোচ বোধ করিত। কিন্তু টগরের কোন বৈলক্ষণ্যই হইল না। আগের মতন হাসি-হাসি মুখ, সদা সপ্রতিভ ভাব, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই। রাজেশ্বরের এই রাগ শেষে গিয়া বর্তিল দেবতাদের উপর। সে ভাবে এত যে ডাকিলাম, দুর্গোৎসব ও কালীপূজা করিলাম, শিন্নি দিলাম, তার ফল কি এই? জীবনে কত লোক কত পাপ করে, কই তাদের ত' শাস্তি হয় না। একদিনের সামান্য ভুলের জন্য আমারই বা এত শাস্তি কেন?

সে রাগ করে বটে, কিন্তু আগেরই মতন ভোরে উঠিয়া সূর্য প্রণাম করে, দেবস্থানের সামনে তার মাথা আপনিই নোয়াইয়া আসে। কিন্তু অনুভব করে যে-ভক্তি দিয়া সে দুর্গাপূজা করিয়াছে চাঁপাকে পাইবার জন্য যে আন্তরিকতা লইয়া বিবাহের পূর্বে দেবতাদের ডাকিয়াছে—আজ সে ভক্তি ও আন্তরিকতা আর নাই।

তার এই অবিশ্বাস দেখিয়া টগর ভীত হয়। সে তার ঠাকুরকে ডাকে, ওর কোন অপরাধ নিও না হরি, আমার চিনিকে সারিয়ে তোল। কিন্তু দেবতা এই প্রার্থনা শোনেন না।

টগর একদিন পূজার ফুল লইয়া তার মাথায় দিবে এমন সময় তার ও রাজেশ্বরের সামনে চাঁপার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। রাজেশ্বর স্ত্রীর বুকের উপর পড়িয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল, ঠিক করেছ ঠাকুর, আমার পাপের শাস্তি হয়েছে।

মহেশ্বর পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল, একবার চাহিল টগরের দিকে। পিতার এই আর্তনাদের অর্থ সে বোঝে না। তার মনে পড়ে বৃষ্টির রাত্রির ঘটনা। মাতার জ্ঞান হারাইবার দৃশ্য। ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যই থাকিয়া যায়।

তার বাবাকে সে ভালবাসে। তার সমবয়সী আর পাঁচজনের বাবার চেয়ে তার বাবা কত বড়, কত ভাল, কত স্নেহময়। লোকে তাঁর কত সুখ্যাতি করে। মহেশ্বর ভাবে, তিনি এমন কি পাপ করিলেন যার শাস্তি তার মাকে বহন করিতে হইল? সে পিতাকে প্রশ্ন করিল, বাবা, মা মরল কেন?

দুই হাত দিয়া পুত্রের বাহু ধরিয়া রাজেশ্বর একটুক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি সে বলিবে? ছেলের কাছে মিথ্যা সে বলিবে না। অথচ সত্যই বা বলে কেমন করিয়া? সে একটু পরে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মহেশ্বর কিছুক্ষণ স্থাণুর মতন দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল তার স্নেহময় পিতার কথা। এমন মানুষ তার বাপ, তাকে সে আঘাত দিয়াছে। কী অন্যায়! না, জীবনে সে কখনও আর এই কৌতূহল মিটাইবার চেষ্টা করিবে না।

রাজেশ্বর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিল বিশেষ ঘটা করিয়া। চাঁপা পরলোক হইতে দেখুক, এক দিনের ভুলের জন্য সে কতটা অনুতপ্ত। তাকে আজও সে কতখানি ভালবাসে। চাঁপার আত্মার তৃপ্তির জন্য সে শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ ও চন্দনধেনু দান করিল। গরিবদের কাপড় দিল,

ভুরিভোজন করাইল। উচ্চবর্ণের খাওয়ানর ব্যবস্থা হইল ত্রিগুণাদের বাটীতে।

ওলফাত কাজী সাহেবের পুত্র কাজী আবদুল আজিজ মুসলমানদের খাওয়াইবার ভার নিলেন।

রাজেশ্বর যে সব পোড়ো ভিটা কিনিয়াছিল তারই একটা বড় ভিটার জঙ্গল কাটিয়া মাটি সমান করিয়া গোবর নিকানো হইয়াছে। নমঃশূদ্রদের এইখানে খাওয়ান হইবে। ভাত কেহ খাইবে, কেহ খাইবে না। সামাজিক নানা প্রশ্ন উঠিবে। তাই চিঁড়ার ব্যবস্থা। সঙ্গে আর পাঁচজনে যাহা করে দই, চিনি ও নারিকেল উপরন্তু জিলিপি ও রসগোল্লা। নারিকেল কোরাইতেই বসিয়া গেল শতাধিক লোক। প্রত্যেকের সামনে পাঁচ সাত খানা করিয়া কলাপাতা, তার উপর কুরুনি হইতে ঝুরঝুর করিয়া নারিকেল পড়ে। একটা ধারে জমে নারিকেলের স্তূপ, ভিটার আর একধারে গড়িয়া ওঠে মালার পাহাড়।

প্রত্যেককে মাটির খোরায় চিঁড়া দই দেওয়া হইল। পদ্মপাতার চিনি নারিকেল ও নুন। গড়ে প্রত্যেকে আধ সের চিঁড়া খাইল, একটা নারিকেল, তার উপর সের দেড়েক দই। রসগোল্লা ও জিলিপি খাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া লইবার জন্য প্রায় সকলেই আবার হাত পাতিল।

রাজেশ্বর ধনী, দরিদ্র, কুলীন-সামান্য, বৃদ্ধ, শিশু—প্রতিটি লোকের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু লাগবে? দিক দুটো রসগোল্লা?

সে যত্ন করে সকলকে। যুবারা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। বৃদ্ধরা আশীর্বাদ করেন। রাজেশ্বরের মনে পড়ে কটাই মহাশয়ের কথা। আলেয়ার আলোর মতন তিনি দপ করিয়া জলিয়া উঠিতেন বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার জল হইয়া যাইতেন। মানুষকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতে পারিতেন। অমন আশীর্বাদ করিবার

লোকও আজকাল আর পাওয়া যায় না। তিনি জীবিত থাকিলে বলিতেন, রাজুয়া তুই রাজা হ। তোর বৌ বৈকুণ্ঠে থাক্‌খুন।

চিঁড়া খাওয়ার পর খাবরা ভাঙ্গা। ভিটার প্রান্তে যাইয়া ছেলের দল যে যার উচ্ছিষ্ট মাটির খোরা আছড়াইয়া ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিল, বল হরি হরিবোল।

একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ। ত্রয়োদশ দিনে নিয়মভঙ্গ। চাঁপার মৃত্যুর পব হইতে রাজেশ্বর ও তার ছেলে মেয়েরা যে সব নিয়ম পালন করিতেছিল, সে সমস্তই ভঙ্গ করিল। জ্ঞাতিদের মাছ খাওয়াইয়া নিজেরা মাছ খাইল। মাথায় তেল দিল, চুল আঁচড়াইল, পান খাইল, জুতা-জামা পরিল।

বৈকালে টগর বলিল, তোমার বাড়ীর কাজ ফুরিয়ে গেছে মণ্ডল, এবার আমার ছুটি।

রাজেশ্বর বলিল, তুমি গেলে বীরু, নরু ওদের দেখবে কে? টগর বলিল, তুমি এবার বিয়ে ক'রে ফেল, বউ আনা তোমার দরকার।

কথাটা যেন রাজেশ্বরের মুখের উপর কষাঘাত করিল। যে টগর স্বামী হিসাবে তাকে আদর্শ মনে করিত, কথায় কথায় কতবার যে বলিয়াছে, তোমার মতন স্বামী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা, আজ নিয়মভঙ্গের দিনই সে বিবাহের কথা বলে। বলে, বউ আনা দরকার। রাজেশ্বরের মনে হইল, এ অধিকার ত' সেই তাকে দিয়াছে। সে বলিল, হ্যাঁ, আর কেউ না বললেও তুমি অন্ততঃ বলতে পার।

টগর বলিল, পারি ঠিকই, আমি যে এই ক'মাসে তোমায় খুব ভাল করেই চিনেছি। অত যার প্রেম—

রাজেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, ভাল বাসতে তুমি ত' আমার চেয়েও বেশী জান।

টগর বলিল, আমি যে মেয়ে মানুষ মণ্ডল, হিঁদুর মেয়ে।

রাজেশ্বর সসঙ্কোচে কহিল, একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে। তোমাদের কি বিয়ে হয়েছিল?

টগর কহিল, সূর্য্যি সাক্ষী করে ঘাঘরের গাঙে দাঁড়িয়ে আমরা বলেছিলাম জীবনে একে অপরকে কখনও ভুলব না। এর বেশী কিছু নয়।

রাজেশ্বর বলিল, দরকারও নেই, সূর্য্যিই হলেন ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা।

এই কয়দিনের পরিশ্রমের পিছনে ছিল উন্মাদনা। ছিল স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের নেশা। নিয়মভঙ্গের পর রাজেশ্বর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই। যে ইচ্ছা-শক্তি মানুষকে কাজে উদ্‌বুদ্ধ করে তাহাও লোপ পাইয়াছে।

সে আগে সূর্য-প্রণামের পর হাতমুখ ধুইয়া মাঠে যাইত। অন্ততঃ সামান্য কিছু জমির কাজ না করিয়া মুড়ি চিঁড়া বা পান্তাভাত কিছুই খাইত না। দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া ফলের খেতে বেড়া দিত, মাটি কোপাইত, বৈকালে দেখিত দোকান, চালানি কারবারের কাজ। রাত্রে বসিত সালিশি ও পঞ্চায়েতের দরবার লইয়া। এই সবের উপর ছিল ব্রতী সঙ্ঘ, দরিদ্রের সেবা, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ। শ্রমেই তার আনন্দ, মানুষটা যেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তার শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চলনের সঙ্গে উৎসাহের বন্যা বহিত। স্নানের সময় মধু বাড়ী হইতে খালের উজান বাহিয়া সে ভুবন দাশের ঘাট পর্যন্ত সাঁতার কাটিত। তার সঙ্গী ছিল তরুণের দল। তাকে কেহ হারাইতে পারিলে সে মিঠাই খাওয়াইত।

মাঝে মাঝে হইত দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। ছেলেদের সঙ্গে সে নিজেও দৌড়াইত। জয়ের মুহূর্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছাইয়া পড়িত, বলিত, আমি বুড়ো মানুষ, তোদের সঙ্গে পারব কেন?

এমন যে মানুষ, যুবাদের মধ্যেও প্রাণশক্তিতে যার সমকক্ষ দুর্লভ, সে আজকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাজ কিছুই করে না, সময়ে

খায় না। অনেক দিন অনাহারে বা একাহারেই কাটায়। খালের ধারে বসিয়া বসিয়া জোয়ার ভাটার মৃদু লহর দেখে, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবে। কখনও হয়ত কিছুই ভাবে না। শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যের পানে তাকাইয়া থাকে।

তার মনে পড়ে চাঁপার কথা। কতদিন কত ভাবে তাকে আদর করিয়াছে। কত হাসি, কত লুকাচুরি, যৌবনের কত লীলা-চপলতা। দুজনেরই যৌবন ছিল উদ্দাম। তবে চাঁপা নারী, তার সঙ্কোচ ছিল আর রাজেশ্বরের প্রেমে ছিল দুর্নিবার আবেগ। চাঁপার মতন স্বাস্থ্যবতী তরুণীও মাঝে মাঝে শ্রান্ত হইয়া পড়িত।

রাজেশ্বরের পরিবর্তনে আত্মীয় স্বজনেরা চিন্তিত হইল। কেহ ডাক্তার বৈদ্য দেখাইতে পরামর্শ দিল। কেহ বা কহিল, ডাক্তার-বদ্যির কর্ম নয়, রোজা দেখাও।

মহেশ্বর টগরকে কহিল, কি করব মাসীমা ?

টগর পরামর্শ দিল, চুপ করে থাক। কিছু করতে গেলে আরও খারাপ হবে।

লোকে রাজেশ্বরকে অসুস্থ বা ভূতগ্রস্ত মনে করে, আবার তাদেরই কেহ কেহ সম্বন্ধ লইয়া আসে। ব্রজবাসী ও মথুরাবাসীকে ধরে—রাজু তোমাদের ত' খুব ভালবাসে, কাজটা করিয়ে দাও। তাদের সমাজে সুন্দরী ও বয়স্ক মেয়েদের তালিকা দেখিয়া টগর, জবা, ব্রজ ও মথুরা সবাই বিস্মিত হয়।

কেহ কেহ প্রস্তাব লইয়া রাজেশ্বরের কাছেই উপস্থিত হয়। বলে, মাইয়া দেখলেই তোমার পছন্দ হবে, রাজু। সোমত্ত মাইয়া, ধব ধব করে রং আর চুল কি—একেবারে মেঘের বরণ।

যতগুলি প্রস্তাব আসে তার প্রত্যেকটি পাত্রীই কর্মঠ, সংসারী কাজে নিপুণ। বিমাতার যে সব গুণের অধিকারী হওয়া দরকার

বিধাতা তাদের সেই সমস্ত গুণে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তারা সকলেই ছেলেদের যত্ন করিবে। সময় মত গরুকে জাব দিবে।

রাজেশ্বরের বয়স আরও দশ-পনর বৎসর বেশী হইলে ঘটকরা নিশ্চয়ই বলিত, মাইয়া যা পাকা চুল তোলতে পারে, তোমার আর ভাবনা নাই।

তারা প্রত্যেকেই রাজেশ্বরের পরম হিতৈষী। সে এখন বিবাহ করিতে চায় না শুনিয়া তারা বলে, এ কও কি রাজু? এ আবার কি কারখানা? তোমার সংসার যে ভাসিয়া যাবে।

একদিন এক দূর-আত্মীয় আসিয়া ধরিল, চল মাইয়া দেইখ্যা আসবা। বেশী দূর না, এই তারাকান্দর গ্রামে। নামে মহারাণী, কাজেও মহারাণী। পুরুষ্টু গড়ন, একটা বাঘেও খাইয়া ছাড়াইতে পারে না।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিল, বাঘের খোরাক নিয়ে আমি কি করব?

ঘটক কহিল, আজই চল ভাই। সোমত্ত মাইয়া ইলশা মাছের মতন। বাজারে আইলে আর পড়িয়া থাকিবে না।

রাজেশ্বর যাইতে অসম্মত, ঘটকও নাছোড়বান্দা। শেষটায় সে হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলে রাজেশ্বর হাতের কাছ হইতে একখানা জ্বালানি কাঠ তুলিয়া বলিল, বেশী বাড়াবাড়ি কর ত' মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেব।

এই চিকিৎসায় সুফল হইল। লোকটা রটাইয়া দিল, রাজুর মাথা খারাপ হইছে। সম্বন্ধ লইয়া গেলেই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়।

চাঁপার চিকিৎসা, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতেই প্রচুর ব্যয় হইয়াছিল। শ্রাদ্ধে খরচা হইল প্রায় দেড় হাজার টাকা। রাজেশ্বর ঋণগ্রস্ত হইল। ঋণের পরিমাণ বেশী নয়, এত যার জমি জমা, কাজ কারবার, তার পক্ষে ঐ ঋণ শোধ করা সহজ। কিন্তু নিজে সে যে কিছুই দেখে না,

কোন বিষয়ে মন দেয় না, ভয় সেই খানে। ছেলেমেয়েরা ছোট, নিতান্তই অবুঝ। মেজ ও সেজ ছেলে সতু ও নরু পিতাকে না দেখিলে বলাবলি করে, বাবা মাকে আনতে গেছে। আর সব চেয়ে ছোট বীরু কাদামাটি মাখিয়া বম্ ভোলানাথ সাজিয়া বেড়ায়। যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়। দেশালাইর কাঠি, তরকারির খোসা, প্রদীপের পলিতা—বাদ দেয় না কিছুই। পেটের অসুখ লাগিয়াই আছে। আর নাকে কফ। পেটটা অস্বাভাবিক বড়।

জবার একার উপর এত বড় সংসারের ভার। সব দিক সামলান তার পক্ষে অসম্ভব। বাহিরের কাজ দেখে পরশুরাম কিন্তু সেই বা কতটা দেখিবে? তার কথা কেহ শোনে না। কর্তা যেখানে উদাসীন, শৃঙ্খলা সেখানে অসম্ভব। মজুর কৃষাণরা পরশুরামকে মানিতে চায় না, সেও শেষটায় হাল ছাড়িয়া দেয়।

টগর চুপ করিয়া সব দেখে। মধ্যে মধ্যে তার ঠাকুরের কাছে অনুযোগ করে, এ কি করলে ভগবান? আমাকে এমন অমঙ্গল দিয়ে গড়েছ যে, যেখানে আমি যাই, আমার পিছন পিছন সেইখানেই অনর্থ ধাওয়া করে। টগরের ইচ্ছা হয় এই রূপ-যৌবনকে সে নিজের হাতে পোড়াইয়া ফেলে।

এদিকে রাজেশ্বরের বিপদ ক্রমে মিছিল করিয়া আসিতে থাকে। চাঁপার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে দইহারীব গাঙে তার এক চালানি নৌকায় ডাকাত পড়িয়া নগদে ও মালে হাজার টাকার উপর লুটিয়া নেয়। সেই মাসেই চাষের দুইটা বলদ মরে। মাস দুই পরে রামকুমার সাহা টাকার জন্য নালিশ করিয়া দেয়। রাজেশ্বর তবুও নির্বিকার, সে একবার শুধু বলে, এ সব হবে আমি জানতাম।

প্রজাদের সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় দীঘিরপারের আশু তলাপাত্র রাজেশ্বরকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে না যাওয়ায় নিজে আসিয়া বলিল, চল রাজু, তুমি না গেলে গণ্ডগোল মেটবে না।

প্রজারা অধিকাংশ মুসলমান। সালিস হিসাবে তারা রাজেশ্বরের নাম করিয়াছিল।

দুপুর হেলিয়া গিয়াছে। রাজেশ্বর দীঘিরপার হইতে মাঠের আলের উপর দিয়া ফিরিতেছিল। খা খাঁ করে রৌদ্র। বাতাসে আগুনের হলকা বহিয়া যায়। আকাশ পুড়িয়া ধূসর হইয়া গিয়াছে। মাটিতে পা ফেলা যায় না। প্রতি পদক্ষেপেই যেন ফোসকা পড়ে, কাটা ঘাসের শুকনা ডগাগুলি পায়ের তলায় ছুঁচের মতন বেঁধে।

মাইল খানেকেব পথ। এর মধ্যে একটাও গাছ নাই। পথের শেষে কুরপালা গ্রামেব পাশে সত্যপীরের দরগা। প্রকাণ্ড একটা বট গাছ চারি দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারই তলায় ছোট চালাঘরে পীরের আস্তানা।

সুশীতল ঐ ছায়া মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন রাজেশ্বরকে আহ্বান করে। এই পীরস্থান বাল্য ও কৈশোরের অনেক কথাই মনে করাইয়া দেয়। খোন্দকার মকরম হুসেন ছিলেন এই দরগার সেবায়েত। লোকটি সদাশয়। ছেলেরা গেলেই তিনি ফল পাকুড় ও বাতাসা দিতেন। রাজেশ্বব প্রায়ই যাইত। বালকটি অনাথ, তার উপর সুশ্রী ও ভারী শান্ত। খোন্দকার সাহেব তাই তাকে বড় স্নেহ করিতেন। বেশী করিয়া শিন্নি দিতেন। বহু সন্ত সাধু ফকিরের গল্প বলিতেন। রাজেশ্বর অবাক্ হইয়া শুনিত। এই গল্পগুলি তার চরিত্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। বাল্যের এই স্মৃতির জন্য পীরের দরগা ছিল রাজেশ্বরের প্রিয় দেবস্থান।

বিবাহের পর চেলী পরা চাঁপাকে লইয়া সে প্রথম এখানেই আসে। তাকে দেখিয়া খোন্দকার বলেন, এ যে একেবারে হুরী বিয়া করছ, মল্লিকের পো। খোদার মেহেরবানে ফুতিছে থাক।

মৃত্যুশয্যায় তিনি রাজুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাকে দেখিয়া বলিলেন, আল্লার দোয়ায় তুমি সর্দার হইছ। তোমারে দেখতে ইচ্ছা করল তাই ডাকলাম।

আজ কোথায় সে বৃদ্ধ, কোথায়ই বা চাঁপা ?

পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের শব্দ হয়। বায়ুর শীতল স্পর্শ বড় মিষ্টি লাগে। উঠিতে আর ইচ্ছা করে না। জীবনের বিগত অধ্যায়ের প্রতিটি ছবি খুলিয়া রাজেশ্বর নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে থাকে। কাহিনীগুলি কত সুন্দর। কালস্রোতে সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সবই ধুইয়া মুছিয়া যায়। অনুভূতির সোনালী রেখাগুলি শুধু উজ্জ্বল হইয়া থাকে, তাই অতীত এত মধুর।

সে যখন উঠিল তখন রৌদ্রেব তেজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। চাষীরা আবার কাজ শুরু কবিয়া দিয়াছে।

সোজাসুজি দক্ষিণে শরৎ শীলের বাড়ী। বায়ে কিছু দূরে ভদ্র মামুদেব গোয়াল ঘব। ডাইনে জব্বর কারিকরেব মসজিদ।

শরতের ভাগিনেয় দুঃখীরাম সত্যই বড় দুঃখী, সে মাঠে মহেশ শীলেব গরু চবাইতেছিল। তার মা বাড়ীর পাশের ডোবায় দাঁড়াইয়া হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া কলমি শাক তুলিতেছে। দুঃখীব মামা কিছুদিন হইল তাদের পৃথক করিয়া দিয়াছে। এখন তার মাকে শাক ও খুদ সিদ্ধ করিয়া দিন চালাইতে হয়। এতবেলায়ও পেটে কিছু পড়ে নাই। খুদেব সঙ্গে শাক সিদ্ধ করিয়া বিধবা এবার নিজে খাইবে, রাত্রে দুঃখীকে খাওয়াইবে। দুঃখী সকালে মহেশেব বাড়ী ভাত পায় আর পূজার সময় একখানি আটহাতি কাপড়।

দুঃখীর মা রাজেশ্বরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নাই বুঝি ?

রাজেশ্বর বলিল, না দিদি।

দুঃখীর মা বলিল, বৌ মরিয়া কি যে হৈয়া গেলা, সোনার বরণ কালী করছ, হাড় বাইর হইয়া পড়ছে।

রাজেশ্বর এ সব কথা প্রায়ই শোনে, কোন উত্তর করে না। করিতে ভাল লাগে না। কিন্তু দুঃখীর মাকে উত্তর দিতেই হইবে। না দিলে সে আরও পাঁচটা প্রশ্ন করিতে করিতে পিছন পিছন আসিবে। সহানুভূতি দেখাইবে।

রাজেশ্বর বলিল, দীঘিরপারের আশুবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই দেরি হয়ে গেল।

এই উত্তর দুঃখীর মায়ের মনঃপূত হইল না। উহা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই প্রসঙ্গের বাহিরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাজেশ্বর কেন যে এমনটি হইয়া গেল সে সম্বন্ধে কোন জবাবই মিলিল না। তাই সে রাজেশ্বরের পিছন পিছন চলিতে লাগিল। শাক কিছু ডোবার ধারেই রহিয়া গেল। কিছুটা আঁচল হইতে ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে দুঃখীর মা প্রশ্ন করিতে করিতে চলিয়াছে, ছাওয়ালপানগো তোমার দেখে কেডা? একটা বিয়া করলা না কেন, রাজু ভাই? বয়স ত' এমন কিছু বেশী হয় নাই। আহা, অমন সোনার চাঁদ ছাওয়াল মাইয়া তোমার, কী কেলেশেই না তারা আছে!

রাজেশ্বর ও শরৎ দুই জনের বাড়ীর মাঝখানটায় ছোট বেতের ঝোপ। একটা হিজল গাছকে কেন্দ্র করিয়া বেতগুলি লতাইয়া আকাশে উঠিয়াছে। ঝোপের কাছে আসিলে রাজেশ্বরের বাটীর পিছনের পুকুর পাড় দেখা যায়। পাড়টা বেশ উঁচু এবং জলের দিকে ঢালু। গাছের পাতা পড়িয়া জল নষ্ট হয় তাই রাজেশ্বর পুকুর ধারে কোন গাছ রোয় নাই। সে দেখিল পুকুরের উত্তর পারে শ্রীধর শীলের পাণ্ডটে রংএর গাইটা ঘাস খাইতেছে। তার ঠিক পাশেই দাঁড়াইয়া তার ছোট ছেলে বীরু। একরূপ গা ঘেঁষিয়া বলিলেই চলে। গরুটা ভারী দুষ্ট্।

অনেককেই সে জখম করিয়াছে। রাজেশ্বর আগে শ্রীধরকে গরু বাঁধিতে দিত না। সে দূর হইতেই ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিল,—বীরু, অ—বীরেন।

শিশুমনের রহস্য অপূর্ব। বাপের সঙ্গে লুকাচুরি খেলিবার উদ্দেশ্যেই হয়ত বীরু ছুট দিল এবং একটু যাইয়াই পা পিছলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে জলের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। বেতের ঝোপ ঝাড় ভাঙ্গিয়া রাজেশ্বর তীরবেগে ছুটিল। পিছনে ছুটিল দুঃখীর মা।

বীরু একবার জলের মধ্য হইতে ভাসিয়া আবার ডুবিয়া যাইতেছিল ঠিক এই সময়ে রাজেশ্বর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বাপের কোলে উঠিয়া বীরু খালি হাঁপাইতে লাগিল। হাঁপায় আর মাথা ঝাঁকে। দুই তিনটা চুবানিতেই তার দম বন্ধ হইবার উপক্রম। একটু সামলাইবার পরই বেচারী ভয়ে কাঁদিতে থাকে।

তার সমস্ত চেহারা যেন একখানা করুণ ছবি, শীর্ণ দেহ, সর্বাঙ্গে খোস পাঁচড়া, হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে, তার উপর কাদার একটা লেপ। নাক দিয়া কফ গড়াইয়া পড়ে। দেখিলে মনে হয়, নিতান্তই অনাথ। রাজেশ্বর একদৃষ্টে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, তার মাতৃহীন অপোগণ্ড এই শিশুগুলি যেন সৃষ্টির টুকরা টুকরা বিড়ম্বনা। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বাছারে!

দুঃখীর মা বলিল, দাও আমার কোলে। আমি মুছাইয়া দি।

তার হারানো ধন ফিরিয়া পাইয়াছে, এ ধন আর কারও হাতে দিবে না—এই ভাবে বীরুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাজেশ্বর বলিল, আমিই দিচ্ছি মুছিয়ে, ওদের মা যে আমায় রেখে গেছে।

তার দৃষ্টিভঙ্গী সেই মুহূর্ত হইতে একেবারে বদলাইয়া গেল। সম্মুখে দীর্ঘ জীবন। কর্তব্যের বোঝা পাহাড়ের মত উঁচু। পথ কঙ্করময়। এই বোঝা বহিবার জন্য চাঁপা তাকে রাখিয়া গিয়াছে। অথচ সে

করে নাই কিছুই। আজকের এই ঘটনার জন্য সে দায়ী চাঁপার নিকট, দায়ী ভগবানের নিকট। চাঁপার স্মৃতির সে আর অবমাননা করিবে না।

মাতৃহীন সন্তানদের কেন্দ্র করিয়া রাজেশ্বর আবার এক নূতন যাত্রা শুরু করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলার সে এক স্মরণীয় যুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এমন শুভদিন আর আসে নাই। চৈতন্যযুগে ধর্মে, সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে বাঙ্গালীর আত্মোপলব্ধির অপূর্ব বিকাশ ঘটে, জাতি সেদিন নামগানের মধ্য দিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে বাঙ্গালী আবার জাগিল। এবার ধর্ম তার দেশমাতৃকার পূজা, মন্ত্র তার বন্দেমাতরম্। ইংরেজ শাসক এই বৎসর বাঙ্গালাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এই বিধানে পাবনা ও ফরিদপুরের লোক যশোর ও নদীয়াবাসীর পর হইয়া গেল। ডিব্রুগড় ও সদিয়ার লোক হইল তার আপন। নদীয়ার সঙ্গে যুক্ত হইল বেতিয়া ও যাজপুর। ইহার প্রতিবাদে বাঙ্গালী তারস্বরে ঘোষণা করিল, আমরা এক মায়ের সন্তান, পরস্পরের আমরা ভাই। কারও সাধ্য নাই যে আমাদের বিভক্ত করে।

এই প্রেরণাকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। স্বদেশী আন্দোলনেই প্রথম হয় ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্নিপরীক্ষা। সেই যজ্ঞের হোতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ঋত্বিক্ বিপিনচন্দ্র, আঁবদুল রসুল, চারণ ভাবীযুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন, ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ততই ফুটবে।

রঙ্গমঞ্চ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল শুনাইলেন, আবার তোরা মানুষ হ'।

এই আন্দোলনের দ্বিতীয় বর্ষে মহেশ্বর এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ডিভিশনাল বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়। দেশের স্কুলে সে ছিল সব চেয়ে ভাল ছেলে, দেখিতে সুশ্রী, মাষ্টাররা

তাকে স্নেহ করিতেন, সমপাঠীরা সম্মান করিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভাল ছেলে ও ধনী ছেলের ভিড়ের মধ্যে সে যেন হারাইয়া গেল। নিজেকে মনে হইল, নিতান্তই অকিঞ্চন।

ক্লাসে সে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে, কেহ প্রশ্ন করিলে জবাব দেয় কিন্তু গায়ে পড়িয়া আলাপ করে না। আলাপ হইলেও ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় না। জাতি সম্বন্ধে সমপাঠীরা সাধারণতঃ কোন প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু তুলিলে সে বড় বিব্রত বোধ করে। এই জাতির জন্যই কোন মেসে-হোষ্টেলে তার স্থান হয় নাই। শেষটায় তাকে আশ্রয় দেন তার ত্রিগুণা কাকা। এই আশ্রয় না মিলিলে হয়ত পড়াশুনাই বন্ধ হইত।

কলিকাতা বিরাট শহর, বড় বড় প্রাসাদ, সুন্দর রাজপথ। গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম—দেখিলে যেন বিস্ময় জাগে। কী কর্মব্যস্ততা এখানে, কী গতিপ্রবাহ। কিন্তু এই নগরীর রুক্ষ রূপ তার কাছে প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। এমন যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—সমস্ত আর্যাবর্তে কল্যাণ বিলাইয়া কলিকাতার নীচে আসিয়া সেই নদীও যেন কল কারখানার পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। জাহাজে নৌকায়, মালে মাস্তুলে, ধূমে ধোঁয়ায় কী কুৎসিত তার রূপ!

আর মঞ্জুরী? তার ছোট্ট খালটি ঝির ঝির করিয়া বহিয়া দুই কূলে পীযূষ ধারা ঢালিয়া যায়। ঝোপে ঝাড়ে রং বেরংএর পাখী কলকাকলি তোলে, ডালে ডালে বনজাত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল দুলিতে থাকে। কালো কুচকুচে ডাহুক শ্যাওলার উপর ডিম পাড়ে, জলের উপর গাংচিল নাচে। নিবিড় নীল আকাশে সমুদ্রের ফেনার মতন সাদা বকের পাতি ভাসিয়া বেড়ায়। মহেশ্বরের খালি মঞ্জরীতে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, মনে পড়ে দেশকে, স্নেহময় পিতাকে, ছোট ছোট ভাইগুলিকে, টগর জবাকে।

একদিন বৈকালে তারা চা খাইতেছে এমন সময় জানালার নীচে রাজপথে একদল তরুণ চীৎকার করিল, বন্দেমাতরম্।

মহেশ্বর উঠিয়া জানালার গরাদের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিল—বন্দেমাতরম্। ছেলেরা আবার ধ্বনি করিল, বন্দে—

এর পর ত্রিগুণা ও সবিতার দিকে চাহিতেই মহেশ্বরের লজ্জা বোধ হইতেছিল। ত্রিগুণা হাসিয়া বলিল, Thats all right my boy,

সেই হইতে স্বদেশী প্রশেসন দেখিলেই মহেশ্বর হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করে। জাতির জয়ধ্বনি শুনিলেই মন আনন্দে নাচিয়া ওঠে কিন্তু স্বভাবলাজুক এই তরুণ কোন প্রশেসনে যোগ দেয় না, সভায় যাইয়া দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি করে না। ভাবে, হয়ত তার পিতা ইহা অপছন্দ করিবেন।

কিন্তু দেশে সমবয়সীদের কাছে স্বদেশীর গল্প করিতে করিতে সে বেশ উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, বলে, শুনতে যদি গোলদীঘিতে লিয়াকৎ হোসেন, টহলরাম গঙ্গারাম—এঁদের বক্তৃতা। যেন আগুন ছোটে।

স্বদেশীর হাওয়া এর মধ্যে দেশেও পৌঁছিয়াছিল। মাদারীপুর-প্রবাসী ছাত্র ব্রজরাখাল আসিয়া কয়েকবার বক্তৃতা দিয়াছে। পোষ্টাফিসেও প্রত্যহই এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ডাক খুলিয়াই একজন উঁচু গলায় কাগজ পড়িতে আরম্ভ করে, পড়ে কোথায় কোন সভা হইয়াছে, কে কি গরম বক্তৃতা দিয়াছেন এই সব খবর। শ্রোতারা নিজ নিজ রুচি ও শিক্ষা অনুযায়ী মন্তব্য করে।

মহেশ্বরের দুঃখ এই যে তার স্বজাতির কেহ এই আলোচনায় যোগ দেয় না। চিঠিই তাদের কম। দু' একজন যারা চিঠি নিতে আসে তারাও উহা লইয়াই চলিয়া যায়। স্বদেশী সম্বন্ধে কোন উৎসাহই তাদের নাই।

এর ব্যতিক্রম তার বাবা ও টগর মাসীমা। টগরকে সে স্বদেশীর গল্প বলিয়াছিল সেই হইতে সে মধ্যে মধ্যে স্বদেশীর কথা জিজ্ঞাসা করে।

একদিন মহেশ্বর বলিল, পরাধীন দেশে সবাই ছোট। বামুন, শুদ্দুর সব সমান।

টগর বলিল, ছিঃ বাবা, ও কথা মুখে আনতে নেই। বামুনরা হলেন দেবতা।

মহেশ্বর হাসিয়া বলে, জগতের চোখে সবাই আমরা পারিয়া।

পারিয়া আবার কি জিনিস?

দক্ষিণ ভারতে এক রকম জাত আছে তাদের ছায়া মাড়াতে নেই।

টগর বিস্মিত হইয়া গেল, মানুষের ছায়া মাড়াতে নাই, সে আবার কী রকম?

মহেশ্বর বলিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের তফাৎই বা এমন কী? কথাটা শুনিয়া টগর গম্ভীর হইয়া গেল।

৩০শে আশ্বিন। রাখীবন্ধন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কোন ঘরেই উনান জ্বলিবে না। স্নানান্তে বাঙ্গালী পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিবে।

হাটের উত্তরে খালের পারেই ঈশ্বর দাসের বাড়া, তাঁর পূজামণ্ডপ, নাট-মন্দির। খাল এখানে বেশ চওড়া, তার উপর পাশাপাশি তিনটি ঘাট বাঁধা হইয়াছে। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ব্রজরাখাল একটা মিছিল লইয়া সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া আসিয়াছে। সকলকে স্বদেশীর মাহাত্ম্য বুঝাইয়াছে। সে বলে, পুবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অরুণ আলো। জাপান জেগেছে, এবার আমাদের পালা।

সবাই খালে নামিল। ব্রজরাখাল বলিল, বন্দেমাতরম্।

যুবারা সাঁতার কাটে, একদল কোমর জলে দাঁড়াইয়া গায়—

দেশ জননী জয়, জয় জয় বঙ্গ
কে ছেদিবে জননীর শ্যামল অঙ্গ?

স্নানান্তে রাখীবন্ধন। একে অপরের হাতে রাখী পরাইয়া দেয়।

কনিষ্ঠরা জ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে। তারপর হয় কোলাকুলি। হিন্দু মুসলমানকে বুকে টানিয়া লয়, মুসলমান তাকে ডাকে ভাই বলিয়া।

বৈকালে মঞ্জরীর হাটে সভা। কালীপ্রসন্নবাবু মঞ্জরীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। বক্তৃতা করিবেন জেলার সব চেয়ে বড় উকিল, বিখ্যাত বাগ্মী এবং সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহকর্মী শশাঙ্কমোহন।

তাঁরা আসিবেন—তাই সমস্ত পরগনাটা যেন এই সভায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। যুবার দল মিলিটারী মার্চ করিতে করিতে সভাপতি ও শশাঙ্কমোহনকে লইয়া উপস্থিত হইলে সকলে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। মহকুমার বড় উকিল শিবনাথের কন্যা তাদের দু'জনের গলায় মালা পরাইল।

প্রথমে বক্তৃতা দিল দুইটি যুবা, ব্রজরাখাল আর ইয়াকুব হাসান। তারপর ঘন ঘন করতালির মধ্যে শশাঙ্কমোহন আরম্ভ করিলেন, কে বলে, বাংলা মা আমার দীনা? কোটি কোটি যাঁর সন্তান, তিনি কখনও দীন দুঃখিনী হতে পারেন না। এস, আমরা তাঁর সন্তানরা সমবেত কণ্ঠে বলি, বাংলা এক, বাঙ্গালী এক। এমন কোন শক্তি নেই যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে। চাই ঐক্য, চাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের মিলন। আর চাই আত্মপ্রত্যয়।

তাঁর জলদগম্ভীর স্বর এবং ওজস্বিনী ভাষা সভায় অপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিল।

সভার শেষে ছিল বস্ত্রযজ্ঞ। বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। সভাপতি বহ্ন্যুৎসব ঘোষণা করিলে রাজেশ্বর দাঁড়াইয়া বলিল, আমার একটা নিবেদন আছে।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, নিশ্চয়। আপনি একটা জাতির নেতা। আপনার কথা শোনবার জন্ত আমরা সর্বদাই উৎসুক।

রাজেশ্বর বলিল, সভাপতি মহাশয় এবং পূজনীয় শশাঙ্কমোহন আমাদেব বিলাতী কাপড় পোড়াতে আদেশ করেছেন। আমার তাতে মত নেই।

সভায় যেন বজ্রপাত হইল।

একদল বলিল, বসে পড়। কেহ বা শৃগাল ডাকিতে শুরু কবিল।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, আপনার বোধ হয় আর কিছু বলবাব নেই? তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ।

রাজেশ্বব এবার বিনীত কিন্তু দৃঢকণ্ঠে বলিল, বিলাতী কাপড় পরা পাপ কিনা জানি না। সভাপতি মহাশয় এবং শশাঙ্কমোহন যখন বলছেন, তখন আমি পাপ বলেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কাপড় পোড়ান সঙ্গত নয়।

দাম্ভিক শশাঙ্কমোহনেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বলিলেন, Why not? Out with it. Be quick.

বাজেশ্বর বলিল, কাপড় পোডাবার বিরুদ্ধে আমার যুক্তি এই যে এমনিই আমাদের গবিবেব দেশ। লোকে পেট ভরে দু' বেলা খেতে পায় না, পববার কাপড় পায় না। শীতকালে ছেলে মেয়েদের গলায় ন্যাকড়া বেঁধে রোদে বসিয়ে বাখে। বুড়োরা তুষের তাওযায় আগুন পোযায়। তার উপব এবাব ভাবী দুর্বৎসর। চার টাকার চাল আট টাকায় উঠেছে। দুর্ভিক্ষ আসন্ন। এ অবস্থায় কাপড় পোডানো শুধু ভুল নয়, অন্যায়। আমি মনে কবি পাপ।

একদল বলিয়া উঠিল, ঠিক কইছ মল্লিকের পো। আর একদল চীৎকার করিতে লাগিল, বিলাতী কাপড় ছোঁয়া মহা পাপ।

রাজেশ্বব উঁচু গলায় বলিল, আপনারা আমার বিলাতী কাপড় দান কবাব অনুমতি দিন, আমি সমস্ত কাপড় বিলিয়ে দিচ্ছি।

রাজেশ্ববই দেশের বিলাতী কাপড়ের বড় ব্যবসায়ী। অনেক খুচবা দোকানদার তাব নিকট হইতে কাপড় কিনিয়া হাটে হাটে বেচে।

তার সহযোগিতা বিশেষ দরকার। বুদ্ধিমান কালীপ্রসন্ন ইহা জানিতেন, তিনি বলিলেন, আপনার যুক্তির গুরুত্ব আছে স্বীকার করি। কিন্তু এও ঠিক যে বড় কিছু করতে হলে ত্যাগের দরকার। ধনী, দরিদ্র সবাইকেই ত্যাগ করতে হবে। এখন আমরা যদি সামান্য দুর্বলতা দেখাই তা'হলে পরাজয় অনিবার্য।

রাজেশ্বর বলিল, সেইজন্যই বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা ত্যাগ করব বলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু যখন মনে পড়ে আমার বস্ত্রহীন জাতভাইদের করুণ মূর্তি, কাপড় পোড়াবার কথা তখন আমি ভাবতেও পারি না।

ক্রমে ক্রমে তার সমর্থকের দল বাড়িতে লাগিল। তার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, মণ্ডলই ত' ঠিক কথা কইছে ভাই। কতগুলি ছাই উড়াইয়া লাভ হবে কী?

এই সময় সভার মোড় ফিরাইয়া দিল ব্রজরাখালের বক্তৃতা। যেমন তার উৎসাহ তেমনি আন্তরিকতা, যেমন ভাষার জোর, তেমনি বলার ভঙ্গী। সে প্রমাণ করিল বস্ত্র-যজ্ঞ জাতির উন্নতির প্রথম সোপান। সকলে যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল দেশের মুক্তির পথ মাত্র একটি এবং সেটির আরম্ভ বস্ত্র-যজ্ঞে।

বহ্ন্যুৎসবের বিরোধী হইলেও সাধারণের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাজেশ্বর এক জোড়া কাপড় লইয়া আসিয়াছিল। উহা সভাপতির টেবিলের কাছে রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ছেলেরা তার উদ্দেশ্যে নানা কটূক্তি করিতে লাগিল। একজন বলিয়া উঠিল, মীরজাফর।

ব্যবসায়ীরা দুচার জোড়া করিয়া কাপড় আনিয়াছে। একজন দিল দশ জোড়া। সেই সব চেয়ে বেশী। কাপড় এত কম কেন জিজ্ঞাসা করিলে সবাই একই উত্তর দিল, অনেকদিনই নতুন কাপড় তারা আনায় নাই। পুরাতন প্রায় সব আগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

ব্যবসায়ীরা জনমতের বিরুদ্ধে কিছু না বলিলেও তাদের স্বার্থবোধই প্রবল হইল, কাপড় কম—তাই বস্ত্রযজ্ঞ জমিল না। শ্রোতাদের কেহ কেহ চাদর ও জামা খুলিয়া দিল বটে কিন্তু অধিকাংশই আসিয়াছিল এক বস্ত্রে। তাই যজ্ঞের আগুন ভাবপ্রবণ লোকের উৎসাহের মতন আকাশে উজ্জ্বল শিখা তুলিয়াই একটু পরে ম্লান হইয়া গেল।

লোকে বলিল, এর জন্য দায়ী রাজেশ্বর। তারা রাগ করিল তার উপর। সব চেয়ে বড় দোকানদার যদি মাল না দেয়, তবে ছোটরাই বা দেবে কেন? মিথ্যা ত' তারা বলিবেই।

মহেশ্বর এতক্ষণ চুপ করিয়া সব দেখিতেছিল। আগুন প্রায় নিবিয়া যাইবে এই সময় সে ছুটিয়া নিজেদের দোকানে গিয়া, বুকের সঙ্গে বাধাইয়া দুই হাতে যতগুলি পাবে কাপড় আনিয়া নিবন্ত ভস্মস্তূপে নিক্ষেপ করিল। আগুনের জ্বলন্ত শিখা তার তরুণ ললাটে যেন রক্ত তিলক আঁকিয়া দিল। সকলে বলিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্।

শশাঙ্কমোহন তাকে বুকে টানিয়া নিলেন। তার পরিচয় শুনিয়া কহিলেন, তুমি ভাল স্কলার, বাঃ বাঃ। বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবার ভারী সুখী হলুম।

এই পিতৃনিন্দা মহেশ্বরের অসহ্য ঠেকিল। ইহা শুনিবার জন্য সে কাপড়ের বোঝা আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে নাই। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে রাজেশ্বর পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, অতগুলি কাপড় পুড়িয়ে ভাল করনি, মহেশ।

মহেশ্বর একটুক্ষণ পিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, তোমায় লোকে বিশ্বাসঘাতক বলবে, বলবে মীরজাফর। এ আমি সহ্য করতে পারলুম না।

রাজেশ্বর ছেলেকে বুকে টানিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই রাজেশ্বরের বাড়িতে ভিড় জমিতে থাকে। দলে দলে যুবা, বৃদ্ধ ও শিশু, নর ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান সমবেত হয়। গত রাত্রেই আসে পাশের গ্রামগুলিতে লোকের মুখে মুখে খবরটা ছড়াইয়া পড়ে যে, রাজু মল্লিক গরিবদের কাপড় দান করিবে স্বদেশীওয়ালারা পরম উৎসাহে তার বাড়ীর পথ দেখাইয়া দেয়। দুপুরের দিকে উত্তরে সুদূর রাধাগঞ্জ ও দক্ষিণে ঝনঝনিয়ার লোকও আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। কেহ তালের ডোঙায় আসিল, কেহ বা ভাঙ্গা নৌকায়। অনেকে আসিল হাঁটা পথে, খাল বিল সাঁতরাইয়া ধাপ দল ভাঙ্গিয়া।

রাজেশ্বর দেশী কাপড়ের চালান আনিবার জন্য ভোরেই ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়াছিল। খবর শুনিয়া পরশুরামকে ষ্টেশনে মাল খালাসের জন্য পাঠাইরা সে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিল।

দূর হইতেই সে কলরব শুনিয়াছে কিন্তু ভিড় যে এত বেশী তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তার বাড়ীতে সকলের স্থান হয় নাই, কেহ ডোঙ্গায় বসিয়া আছে, কেহ আশ্রয় লইয়াছে পাশের পোড়ো ভিটায়।

এই তার দেশ, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আত্মীয় স্বজনের দল। কী গভীর দুর্দশার ছবি! বয়স্কদের পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, রমণীর বুকে আবরণ নাই বলিলেই চলে আর শিশুরা দিগম্বর। সাত আট মাইল পথ ভাঙ্গিয়া তারা আসিয়াছে। বৃদ্ধ অন্ধকে খঞ্জ পথ দেখাইয়াছে,

খপ্নের অবলম্বন হইয়াছে অন্ধ। তারা আসিয়াছে শুধু একখানা কাপড়ের জন্য। কিন্তু নেতারা সেই কাপড় হইতেও এদের বঞ্চিত করিতে চান। তাতেই নাকি দেশের মুক্তি।

বুদ্ধিমান রাজেশ্বর পথে চিঁড়া ও গুড় সংগ্রহ করিয়াছিল। বাড়ী পৌঁছিয়াই শিশুদের দুধের ব্যবস্থা করিল। হাটে পাঠাইল আরও চিঁড়ার জন্য।

টগর কহিল, আমার ঠাকুর আজ তোমার দরজায় এসেছেন।

রাজেশ্বর বলিল, তাই ত' এসেই তোমায় খবর দিয়েছি।

বস্ত্র বিতরণ এক দিনেই শেষ হইল না। পরপর আরও দুইদিন লোক আসিল, অবশ্য সংখ্যায় অনেক কম। তৃতীয় দিনের বৈকালে রাজেশ্বর হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার কাপড় ত' ফুরিয়ে গেছে। আমায় মাফ করুন আপনারা। দুঃখীরা কলরব করিতে লাগিল। বস্ত্র-যজ্ঞের সমর্থকেরা বলিল, কেমন জব্দ! আবার একদল সুখ্যাতিও করিল, বুকের ছাতি বটে রাজু মল্লিকের।

কিন্তু এই দানে সব চেয়ে অসুখী হইল তার মেজ ছেলে তারকেশ্বর। এর মধ্যেই সে বস্ত্র-যজ্ঞের একটা হিসাব তৈয়ারী করিয়াছিল। কেষ্ট সাধু বার টাকার কাপড় দিল। রামকুমার নয় টাকা এগার আনার, লেছু দরজী সাড়ে সাত টাকার। সবচেয়ে বেশী কাপড় সুধীর কবের। তাও কুড়ি টাকার উপরে নয়। তারকের ফর্দে প্রত্যেক দোকানদারের নামই ছিল। মহেশ্বরকে সে বলিল, দু' টাকার কাপড় পুড়িয়ে সবাই বাহবা নিলে। আর আমাদের কাপড় পুড়ল প্রায় চল্লিশ টাকার। অথচ আমরা হলুম দেশের শত্তুর।

মহেশ্বর কহিল, বাবা যা সত্যি বোঝেন তাই বলেন কিনা, লোকে তাঁকে ঠিক বুঝতে পারে না।

তারক বলিল, এই সত্যিতে লাভ কি ? দান ধর্ম করে আমাদের হাতে শেষটায় নারকোলের মালা তুলে দিয়ে যাবেন, এই ত ?'

এই দুই সহোদরের চরিত্রের গঠনই স্বতন্ত্র। আরও দুই বৎসর আগের কথা। তখন হইতেই তারক সমবয়সীদের সঙ্গে লইয়া দোকান-দোকান খেলে। কেহ দাম বাকি রাখিতে চাহিলে বলিত, বাকিতে নিলে ব্যাজ লাগবে, এর পর কিন্তু নগদ টাকা নিয়ে এসো। ভিখারীদের দেখিলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। মহেশ্বর ঠিক এর বিপরীত। পরের দুঃখে সে গলিয়া যায়।

তারককে সে বরাবরই অনুকম্পার চোখে দেখে। তারক মনে করে, দাদা পড়াশুনায় ভাল বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কিছু কম। টাকার মূল্য সে মোটেই বোঝে না। বুঝিলে বাপকে এত খরচা করিতে নিষেধ করিত।

একদিন কথায় কথায় সে বলিল, টাকা ঢেলে বাবা মহৎ সাজেন, একে বোকা বলব না ত' কি বল দেখি ?

বাবাকে বোকা বলিস্, "ষ্টুপিড"—বলিয়া মহেশ্বর তার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল।

"ষ্টুপিড" তুমি বলিয়া তারকেশ্বর দাদার দিকে ছুটিয়া গেলে জবা আসিয়া বাধা দিল। বলিল, ছিঃ ছিঃ, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করতে নেই।

তারকেশ্বর বলিল, ও আমায় মারল কেন ? মহেশ্বর বলিল, বাবাকে তুই বোকা বললি কেন ?

জবা অবাক হইয়া গেল। তারককে বলিল, ছিঃ ছিঃ, অমন মানুষ তোমার বাবা, তাঁকে বোকা বলেছ ?

তারকেশ্বর বুঝিল ব্যাপারটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে আর কোন উত্তর করিল না।

মহেশ্বরের ছেলে মহলে বেশ খাতির। ব্রজরাখালরা প্রশেসনের সময় তাকে ডাকিতে আসে, বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করে। সে মধ্যে মধ্যে সভায় যায় বটে কিন্তু বক্তৃতা দেয় না, প্রশেসনেও যোগদান করে না। তার বাবাকে যারা অশ্রদ্ধা করে, তাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিক সাজিতে মহেশ্বরের ভাল লাগে না। ছুটি ফুরাইবার দু' একদিন আগেই সে কলিকাতায় চলিয়া যায়।

কয়েকদিন পরেই থানা হইতে রাজেশ্বরেব নামে সমন আসিল। রাখীবন্ধনের দিন সভায় যারা বিলাতী কাপড় পোড়াইয়াছে তারা প্রত্যেকেই সমন পাইল—মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির হইবাব আদেশ।

আই, সি, এস, সাহেব হাকিমের সামনে যাইয়া অনেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল, গ্রামের লোকের ভয়ে আমরা কাপড় পুড়িয়েছি। নইলে ধোপা নাপিত বন্ধ করত।

সাহেব বাংলা পরীক্ষা দিয়া সম্প্রতি পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় কহিলেন, ভয় কিসের? তোমরা রেজর সহযোগে ক্ষৌরকর্ম সাধন করিবে, সাবান দ্বারা বস্ত্র ধৌত করিবে।

তাদের উকিল শিবনাথ সেন বলিলেন, হুজুর, ক্ষৌরকার ও রজক আমাদের বৈদিক ধর্মকর্মের স্তম্ভস্বরূপ।

সাহেব ত' হাসিয়াই অস্থির। তিনি বলিলেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে বেদ Depository of all knowledges, জ্ঞানের মাইন স্বরূপ অর্থাৎ খনি। যেমন কোল মাইন, মাইকা মাইন। আপনি বলিতেছেন রজক ও ক্ষৌরকার বৈদিক ধর্মের Pillars. They are funny pillars indeed.

সত্য কথা বলিল দুইটি দোকানদার আর বলিল রাজেশ্বর। সে স্বীকার করিল, যে পোড়াইবার জন্য সেই প্রথম কাপড় দিয়াছিল।

হাকিম সভার খাঁটী বিবরণ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার অপরাধ লঘুতম, যাকে বলে যান্ত্রিক।

রাজেশ্বর হাকিমের কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না।

হাকিম কহিলেন, It is technical, his offence. Isn't it যান্ত্রিক, পেস্কার বাবু?

পেস্কার কহিলেন, ইয়েস ইয়োর অনার।

হাকিম কহিলেন, হে রাজেশ্বর বাবু, আপনি বস্ত্রযজ্ঞে অনিচ্ছুক ছিলেন। ভুল স্বীকার করিলেই ক্ষমার যোগ্য হইবেন।

রাজেশ্বর বলিল, অন্য কারণে কাপড় পোড়ানো আমি অনুচিত মনে করেছিলাম। কিন্তু কাপড় পুড়িয়ে ভুল করিনি। আমার মতে বিলাতী কাপড় ছোঁয়া পাপ।

ওঃ, আই সি, ইউ—ইউ—সাহেব চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া নেপালপুর থানার দারোগাকে ধমক দিলেন, "ইউ আর এ ফুল"। দারোগার অপরাধ এই যে, রাজেশ্বরের সত্যকার স্বরূপ সে ধরিতে পারে নাই।

সাহেব হাকিমের মুখের উপর বিলাতী বস্ত্রের নিন্দা—এত বড় সাহস। অন্য সব আসামীর চেয়ে রাজেশ্বরের উপরেই তার বেশী রাগ হইল। অপর দুইজনের প্রত্যেককে দশ টাকা জরিমানা করিয়া তিনি রাজেশ্বরকে বলিলেন, I fine you Rs. fifty. আমি তোমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলাম।

ব্রজরাখাল কাছারিতে উপস্থিত ছিল। রাজেশ্বর কাছারি প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইলে সে সদলবলে তার অভ্যর্থনা করিল। তার ও অপর দুইটি ব্যবসায়ীর গলায় মালা পরাইয়া বলিল, "বন্দেমাতরম্"।

সেই দিনই সে মহেশ্বরকে লিখিল, তোমার বাবাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম, মহেশ। সেদিন কাছারিতে দেখলাম তিনি কত বড়।

কাপড় পোড়াবার তিনি বিরোধী ছিলেন কিন্তু হাকিমের সামনে সে কথা বললে, সমগ্র জাতির অপমান হয় বলে নির্ভীক ভাবে বললেন, বিলাতী কাপড় ছোঁয়া পাপ মনে করি।

তিনি খাঁটী মানুষ—মিথ্যে বলেননি। সেদিন লক্ষ্য করলাম, তোমার বাবার তেজ আর দেখলাম সাহেব হাকিমের মেজাজ। সে যেন ফেটে পড়ছে। শাসকবা শাসিতের তেজ বরদাস্ত করতে পাবে না। সাম্রাজ্যবাদের খাঁটী স্বরূপই এই। হাকিম সুধীর কর ও রফিকের দশ টাকা করে জরিমানা করলেন। তোমার বাবার হ'ল পঞ্চাশ টাকা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন মেঘলা থাকার পর সূর্যোদয়ে মানুষের মনের যে অবস্থা হয়, মহেশ্বরের অবস্থা হইল ঠিক সেইরূপ। আজ রাখাল তার বাবাকে চিনিয়াছে, কাল কালীবাবু চিনিবেন, চিনিবেন শশাঙ্কমোহন, শিবনাথ।

সে চিঠিখানা ত্রিগুণা কাকাকে দেখাইল। ত্রিগুণা কহিল, তোমরা ওঁকে চিনছ আজ। আমি ত' ছেলেবেলা থেকেই চিনি। হি ইজ এ জেম্। মহেশ্বরের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

গ্রামের লোকেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। দুদিন আগে যারা নিন্দা করিয়াছে, তারাও বলিল, বাজু যে দেশকে ভালবাসে তা আমরা বরাবরই জানতাম।

তার কারবার আরও জোর চলিতে লাগিল। বিভিন্ন বিচিত্র পাড়ের জোলার শাড়ী ও কাপড়ে সে পরগনার হাট বাজার ছাইয়া ফেলিল। সকলেই তার উন্নতি চায়, মঙ্গল কামনা করে। মানুষের

শুভেচ্ছার মধ্য দিয়া জরিমানার পঞ্চাশ টাকা বহুগুণ মুনাফা লইয়া ফিরিয়া আসে।

কিন্তু রাজেশ্বরকে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত করিল তার জামাতা ও বৈবাহিক। একটি মাত্র মেয়ে দুর্গা। রাজেশ্বর তার বিবাহে যথেষ্ট ঘটা করে। বর ও ঘর দুইই ভাল, বর সাব রেজিষ্ট্রার, দেশে তাদের জমিজমা প্রচুর। দেশ খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জে। বিখ্যাত সিভিলিয়ন হোপ সাহেব এই পরিবারের মুরুব্বী। তিনি যখন খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট তখন এই পরিবারের কর্তা বেচু গজাল তাঁকে ব্যাণ্ড বাজাইয়া বাজি পোড়াইয়া নিজেদের দেশে আনে। সাহেবকে দিয়া নিজের বাড়ীতে আম, লিচু ও নারিকেল গাছ পোঁতে। গাছগুলির নাম দেয়, হোপ ম্যাঙ্গো, হোপ লিচি, হোপ কোকোনাট।

গাছে তখনও ফল ধরে নাই। হোপ সাহেব সেই সময় দার্জিলিঙে। বাংলার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বেচু মুর্শিদাবাদ হইতে উৎকৃষ্ট আম কেনে, শীতের পোশাক তৈরি করায়। রাজভাষা হইতে কয়েকটি বাছা বাছা শব্দ মুখস্থ করিয়া লয়। দার্জিলিঙে যাইয়া সাহেবকে আম উপহার দিয়া বলে, Pen tree's fruit Sir, Early crop. Hope mango Sir, Your tree. First Presentation to You like God's Puja. ইহার সারার্থ এই, আপনার হাতের রোয়া কলমের গাছের ফল। নাম হোপ আম। কলমের গাছে ফল খুব তাড়াতাড়ি ফলে। দেবতার অর্ঘের মতন আপনার পূজার জন্য সর্বাগ্রে এই নিয়ে এসেছি।

সাহেব ত' মহা খুশি। তিনি বলিলেন, You are a jolly old fellow. What is your son Felaram doing? খাসা মানুষ তুমি। তোমার ছেলে ফেলারাম কি করছে?

All right Sir, Your honourship Sir. Felu F. A. giving and failing. No pass. ফেলু এফ, এ দেয় আর ফেল করে।

Send him to me. I shall make him a Sub-registrar. আমর কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তাকে সব-রেজিস্ট্রার করে দেব।

Thank your Lordshlp, Sir,

ফেলারাম দার্জিলিংএ যাইয়া হোপ সাহেবকে সেলাম ঠুকিল। চাকরি মিলিল এবং সাহেবরই সাহায্যে ফেলারাম গজাল নামও উপাধি দুইই বদলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র রায়ে পরিণত হইল। এই বঙ্কিমই রাজেশ্বরের জামাতা।

বাজেশ্বরের জরিমানাব কথা শুনিয়া বেচু গজাল প্রমাদ গণিল। এই বকম রাজদ্বিষ্ট লোকের মেয়ের সঙ্গে সে ছেলের বিবাহ দিয়াছে। কী বিপদ!

কিছুদিন পরে বাজেশ্বব দুর্গাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে বেচু গজাল পুত্রবধূকে ত' দিলই না, উপরন্তু বৈবাহিককে লিখিল,—

বিলাতী কাপড পোড়াইবার জন্য সাহেব হাকিম আপনার জরিমানা কবিয়াছেন। এ অবস্থায় বধূমাতার আপনার ওখানে যাওয়া আমি সঙ্গত মনে কবি না। শ্রীমান্ বঙ্কিম একজন হাকিম, ভবিষ্যতে আরও বড় হাকিম হইতে পারে। বর্তমানে আপনার সঙ্গে তাব কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা না থাকাই ভাল। আপনার কন্যা ও জামাতাব মঙ্গলেব জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। কিছু মনে করিবেন না।

আর একটা কথা, আপনাব পুত্র মহেশ্বর ভাল ছেলে। সে হয়ত একদিন হাকিম হইতে পারে। শুনিলাম সেও স্বদেশী করে। তাহাকে নিবৃত্ত করিবেন। নতুবা শ্রীমানের হাকিম হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাইবে।

শ্বশুরের এক চিঠির উত্তরে বঙ্কিম লিখিল, আমাদের মধ্যে এখন চিঠিপত্র বন্ধ থাকাই ভাল। ইহা পড়িয়া রাজেশ্বর একটু হাসিল। তার দুঃখ হইল দেশের অবস্থার কথা ভাবিয়া। অশিক্ষিত বেচু গজালের আর দোষ কি—শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কোন কোন পরিবারকেও সে সাহেবের

নামে এইরূপ গাছ পুঁতিতে দেখিয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য এই যে ইহারাই সরকারের অনুগ্রহ পাইয়া পরে সমাজের নেতা হয়।

সে একজন কংগ্রেসের নেতার কথা জানে যিনি সভায় ইংরেজের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেন আর কলিকাতা প্রবাসী উকিল পুত্রকে চিঠিতে লেখেন, সাহেব সুবোদের ধরে একটা চাকরি বাগাবার চেষ্টা কর।

এইরূপ একটা গোঁজামিলের চেষ্টা দেশের সর্বত্র, সমাজের প্রতি স্তরে।

রাজেশ্বর ইহাতে বেদনা অনুভব করে কিন্তু এতদিন এ ধারণা তার ছিল না যে স্বদেশী করার অপরাধে কন্যার সঙ্গেও পিতার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয়। এ যে কতবড় অভিশাপ, মনুষ্যত্বের কতখানি গ্লানি সে বোধটুকু পর্যন্ত দেশবাসীর লোপ পাইয়াছে। দুঃখ এইখানে।

রাজেশ্বরের অনুমান সত্যে পরিণত হয়। কয় মাস যাইতে না যাইতেই পরগনার দুর্ভিক্ষ লাগে। গতবার আমন ভাল হয় নাই, আউশ মাঠে পুড়িয়া গিয়াছে। আড়াই টাকা তিন টাকা হইতে চাল সাত আট টাকায় উঠিয়াছে। রাখী বন্ধনের সময়ই অনেকের জমিজমা বন্ধক পড়ে, ঘটিবাটি বিক্রয় হয়।

এর পর শুরু হয় ভিক্ষা। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়ার লোক এক গ্রামে দু'চার জনের বেশী নাই। ভিখারীই প্রায় সকলে। অন্নের অভাবে লোকে প্রথমে মাছ ও কাছিম খাইল। তাহা ফুরাইলে কচু ও কলমী শাক। শেষে তাহাও মিলিত না। দেশের মাতব্বররা মহকুমা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন পেশ করিলেন। একদল কলিকাতার কাগজে চিঠি পাঠাইলেন।

পরাধীন দেশে রাজশক্তির রথ প্রজার প্রয়োজনে খুব মন্দ গতিতেই চলে। চলার তাগিদ তার নাই। অন্তর ও বাহির, কোন দিক দিয়াই বাধ্য বাধকতা নাই। তাই দুর্ভিক্ষের সরকারী সাহায্য আসে প্রয়োজন বহুলাংশে মিটিবার পর। এই মিটাবার ভার স্বল্পশক্তি দেশবাসী কিছু নেয়। আর নেয় প্রকৃতি ও মহাকাল।

এই সময় পরগনাকে রক্ষা করিবার ভার নেয় ত্রিগুণা। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে দেশে আসে। মানুষের দুরবস্থা দেখিয়া শ্রাদ্ধের ব্যয়-বাহুল্য বন্ধ করিয়া দেয়। এই কয় বৎসর লেখা পড়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল। সভা-সমিতিতে কংগ্রেস কনফারেন্সে যোগ

দিত না। কেহ অনুরোধ করিলে বলিত, ও সব আমার পোষায় না।

এই পরিবর্তন মহেশ্বরের কাছে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। এই তার ত্রিগুণা কাকা যিনি দেশে স্কুল করিয়াছেন, ব্রতী-সঙ্ঘ গড়িয়াছেন, কলেরার রোগী পাইলেই সেবা করিতে ছুটিয়াছেন।

দেশের এই দুর্দিনে আবার ত্রিগুণার আবির্ভাব। কলিকাতার কাগজে কাগজে সে দেশের দুর্ভিক্ষের কথা লিখিল। ঘন ঘন সভা ডাকিল। নেতাদের কাছে গেল। চাঁদা তুলিতে লাগিল বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া। কালীপ্রসন্ন তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

তিনিও এই জেলারই লোক, আর্তের সেবার জন্য তাঁর খ্যাতি প্রচুর, সমাজে প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কলিকাতায় মোটা রকমের চাঁদা সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের ভার ত্রিগুণার হাতে দিয়া তিনি মঞ্জরীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। সপ্তাহে দুইদিন দেড় হাজারের উপর লোককে চাল দেওয়া হইত। অনেকেই আট দশ মাইল দূর হইতে আসিত খাল, নদী, বিল সাঁতরাইয়া।

শরৎ ডাক্তারের বাড়ী আহার করিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু দুপুরের পর আসিয়া হাটে বসেন, ওঠেন তার পরদিন বেলা দুটায়। এর মধ্যে এক মিনিট বিশ্রাম করেন না, একবার চোখ বোজেন না, লোকে বিস্মিত হয়। একটি মেয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখিল,

'কালী বাবু এ ধরায় দেব অবতার।'

ব্রতী-সঙ্ঘ আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। কালীপ্রসন্ন বাবু সঙ্ঘের যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। সঙ্ঘের ছেলেরা চাল সংগ্রহ করিত' সারারাত ধরিয়া চাল বিলাইত। পল্লীগ্রামে চায়ের তখনও প্রচলন হয় নাই। কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, নূতন প্রেরণা পাইবার জন্য সকলে এক সঙ্গে ধ্বনি করিত, "বন্দেমাতরম"। কারও

কারও দু' একটা বিড়িরও দরকার হইত। স্বদেশী আন্দোলনে এই বিড়ির প্রথম আবির্ভাব। বিলাতী বস্ত্রকটের ফলে তার প্রসার।

ব্রতী-সঙ্ঘের প্রধান কর্মী ছিল পরেশ বাঁড়ুয্যে, বেঁটে খাটো এই লোকটির বাড়ী বরিশাল জেলায়। পশ্চিমপারে শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া হাই স্কুলে পড়ে। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ সে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কেহ বলে, স্কুলে তার নাম আছে, কেহ বলে নাই। বাইশ তেইশ বছরেই তার মাথায় একটি টাক পড়িয়াছে। গোঁফ জোড়া যেমন পুষ্ট, তেমনি সূক্ষ্মাগ্র। কালীপ্রসন্ন বাবুও তাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করেন। পরেশ ছেলেদের বলে, তোমরা আমায় খাতির করে কথা কইবে। দেখছ না আমার পজিশন?

কোন গ্রামে কলেরা লাগিলে সর্বাগ্রে সে ছুটিয়া যায়। শব সৎকারের জন্য প্রথমে তার ডাক পড়ে, মড়া পোড়াইবার গাছ কাটিতে তার সমকক্ষ আর কেহ নাই। আবার শ্রাদ্ধের সময় বাজার-হাট করিতে, পদ্মপাতা সংগ্রহ করিতে, নারিকেল কোরাইতে—সব কাজেই দরকার হয় পরেশের।

মানুষটি অদ্ভুতকর্মা, গাহিতে বাজাইতে যেমন রান্না এবং পরিবেশন করিতেও তেমনই নিপুণ। ব্রতী-সঙ্ঘের সে ড্রিল-মাষ্টার। স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী লইয়া মধ্যে মধ্যে সে কুচ কাওয়াজ করিয়া বেড়ায়। তার লেফট্ রাইট শুনিলে মনে হয়, এবার সত্যকার একটা জাতীয় বাহিনী গড়িয়া উঠিবে। তার কর্ম প্রেরণার জন্য মধ্যে মধে দরকার এক ছিলিম তামাকের। সে বলে, একটু ষ্টিম দিয়ে নিচ্ছি ভাই।

দুর্ভিক্ষের কাজে মহেশ্বর ছিল পরেশের একজন প্রধান সহকর্মী। এফ্, এ পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ীতে আসিয়াছিল। সেবার কাজে সে আপ্রাণ খাটিল। এই বিষয়ে তার আদর্শ ছিলেন কালীপ্রসন্ন,

তার বাবা আর পরেশ। ছুটিটা তার ভালই কাটিল। সেবা করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সে তৃপ্তি পাইল।

এই সময় তার তরুণ মনকে প্রভাবিত করিল আর দুইটি ভাবধারা—একটি ব্রাহ্মসমাজ, অপরটি রামকৃষ্ণ মিশন।

সমাজের শিক্ষিত স্তরে কেশব চন্দ্র সেনের প্রভাব তখন অসামান্য। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক জন আচার্য নিজ নিজ চরিত্রবলে সেই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আদি সমাজে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ-সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই এঁদের মধ্যে প্রধান।

মহেশ্বর থাকে ব্রাহ্ম বাড়ীতে। ত্রিগুণা, কালীপ্রসন্ন এঁরা তার আদর্শ। কালীপ্রসন্নের প্রার্থনা আর ভাল লাগে। "ওঁ তৎসৎ, অবিরাবির্ম এধি" বলিতে বলিতে তাঁর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। তিনি বলেন, পথ দেখাও প্রভু, অন্ধকারে হাত ধরে নিয়ে চল। মহেশ্বর তখন মনে মনে বলে, পথ দেখাও প্রভু।

ত্রিগুণার বাড়ীতে নিত্য উপাসনা হয়। মহেশ্বর তা'তে যোগ দেয়। যোগ দিতে ভাল লাগে। সে উপলব্ধি করে যে, দিনে অন্ততঃ একবারও স্রষ্টার নাম স্মরণ করা মানুষের পক্ষে একান্ত দরকার। প্রার্থনার পর তার মনের অবস্থা হয় শিশির-সিক্ত তাজা দূর্বার মত। চলার পথে সে নব নব প্রেরণা পায়। তার অপর আকর্ষণ রামকৃষ্ণ মঠ।

চেঙ্গিজ, এ্যাটিলা, তৈমুর প্রভৃতি এশিয়ার বীরগণ তরবারি দ্বারা যত বার না পশ্চিম জয় করিয়াছেন।তার চেয়ে বেশী বার জয় করিয়াছেন তার বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদের দল। এই বিজয়ীদের শেষ বীর স্বামী বিবেকানন্দ। পৌরুষ ও তেজস্বীতার অগ্নিগর্ভ দৃপ্ত মূর্তি। এই মহাপুরুষের গম্ভীর কণ্ঠের ওঙ্কার ধ্বনি তখন সিকাগো ও ফিলাডেলফিয়ার আকাশে বাতাসে যেন ধ্বনিত হইতেছে। সিংহল হইতে আলমোড়া, করাচী

হইতে আসাম সারা ভারতবর্ষের আত্মবিস্মৃত নরনারীকে তিনি বলেন "আত্মানং বিদ্ধি।"

তিনি নাই কিন্তু আছেন মিশনের মহারাজের দল। তাঁদের দেখিলে মাথা নত হইয়া আসে। তাঁদের উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চোখ, গৈরিক বসন দেখিলে মনে হয় ইঁহারা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাধনার বর্তিবাহী। এঁরা তাঁদেরই বংশধর যাঁদের চরণ তলে জ্ঞান আহরণের জন্য ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইসিংএর দল হিমালয়ের প্রচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নালান্দা ও তক্ষশীলায় সমবেত হইতেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ঝড় ও ঝঞ্ঝা সেখানেই এই গৈরিক-ধারিদের দল। মৃত্যু যেখানে রোগীর শিয়রে, সেখানেই এদের অভয় বাণী—

"ভয় নাই ওরে ভয় নাই
ওরে কিছু নাই তোর ভাবনা।"

ব্রাহ্ম আচার্যদের উপাসনা যেমন মহেশ্বরকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনই প্রেরণা যোগায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী। সকল আলোই তরুণ মহেশকে পথ দেখায়, বিভিন্ন আদর্শ তাকে প্রভাবিত করে। যাহা কিছু সুন্দর তাহাই মনে ছাপ রাখিয়া যায়। সমস্ত ধর্ম ও মতবাদই বলে, তুই আমার, আমি তোর।

তরুণ মনের এই ধর্ম তাকে বাতাসে আন্দোলিত বেতসলতার মতন ইতস্ততঃ চালিত করিতেছিল ঠিক এই সময় নূতন এক বন্ধু জুটিল, গৌতমশঙ্কর মজুমদার। একদিন বাড়ীর নেপালী চাকর এই যুবককে মহেশ্বরের ঘরের দরজায় পৌছাইয়া দিয়া কহিল, মহিষ বাবু আছে।

তরুণটি দীর্ঘাকৃতি, শ্যামবর্ণ, মুখে গুটি কয়েক ব্রণ; দুই একটি শুকাইয়া কালো হইয়া গিয়াছে। চেহারা আর পাঁচজন বাঙ্গালী তরুণের

মতন। তবে মুখে একটা লাবণ্য আছে, দেখিলেই ভাল লাগে। সে ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, আমার সঙ্গে দেখা করতে যাওনি যে? আশা করেছিলাম যাবে। আমার নাম গৌতমশঙ্কর।

তার পরিচয় করিবার এই অভিনবতায় মহেশ্বর বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গৌতম—গৌতমশঙ্কর নামটা বার দুই মনে মনে আওড়াইয়া বলিল, হ্যাঁ ব্রজরাখাল দা লিখেছিলেন বটে তোমার কথা কিন্তু আজ কাল করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গৌতম হাসিয়া বলিল, এবং সেকথা প্রায় ভুলেই গিছলে।

ব্রজরাখাল মহেশকে লিখিয়াছিল, এখানকার একটি ছেলে, কলিকাতায় যাইয়া থার্ড ইয়ারে ভর্তি হইয়াছে। নাম, গৌতমশঙ্কর। আলাপ করিও, দেখিবে খাঁটি সোনা। মহেশ্বরের কৌতূহল ছিল বটে, কিন্তু গৌতম পড়ে অন্য কলেজে, থাকে হষ্টেলে। গায়ে পড়িয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে যাইবার মতন উৎসাহ মহেশ্বর কখনও অনুভব করে নাই।

গৌতম বলিল, মধ্যে মধ্যে যেও আমাদের ওখানে। মহেশ্বর বলিল, হ্যাঁ যাব।

আমার আসার চেয়ে তোমার যাওয়াই সুবিধে। সেটা হষ্টেল আর এটা বাড়ী। হষ্টেলে বেশ freely মেলা মেশা যায়। আর বাড়ীতে শত হলেও একটু বাধ বাধ ঠেকে।

মহেশ্বর কহিল, হষ্টেলের অভিজ্ঞতা আমার নেই।

গৌতম বলিল, যাদের বাড়ী আছে তাদের সে অভিজ্ঞতা থাকবে কোত্থেকে?

মহেশ্বর উত্তর করিল, বাড়ী আমার নয়। কোন হষ্টেলে স্থান না হওয়ায় বাবার এক বন্ধু আশ্রয় দিয়েছেন।

কেন? টিকটিকি পিছু নিয়েছে বুঝি?

না ভাই, আমার জাতের জন্য কেউ রাখতে রাজী হল না।

গৌতমের চোখ দুইটা এবার জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, আমি কিছুতেই এ অপমান মেনে নিতাম না। বলতাম, "Cursed be my tribe, if I"—জাতি ভেদের এই কড়াকড়ি মুসলমান যুগে। এটা পরাধীনতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

পরাধীনতার গ্লানির কথা অনেক নেতার মুখে আগেও মহেশ্বর শুনিয়াছে। উহাই তার সহপাঠীদের, সমবয়সীদের আলোচনার প্রধান বিষয়। কিন্তু এতটা আন্তরিকতা পূর্বে সে কখনও দেখে নাই। জাতির গ্লানি গৌতমের সমস্ত দেহমনকে যেন বিষাইয়া দিয়াছে, তার উত্তাপে ভিতরটা ঝলসিয়া গিয়াছে। মুখে পড়িয়াছে সেই বেদনার কালো ছাপ।

একটু পরেই গৌতম অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। এবারকার আলোচনার ধারাই নূতন। ভঙ্গী চটুল। তখন তাকে দেখিলে কে বলিবে যে এই যুবা দেশের কথা ভাবে, ভাবিতে জানে। এর পর বহুদিন মহেশ্বর আর তার মুখে দেশের দুর্গতির সম্বন্ধে কোন কথা শোনে নাই।

সে চলিয়া গেলে মহেশ্বর ভাবিল, তার সৌভাগ্য যে গৌতম নিজে আলাপ করিতে আসিয়াছিল। না হইলে জীবনে মস্ত বড় একটা ফাঁক থাকিয়া যাইত।

পর দিনই সে তার হোষ্টেলে গেল। প্রত্যেকের জন্য একখানা ঘর, তদুপযোগী টেবিল, চেয়ার ও ছোট তক্তাপোশ। দেয়ালে বইয়ের সেল্‌ফ ও কাপড় জামা রাখার ব্রাকেট। বেশ বড় দরজা। বিপরীত দিকে সমান্তরালে একটা জানালা। দরজার উপরে বায়ু চলাচলের জন্য কতগুলি ঘুলঘুলি। গৌতমের ব্রাকেটে দুতিনটি জামা, গেঞ্জি তোয়ালে ও কয়েকখানা কাপড়। সেল্‌ফে কলেজ পাঠ্য বই একখানিও নাই—আছে বিবেকানন্দের পত্রাবলী, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, আনন্দমঠ,

গীতা ও স্পিনোজার একখানা দর্শনের বই। দেওয়ালে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের ছবি, অর্জ্জুনকে তিনি বলিতেছেন,

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।"

মহেশ্বর বলিল, পড়াশুনো করার পক্ষে ঘরগুলো ভাল, বেশ নিরিবিলি।

গৌতম উত্তর করিল, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেবার পক্ষেও ফাষ্ট ক্লাশ।

মহেশ্বর বলিল, তোমার পড়ার বই দেখছি না যে?

এখনও কিনিনি। এই ত' সবে থার্ড ইয়ার।

গৌতম এন্ট্রেন্স ও এফ এ তে বৃত্তি পাইয়াছে অথচ পাঠ্য বই এখনও কেনে নাই দেখিয়া মহেশ্বর বিস্মিত হইল।

উভয়ের মধ্যে অল্পেই বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মহেশ্বর প্রথমে সপ্তাহে দু' একদিন যাইত। শেষে রোজ যাইতে আরম্ভ করিল। যায় কলেজের পর, দেরি করিয়া গেলে দেখা হয় না, গৌতম বাহির হইয়া যায়। হষ্টেলে টিফিনের বরাদ্দ ছয়খানা লুচি। দুই বন্ধুতে ভাগাভাগি করিয়া খাইরা প্রায় দিনই আবার রেস্তোরায় যাইয়া বসে। তারপর খানিকক্ষণ বেড়ায়, গল্প হয় নানা রকম। গৌতম প্রায়ই রঙ্গমঞ্চের গল্প বলে। বলে, গিরিশচন্দ্র, অমৃত মিত্র, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ির অভিনয় নৈপুণ্যের কথা।

মহেশ্বর ব্রাহ্ম বাড়ীতে থাকে। থিয়েটার যাওয়া তার নিষেধ, থিয়েটারের আলোচনা করাও অপরাধ। সে হাঁ করিয়া এই সব শোনে আর ভাবে, রাজযোগ, ভক্তিযোগ লইয়া যার কারবার, ষ্টেজের এত খবর সে পায় কেমন করিয়া?

খেলা-ধূলা তখনও খুব জনপ্রিয় হয় নাই কিন্তু গৌতম সে সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ। প্রিন্স রঞ্জির কথা বলিতে সে গর্ব বোধ করে। জানে, কবে কোথায় তিনি চমকপ্রদ ব্যাটিং করিয়াছেন।

খানিকটা বেড়াইবার পর গৌতম রোজই বন্ধুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করে, বলে, চল্লুম ভাই। কোথায় যে সে যায় মহেশ্বর সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না। প্রশ্নও করে না। তার বিশ্বাস প্রশ্ন করিলে উত্তর মিলিবে না। সে ভাবে, এমন কি তার আকর্ষণ যে রোজই সেখানে যাইতে হইবে। সে আকর্ষণ তার উপর টানের চেয়ে নিশ্চয়ই বড়। ভাবিয়া মহেশ্বর ক্ষুণ্ণ হয়।

গ্রীষ্মের ছুটির ক'দিন আগে গৌতম বলিল, চল এবার তোমাদের দেশে বেড়িয়ে আসি। শুনেছি নেপালপুরের চড়ক নাকি একটা দেখবার মতন জিনিস।

মহেশ্বর বলিল, হ্যাঁ, বাণ বঁড়শী ফোঁড়া আর কোথায়ও নেই। শুধু আমাদের ওখানেই আছে।

বন্ধুর প্রস্তাবে তার খুব আনন্দ হইল। অন্ততঃ কয়টা দিন সব সময় তার সঙ্গে একত্র থাকিতে পারিবে, তার চেয়ে বড় আকর্ষণ গৌতমের আর কিছুই থাকিবে না। একটা গ্রামোফোন কিনিয়া লইয়া গৌতমের সঙ্গে মহেশ্বর একদিন রওনা হইল।

ভোরের আকাশ সবে অরুণ হইয়া উঠিয়াছে। ভৈরব নদের দক্ষিণে খুলনা শহরের রাত্রির জড়তা তখনও কাটে নাই। দেবদারু ও নারিকেল গাছের ডগায় ডগায় আলো আঁধারের কোলাকুলি চলিতেছে। একটু পরেই আলোর জয় হইল। সূর্যের কিরণ নদীর বুকে ঝলমল করিতে লাগিল; জলের উপর শুরু হইল গাং চিলের মাতামাতি।

নদীর কত বাঁক ঘুরিয়া, ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটিয়া, পিছনে সাদা ফেনার দুইটা রেখা টানিয়া, দুই কূলে তরঙ্গের আঘাত করিতে করিতে চলিয়াছে আই, জি, এন, কোম্পানির ষ্টীমার প্লোভার। প্লোভার মাঝে মাঝে হুইশল দেয়, আকাশে ধোঁয়ার একটা দীর্ঘ পুচ্ছ টানিয়া চলে। মনে হয় কোন বিরহিনী এই পাতলা মেঘের টুকরাকে দয়িতের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে।

ষ্টীমার এক একটা ষ্টেশনে থামে, ঝন্ ঝন্ করিয়া নোঙরের শিকল নামার শব্দ হয়। জাহাজটা কাঁপিতে থাকে।

দুধ কলা শশা ফুটি এই সব বেসাতি লইয়া তীরে আসিয়া ভিড় করিয়াছে বাল-বৃদ্ধযুবার দল। যাত্রীদের কাছে বেচিবে।

কেহ নামে, কেহ ওঠে। খালাসীরা বস্তা তোলে। পারের গাছের সঙ্গে বাঁধা কাছি ও তার খুলিয়া দেয়। স্টোভার আবার হুইশল দেয়, বলে, বিদায়। যাদের বেসাতি বিক্রয় হয় নাই তারা করুণ দৃষ্টিতে যাত্রীদের দিকে চাহিয়া থাকে।

কোথায়ও দিগন্ত প্রসারী মাঠ, কোথায়ও নদীর উপরেই গ্রাম। গ্রাম প্রান্তের একটা বড় বটগাছের কতকগুলি শিকড় কাঁকড়ায় দাঁড়ার মতন জলের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। উপরের শিকড়গুলি কুস্তিগিরের মতন মাটি কামড়াইয়া ধরিয়াছে। গাছটাকে কোন রকমেই তারা পড়িতে দিবে না। জীবন মৃত্যুর এ যুদ্ধ বড় করুণ। দেখিলেই বোঝা যায়, দুই চারি দিনেই গাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। জয় হইবে মহাকালের।

ঐ বটগাছের নীচেই শুরু হইয়াছে গ্রামের পথ। কারও ঘরের পিছন দিয়া, কারও ঢেঁকিশাল বাঁয়ে রাখিয়া পথটি ঝোপ ঝাড়ে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

জাহাজের ঢেউগুলি স্নানরতা গ্রাম-বধূর উন্নত যৌবনের উপর আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। তরঙ্গের এ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে তরুণীর কী আনন্দ!

তরুণরা পার হইতে জলে ঝাঁপ দেয়, উলঙ্গ শিশুরা ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করে। কখনও ঢেউয়ের আগে আগে তীরের বালুর উপর দিয়া ছুটিয়া যায়। শুরু হয় তাদের কলহাস্য। ঢেউয়ের ফেনার চেয়েও শুভ্র সে হাসি; কী মধুর, কী পবিত্র!

গরুর পাল সাঁতার কাটিয়া নদী পার হয়, জলের উপর শুধু দেখা যায় এক ঝাঁক শিং আর দু একটা ষাঁড়ের ককুদ। ছোট ছোট নৌকাগুলি যেন এক একটা পানকৌড়ি। একবার ঢেউয়ের মধ্যে ডোবে, আবার ভাসিয়া ওঠে। সাদা পাল তোলা বড় নৌকাগুলিকে দূর হইতে বকের পাতির মতন দেখায়। দুই বন্ধু চোখ মেলিয়া দেখে বাংলার নিজস্ব এই রূপ। প্রকৃতি এখানে যেমনি উদার তেমনি স্নিগ্ধ, যেমন উন্মুক্ত তেমনি মধুর।

বেলা বারটায় ষ্টীমার পাটগতিতে পৌছিল। এখান হইতে নৌকায় মঞ্জরী যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে নৌকা আসিয়াছে। মাঝি গ্রামেরই কুটিরাম। রাজেশ্বরের বাড়ীতে সে কাজ করে। বাড়ী হইতে মহেশ্বরের জন্য আসিয়াছে ভাত ডাল ও মাছের ঝোল, গৌতমের জন্য চিঁড়া দুধ ও দইয়ের ফলার। গৌতম বলিল, ব্যবস্থা দু রকমের কেন?

কুটিরাম উত্তর করিল, আপনে ভদ্দর নোক তাই মণ্ডল মশায় আপনার জন্য পাঠাইছে চিঁড়া। আপনে তো আর আমারগো ছোঁয়া খাবা না।

গৌতম কুটিরামের জন্য কিছু রাখিয়া বাকী সব খাবার দুই পালায় ভাগ করিয়া লইল। মহেশ্বর ব্রাহ্ম বাড়ীতে থাকে, ছোঁয়াছুয়ির বাচ-বিচার আর করে না। তবু বলিল, শেষটায় আমাদের রান্না খাবে?

গৌতম উত্তর করিল, রেস্তোরাঁয় কিছু খড়দার গোঁসাইরা রান্না করে দেয় না।

মধুমতীর একটা মাত্র বাঁক যাইতে হয়। তারপরই ছোট নদী, এ অঞ্চলে বলে গাঙ। গাঙের দুইটা বাঁকের জল দেখিতে মধুমতীর জলেরই মতন ঘোলাটে সাদা। ডুমুরিয়ার হাটের নীচে আসিয়া রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল, জল সুন্দরীর চোখের তারার মতন মসীকৃষ্ণ।

মহেশ্বর বলিল, দেখেছ জলের যুগল রূপ—যেন রাধাকৃষ্ণ। গৌতম বলিল, চাঁদপুরের নীচে পদ্মা মেঘনাও ঠিক এই রকম যেন দুইটা বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক, পূব ও পশ্চিমের।

গৌতম প্রায়ই প্রশ্ন করে, বাঁয়ের এ নদীটা কোথায় গিয়ে মিশেছে, ঐ খালটা কোন দিকে গেল। ডাইনে ও গাঁয়ের নাম কি? সকল প্রশ্নের জবাব মহেশ্বর দিতে পারে না। কুটিরামও নয়।

ষ্টীমারের মধ্যে হইতে বড় নদীর পল্লীশ্রী ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মমত্ব বোধ জন্মে নাই। নৌকায় উঠিয়া গাঙের দু ধারের ধানের খেত, গাছ পালা টিনের চালা ও গোলাঘর সবই কেমন আপনার বলিয়া মনে হইল। পরিচিত নয়, অথচ যেন একান্তই নিজের। জেলে নৌকায় দাঁড়াইয়া জাল বায়, কৃষক জমিতে কাজ করে, ঘাটে যে কালো বৌটি স্নান করে, খালুই করিয়া মাছ ধোয় ঐ মেয়েটি—সবাই ওরা আপনার ভাই বোন। শুধু মহেশ নয়, গৌতমশঙ্করও এদের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ অনুভব করে। মহেশ্বরের পরিচিত দু একখানা নৌকা দেখা যায়। আরোহীরা চীৎকার করিয়া কুশল প্রশ্ন করে। জিজ্ঞাসা করে কলিকাতার খবর। বলে, তুমি হইলা একটা রতন, তোমারে দেইখ্যা বড় খুশি হইলাম। বাপের থাও তুমি নামী হবা।

আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ তাদের এই সম্ভাষণ গৌতম ও মহেশ দুজনেরই বড় ভাল লাগে। মঞ্জরীর কালু দাশ ও ভুবন বাড়ৈ আসিয়াছে গাঙে কাছিম কোপাইতে। ভুবন নৌকা বায়, কালু ক্যাঁচা হাতে গলুইয়ে দাঁড়াইয়া। প্রশ্ন করিবার কেন, এদিক ওদিক চাহিবারও তার সময় নাই। সে এক দৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া আছে, কাছিম জলের উপর শুঁড় তুলিলেই ক্যাঁচা ছুঁড়িবে।

ভুবন ডাকিয়া বলে, সমাচার সব কুশল ত'?

মঞ্জরী তখনও বেশ দূরে। পশ্চিম দিকে এক টুকরা কালো মেঘ দেখিতে দেখিতে আকাশের অর্ধেকটা ছাইয়া ফেলিল।

ওরে গাজীরে গাজী—বলিয়া কুটিরাম পুব পারে নৌকা লাগাইল। দুই গলুইর দুইদিকে চারটা লগি পুঁতিয়া নৌকা ভাল করিয়া বাঁধিবার আগেই বাতাস ছাড়িল। ঝড় শুরু হইয়া গেল। সে কী ঝড়! ঘর বাড়ী গাছপালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেন চেঙ্গিজ খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল ছুটিয়া আসিতেছে। মেঘের উপর দিয়া মেঘ ছুটিয়া যায়। প্রতিটি দমকা হাওয়ায় ছই মড় মড় করিয়া ওঠে, মনে হয় এখনই উড়িয়া যাইবে। বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ছইয়ের দরমা বিঁধিতে থাকে। সাপের ফণার মতন ক্রুদ্ধ ঢেউগুলি পাড়ের উপব আছাড় খায়।

পাড়ে ধাক্কা লাগিলে নৌকা ভাঙ্গিয়া যাইবে, লগির বাঁধ ছুটিলে মাঝ নদীতে ডুবিয়া যাওয়া সুনিশ্চিত। কুটিরাম পাকা মাঝি—তাই লগি পুঁতিয়াছে চারটা। তবুও আজকের এ ঝড়ে কি যে হয় বলা যায় না। বদর বদর, গাজী গাজী করিতে করিতে সে একবার সামনের গলুইয়ে যায়, আবার যায় পিছনে। দেখে তার লগিগুলি ঠিক আছে কি না। সে মহেশ্বরকে বলে, তুমি ভাই বড় লোকের ছাওয়াল, উনিও ভদ্দর লোক, বিরাট মনিষ্যি,, ভয় তোমার গো জন্য। আমার জানের আমি পরোয়া করি না।

মহেশ্বর উত্তর করিল, কেন তোমার বউ আছে, ছেলে মেয়ে আছে, তোমার বেঁচে থাকা তো আরও দরকার।

কুটিরাম কহিল, তারগো দেখবে রাজু মণ্ডল। তার কাজে আসিয়া প্রাণ হারাইলে ছাওয়াল বৌর ভাবনা আর ভাবতে হবে না।

বন্ধুর পিতার উপর একটি সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস দেখিয়া গৌতমশঙ্কর আনন্দিত হইল। তারা দুজনে কুটিরামের জন্য অতি কষ্টে

এক কলিকা তামাক সাজিয়াছিল। গৌতম কহিল, তুমি বড় ভিজে গেছ ভাই, দুটো টান দিয়ে নাও।

কুটিরাম কহিল, আপনারা মানুষ খুন করতে পার, মশয়। আপনারা সাজবা তামুক, তাই টানব আমি!

গৌতম বলিল, কেন তাতে দোষ কি? তুমি হয়রান হয়ে পড়েছ।

আপনারা হৈলা বড়লোক আর আমি হৈলাম বিলের ক্যাদা। আপনারা প্রকাণ্ড কচ্ছপ, আমি চুনাপুঁটি।

শেষটায় গৌতম একটা ধমক দিলে সে কলিকাটা হাতে তুলিয়া হাতের তালুতে লইয়া টানিতে টানিতে গ্রামের গল্প বলিতে শুরু করিল, প্রধানতঃ সেটেলমেণ্টের গল্প। কে কাহাকে ঠকাইতেছে, কোন পদস্থ ব্যক্তি কতটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে—ইহার একটা লম্বা ফিরিস্তি।

সাহেবগো ধলা চামড়ার কী তেজ! শ্যামচন্দর ভুঁইয়া স্থাশের রাজা, তানার ছাওয়াল বিপিন ভুঁইয়া তালুকদারে তালুকদার, হাকিমে হাকিম। নলতি ভুঁইয়ার আটচালায় সিটিলমিণ্টের সাহেব বিপিন ভুঁইয়ারে এই মারে তো সেই মারে। বুক পর্যন্ত লাঠি উঁচাইয়া কয়, ড্যাম ভুঁইয়া। বিপিন ভুঁইয়া কালা আদমী, আমাব তোমারই মতন। তিনি আর কি করবে? তিনি কইতে লাগলো, তুমি আমার পিতা মাতা সাইব, এবার ক্ষ্যামা কব।

গৌতুমের মুখ দিয়া শুধু বাহির হয়, Wretch.

সে ও মহেশ্বর তারপর অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারে না। কুটিরাম গ্রামোফোনের মত বলিয়াই চলে, খাতির বাড়ছে তোমার বাবার। হাকিমরা বোঝছে রাজু মল্লিক হাচা বৈ মিছা কয় না। তানার কথা বড় মান্য করে। সাইব কয়, আদমী ত' ঐ একটা।

ঝড় থামিয়া গেল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। পশ্চিম আকাশে বর্ষণ-ক্ষীণ মেঘের উপরে ও নীচে গাঢ় অরুণ রেখা জ্বলজ্বল করে। মনে হয় আকাশ জোড়া বিরাট একখণ্ড কাপড়ে কে যেন সিঁদুরের পাড়

বসাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির রূপ সদ্য শোকাতুরা বিধবার মতন। কান্না সবে শেষ হইয়াছে কিন্তু চোখের পাতার জল শুকায় নাই। এই স্নিগ্ধ করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়া মহেশ্বরের নৌকা মঞ্জরীর দিকে চলিতে থাকে। কৃত্তিবাস গান ধরে—

ও মোর মন মাঝিরে মন মাঝি
তোর এ কোন খেলা
করিস এ কি কারসাজি ?
কভু কাঁদাস্, কভু হাসাস্
খেলাস কত ডিগবাজি।

রাজেশ্বর বাড়ীতেই ছিল। গৌতমের হাত মুখ ধোয়া হইলে তাকে কহিল, তোমার থাকার জায়গা করেছি শ্রীনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে। তিনি বৈদিক বামুন।

গৌতম বলিল, না কাকাবাবু আমি এখানেই থাকবো।

তা কি হয় বাবা, তোমাকে আমাদের ছোঁয়া খাওয়াব ?

গৌতম হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, আমি ওসব কিছুই মানি না, আমার পৈতে পর্যন্ত নেই।

রাজেশ্বর বলিল, কিন্তু আমার তো ভয় আছে।

গৌতম শ্রীনাথের বাড়ী গেল না, একটু পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তার খাবার দিয়া গেল। জলযোগান্তে তারকেশ্বরদের তিন ভাইকে ডাকিয়া তারা গ্রামোফোন বাজাইতে আরম্ভ করিল। গান শুনিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। টগর আসিল, আসিল কুঞ্জসখী, নৃত্যকালী, বৃন্দাবন—ছেলে বুড়ো সবাই।

এ কী ব্যাপার! কল ঘুরাইয়া দিলেই বাক্সের ভিতরে গান হয়, যাত্রা হয়। বাক্স কথা বলে। এমনটি কখনও তারা দেখে নাই, শোনেও নাই। কলিকাতার সবই কী এমন তাজ্জব !

একজন বলিল, ওরে ভাই, কলকাতায় গরু ঘোড়া ছাড়াও গাড়ি চলে। বাতি জ্বালাইতে তেল লাগে না। দিয়াশলাই না হইলেও চলে। বোতাম টেপো আর ধবধব।

ছেলেদের কলহাস্য, বয়স্কদের সমালোচনা এবং লোকের ভিড়ে রাত বারটা পর্যন্ত বাড়ীটা গম্‌গম করিতে লাগিল। উৎসাহ বৃন্দাবনেরই সব চেয়ে বেশী। বিস্ময়ও সমধিক। সে মধ্যে এক একবার চীৎকার করিয়া ওঠে, আরে আমার সুখরে—ওরে আমার কল, কলকাতার কল!

জবা চাপা গলায় বলে, চুপ কর।

বৃন্দাবন উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি চুপ কর। এ তুমি বোঝবা না মাথারি।

জবা উত্তর করে, বুঝব না কেন? আমার মহেশ এনেছে আর আমি বুঝব না?

সত্যই, এই দুইজনের আনন্দ অপরের উপলব্ধির অতীত। একজনের কাছে রাজু ভাইর ছেলে, আর একজনের কাছে সে আমার মহেশ। সেই মহেশ কলিকাতা হইতে আজব কল আনিয়াছে। সেই কল কথা কয়, গান গায়।

মহেশ ও গৌতম দুই বন্ধুতে দুপুরে ও রাত্রে পাড়ার ছেলে বুড়োদের কলের গান শোনায়। সকাল বিকাল বেড়াইতে বাহির হয়। মহেশ্বর গৌতমকে ঘাঘরের মেলায় লইয়া গেল, সিদ্ধান্তখোলার চড়ক দেখাইল। চড়ক সন্ন্যাসীদের পরনে ছোপানো গেরুয়া, গলায় কাচা। মহাদেবের নামে একমাস সন্ন্যাস করিয়া সংক্রান্তির দিন কেহ পিঠে একটা, দুটা, কেহ বা চারটা পর্যন্ত বঁড়শি ফুঁড়িয়াছে। গামছা দিয়া পিঠ—মোড়া করিয়া বাঁধিয়া তাদের চড়ক গাছে ঘুরানো হইতেছে। গাছ বোঁ বোঁ করিয়া ঘোরে, শূন্যে তিরিশ চল্লিশ হাত উপর হইতে তারা মধ্যে মধ্যে বলিয়া ওঠে, বম্ মহাদেব।

আর একদল জিহ্বায় বাণ ফুঁড়িয়াছে। বিশ পঞ্চাশ হাত লম্বা এক একটা লোহার শলা একদিক দিয়া ফুঁড়িয়াছে, বাহির করিয়াছে বিপরীত দিক দিয়া। এই বাণ দুই ধার হইতে দুইজন লোক ধরিয়া থাকে, সন্ন্যাসী ঘুরিয়া বেড়ায়। চড়ক সন্ন্যাসীদের মুখে কোন যাতনার ছাপ নাই। কোন একটা কামনা করিয়া তারা বাণ ও বঁড়শি মানত করে। কেহ বা সন্ন্যাস লয় শুধু মহাদেবের প্রীত্যর্থে।

গৌতম একদিন গৈলার পথ ধরিয়া ঘাঘর হইতে পাঁচ সাত মাইল দূরে গেল, দেখিল পশ্চিম পাড়ের কালীমন্দির, গচাপাড়ার মনসাবাড়ী, গয়সার হাট। আর একদিন গেল কাজুলিয়ার দিকে। নৌকা করিয়া গেল বাধাগঞ্জ। মহেশ একটি বৈশ্য সাহার বাড়ী দেখাইয়া বলিল, এর একটা ঘর শুধু বন্ধকী সোনায় বোঝাই। সারারাত ঐ ঘরে প্রদীপ জ্বলে। সোনার দেবতা নাকি তাতে খুশি হন।

একদিন তারা হাই স্কুলে গেল। হেড মাষ্টার বলিলেন, একটা ক্লাশ নিতে পার মহেশ, ললিত বাবু আজ আসেন নি।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর হইতে মহেশকে মধ্যে মধ্যে এরূপ ক্লাস নিতে হয়। কখনও কোন শিক্ষক তাকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠান। কখনও প্রধান শিক্ষক খবর দেন। গৌতমের পরিচয় শুনিয়া তিনি তাকেও একটা ক্লাশে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, মহেশের বন্ধু তুমি, তোমার উপরও আমাদের একটা দাবি আছে।

মহেশ মনোযোগ দিয়া পড়াইল। গৌতম ছেলেদের কাছে বৌদ্ধ জাতকের একটা গল্প বলিল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পরগনার সম্বন্ধে গৌতমের একটা চলন সই ধারণা জন্মিল। কোন্ পথ কোথায় গিয়াছে, কোন্ ডাঙ্গা কোন্ খালে যাইয়া মিশিয়াছে, দেশের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী কাহারা, এই ধরনের অনেক খবরই সে সংগ্রহ করিল। ছিল অল্প কয়েকদিন, কিন্তু

এরই মধ্যে প্রত্যেকের মনে সে একটা ছাপ রাখিয়া গেল। জোর করিয়া জবার রান্না খাইল। খাইয়া বলিল, খাসা রেঁধেছেন মাসীমা। বৃন্দাবনকে একটা ভাল গেঞ্জি আর একখানা রঙিন সাবান কিনিয়া দিল।

টগরের গল্প আগেই মহেশের কাছে শুনিয়াছিল। তার ইচ্ছা টগরের পূজা দেখে। টগর বলে, আমার পুজোয় দেখবার কিছু নেই গৌতম, না আছে মন্তর, না আছে কোন নিয়ম কানুন। শুধু বাতাসা ও শশার পুজো।

গৌতম উত্তর করে, ভগবানকে ঘুষ দেওয়া আমি পছন্দ করি না, জোর করে আদায় করতে চাই। তবে শশা বাতাসা আম সন্দেশের বেলায় আমার নিয়ম স্বতন্ত্র।

একদিন সে সত্য সত্যই আম সন্দেশ ও দুধ আনিয়া টগরের হাতে দিয়া বলে, বড়মা, আজ তোমার ঠাকুরকে পায়েস ও সন্দেশেব ভোগ দাও। আমরা প্রসাদ পাব।

সে সকলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশে বটে কিন্তু রাজেশ্বরকে এড়াইয়া চলে। তার কাছে যাইতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। মহেশকে বলে, আমি বড় কারো একটা পরোয়া করি না ভাই, কিন্তু তোমার বাবার কাছে গেলেই কেমন সব গুলিয়ে যায়। উনি সত্যিকার মহৎ কিনা। ছেলেবেলা থেকেই আমি মা-বাপ হারা, মনে হয় আমার বাবা থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই এতটা মহৎ হতেন।

গৌতমশঙ্কর যাওয়ার পর মহেশ্বরের দু' চারদিন কিছুই ভাল লাগিল না। প্রায়ই মনে হইত তার কথা। বাড়ীতে সঙ্গীর অভাব এর আগে এমন করিয়া কখনও অনুভব করে নাই। সংসার তাদের বড় ও বর্ধিষ্ণু, সর্বদাই কর্ম-চাঞ্চল্য। বাহিরের লোক খাটে কুড়ি পঁচিশ জন। এই ব্যস্ততার মধ্যে মহেশ্বর যেন হাঁপাইয়া ওঠে। তার মনে হয়, মা থাকিলে হয়ত এমনটি হইত না। ছিল একটি

বোন, তারই পিঠাপিঠি। সেও আর আসে না; আসিবার তার উপায় নাই। নারীর অভাবেই হয়ত সংসারটা এমন রুক্ষ কর্কশ মনে হয়।

তার পর বাবার কথা, তাঁকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, মনে করে।সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা বরাবরই কম হয়— এবার আরও কম। কাজে তিনি অসম্ভব রকম ব্যস্ত। কারবার দিনদিনই বাড়িতেছে। লক্ষ্মী যেন আঁচল ঢালিয়া দিয়াছেন। তার উপর আসিয়াছে সেটেলমেণ্ট। নিজের জমি জমার কাজ আছে, আছে সালিসি মধ্যস্থতা। ভোরে লোক জমিতে আরম্ভ করে, ভিড় থাকে রাত দুপুর পর্যন্ত। ঘরে আর লোক ধরে না। ক্যাম্পে দু'পক্ষের গোলমাল। উভয় পক্ষই আসিয়া বলে, তুমি মিটিয়ে দাও, রাজু।

মামাদের কাছে মহেশ্বর পঞ্চায়েতের কথা শুনিয়াছিল। তার মাতামহের বাটীতে নাকি অসম্ভব ভিড় হইত। লোকে তাঁর কথায় উঠিত বসিত। তাঁকে মানিত গুরুঠাকুরের মতন। এতদিন মহেশ্বরের এসব গল্প বলিয়া মনে হইত। এবার পিতার এই সম্মানে তার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

ফোর্থ ক্লাসে দুই বৎসর এবং থার্ড ক্লাসে দুই বৎসর থাকিয়া তারক পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে। একদিন সে তার বাবাকে বলে, লেখা পড়া আমার হবে না, আমায় একটা কারবার করে দাও। পৃথক্ কারবার।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, পৃথক্ কেন?

আমার কারবারে আর কারও অংশ আছে ভাবলে কাজে আমার কোন উৎসাহ থাকবে না।

রাজেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, আগে কাজ কর্ম শেখো, পরে তা দেখা যাবে।

সেই হইতে তারক হাটখোলার দোকানে বসে। কাজকর্ম শেখে।

মহেশ্বর এবার ছোট দুই ভাইএর পড়া শুনার দিকে নজর দিল। সব চেয়ে ছোট বীরেশ্বর নয় পার হইয়া সবে দশ বৎসরে পড়িয়াছে। বাড়ীতে পাঠশালায় পড়ে। এবার স্কুলে যাইবে। পড়াশুনায় সে খুব ভাল। গুরুমহাশয় অন্নদা সজ্জন বলেন, ও তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে, মহেশ।

অল্প বয়সে মাতৃহীন বলিয়াই হয়ত বীরেশ্বর দুর্বল এবং স্বভাব-ভীরু। কুকুর বিড়ালে তার খুব ভয়। ভয় ছায়ায় আর অপরিচিত শব্দে। রাত্রে সে শোয় দুঃখীরামের মায়ের সঙ্গে। সন্ধ্যার পর হইতেই তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। তার স্তন লইয়া খেলা করে। দুঃখীর মা বলে, ধাড়ী ছাওয়ালের লজ্জা করে না? বীরেশ্বর আব্দার করে, একটা গল্প বল। এক রাজার সাত রাণী। লালরাণী, নীলরাণী, তাদের কথা।

পুকুর পাড়ে পড়িয়া যাওয়ার দিন হইতে বীরু সেই যে দুঃখীর মার কোলে আশ্রয় লইয়াছে, সেই হইতে সে জানে উহাই তার স্নেহের আসন। এক দিনের জন্য সে আর তাকে ছাড়ে নাই, ডাকে আম্মা বলিয়া। দুঃখীর মা আজ ছেলেদের সবার আম্মা। দুঃখী তাদের দাদা ও ভাই। সেও এই বাড়ীতে সামান্য কাজ করে। সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বর তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বীরুর বড় নরেশ্বর। সে গ্রামের হাটখোলায় এডওয়ার্ড স্কুলে পড়ে। এখানে পড়া হয় ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত। ছেলেরা তার পর হাই স্কুলে যায়।

মহেশ্বর একদিন বলিল, তোমার বই আর খাতা নিয়ে এস নরু, দেখি কি পড়ছ। নরেশ্বরের পড়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তার খাতা উল্‌টাইয়া মহেশ্বর দেখিল কতকগুলি কবিতা। সে বলে, এ কি, কবিতা দেখছি যে!

কবিতা লেখা মস্ত অপরাধ—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবং শিক্ষক মহাশয়রা এইরূপ বলেন। সেই কবিতার খাতা শেষটায় কিনা দাদার হাতে

পড়িল। নিজের এই অসতর্কতার জন্ত নরেশ্বরের নিজের উপরই রাগ হইল। সে অপ্রস্তত ভাবে বলিল, ও কিছু নয়, দাদা।

মহেশ্বর বলিল, মন্দ লেখনি ত'। সে আরও কয়েকটি কবিতা পড়িল। ছোট ছোট কবিতা, মোটের উপর ভালই। ছন্দ এবং মিলে কোন ত্রুটি নাই। সে বলিল চেষ্টা কর, তোমার হবে।

এই প্রশংসা নরেশের কল্পনাতীত। সে স্থির করিল, এবার কেহ কবিতা লেখায় নিরুৎসাহ করিলে সে দাদার দোহাই দিবে। দাদা ভাল ছেলে, তার মতামতের মূল্য যথেষ্ট।

তার অধিকাংশ কবিতা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প অবলম্বনে লেখা। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল, এ গল্পগুলো তুমি পেলে কোথায়? রামায়ণ মহাভারত পড়ছ বুঝি?

শুনেছি আম্মার কাছে। আমার চেয়েও বীরু বেশী শুনেছে।

মহেশ্বর বীরুর সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিল সেও অনেক গল্প জানে। সেগুলি শুধু পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীই নয়, তার সঙ্গে আছে সাদা ভালুক ও কাকের লড়াইর গল্প, মাঠের ওপারের রাজকন্তার উপাখ্যান, হলদে শিংওয়ালা নীল গাইয়ের কথা।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, এত গল্প তুমি শিখলে কোথায়, আম্মা? দুঃখীর মা উত্তর করিল, সে কি মনে আছে? শিখছি কিছু যাত্রা কথকতা শুনিয়া, কিছু নিজে বানাইছি।

দুঃখীর মার গল্প বানাইবার ও বলিবার শক্তি সত্যই অসাধারণ। তার মুখে গোটা কয়েক গল্প শুনিয়া মহেশ বলিল, এগুলো লিখে রাখবার মতন জিনিস। তুমি লেখা পড়া শিখলে নাম করা সাহিত্যিক হতে।

দুঃখীর মা বলে, তা হৈলে কি ভাল হৈত বাবা-?

দুঃখীর মা নিরক্ষর কিন্তু যেখানে কথকতা ও কীর্তন হয়, যাত্রা ও রয়ানির (মনসার গানের) বৈঠক বসে সেইখানেই সে আছে।

এ বাড়ীর চাকরি লইবার পূর্বে ইহাই ছিল তার প্রধান কাজ। দু'তিন মাইল দূরে হয়ত যাত্রার আসর বসিবে, কথকতা হইবে; দুঃখীর মা সন্ধ্যার আগে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, নিজের আসন পাকা পোক্ত করিয়া রাখিল। গানের শেষে বাকী রাতটা কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে কাটাইয়া দিল।

কাছাকাছি আত্মীয় বাড়ী না থাকিলে, কোনও বর্ষীয়সীর সঙ্গে ভাব করিয়া লইত। বলিত, বাকী রাতটুকু তোমার পায়ের কাছে প'ড়ে থাকব মা।

ইহা লইয়া ছোট ভাই শরতের সঙ্গে বিরোধ তার কম হয় নাই কিন্তু দুঃখীর মা তা গ্রাহ্য করে নাই। সে বলে, স্বামী দেবতা হারাইছি, ঠাকুর দেবতার নামও যদি না শোনব তা হৈলে এ মানব জন্মই ত' ব্রেথা।

ছুটিটা এবার মহেশ্বর ছোট দুই ভাইর সঙ্গেই কাটাইল। রোজ সে ডাকঘরে যায় না, তাতে পড়ার ক্ষতি হয়। সকালে নিজে কিছু পড়াশুনা করিয়াই ভাইদের লইয়া বসে। কোনদিন পড়ে, কোনদিন দশ-পঁচিশ বা দাড়িয়াবাঁধা খেলে। তারপর যায় খালে স্নান করিতে। সেখানে এপারের আরও পাঁচজন থাকে। ওপারের মুকুন্দ সেন, নগু কাকা, সরকারী নোয়াদা, রাঙাদার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। তারা গল্প করে, সাঁতার কাটে—স্নান করে দুই ঘন্টা ধরিয়া।

এবার স্বদেশী আন্দোলনের তত জোর নাই। ব্রজরাখাল আসে নাই। যারা স্বদেশী সভায় প্রধান উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে পরেশ বাঁড়ুয্যে কলিকাতায় চাকরির চেষ্টায় গিয়াছে। আর অধিকাংশই সেটেলমেন্টের কাজে ব্যস্ত।

পয়লা বৈশাখ নববর্ষের মিছিল বাহির হইয়াছিল। বৈকালে শ্যামাচরণ সেনের বাড়ী সভা বসে। গরম গরম বক্তৃতা হয়। তার পরই সব চুপ।

কলিকাতা হইতে রাজেশ্বরকে দেশী মিলের কাপড় ও মুদিখানার মাল আনাইতে হয়। মঞ্জরীর তাঁতের কাপড়ের খরিদ্দার ও সেখানে অনেক। তার ইচ্ছা কলিকাতায় একটা আড়ত করে। তাহাতে ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। একদিন সে এই সম্বন্ধে মহেশ্বরের মতামত জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ্বর উত্তর করিল, আমি আর কি বলব? তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে মহেশ্বরের এবার খালি মনে হইতে লাগিল নরু ও বীরুর কথা। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল পিতার শান্ত সুন্দর মূর্তি। গৌতমশঙ্করের সঙ্গে কাল দেখা হইবে ভাবিয়াও বাড়ীর জন্য দুঃখটা সে ভুলিতে পারিল না। নৌকায় তবু এক রকম ছিল। স্টীমারে উঠিয়া দেশের সঙ্গে ব্যবধান যত দ্রুত বাড়িতে লাগিল, মনও তত খারাপ হইয়া গেল।

নদীপারে ছেলেদের খেলা করিতে দেখে আর ভাবে বীরু হয়ত এখন আটচালার ধারে কানামাছি খেলিতেছে। নরু এইবার বল লইয়া মাঠের দিকে রওনা হইয়া গেল।

মহেশের মনে পড়ে মঞ্জরীর বিভিন্ন ছবি। কোন্ গাছের ছায়া কখন কোন্ পর্যন্ত আসে, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি কোথায় মাটির বুকে মিশিয়া যায়, অন্ধকার কোন্ পথে হামাগুড়ি দিয়া প্রথম মঞ্জরীতে প্রবেশ করে এ সমস্তই তার নখদর্পণে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নদীর দুই পারে, সামনে ও পিছনে কালো যবনিকা টানিয়া দেয়। সেই তমিস্রা ভেদ করিয়া নদীর বুক চিরিয়া দৈত্যের মতন উষ্ণ নিঃশ্বাস ও বাষ্প উদ্‌গিরণ করিতে করিতে স্টীমার চলে।

অন্ধকারে গ্রামগুলিকে পাতালের ঘুমন্ত পুরীর মতন মনে হয়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ক্ষুদ্র আলোক শিখা—নৌকার আলো, কুটীরের

আলো। কোনও বধূ হয়ত কাঁচের কুপি হাতে করিয়া এ ঘর হইতে ও ঘরে যায়। কলিকাতে আগুন ধরাইবার জন্য কোন নৌকার মাঝি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালে, এই আলো অন্ধকারকে মহেশ্বরের চোখে আরও গভীর রহস্যময় করিয়া তোলে।

বীরু ও নরেশ এখন আম্মার কাছে শুইয়া। আম্মা গল্প বলিয়া চলিয়াছে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প, শিংওয়ালা হাতীর সঙ্গে যুবরাজ সরফরাজের লড়াইএর কথা।

এই সময় মহেশ্বরের দুইধার হইতে কালো কোর্তা পরা চার পাঁচটি লোক চেঁচাইয়া ওঠে—কুলী বাবু, কুলী। খুলনা-ঘাট—কুলী।

মহেশ্বরের মুখ দিয়া বাহির হইল, এঁ্যা, খুলনা?

খুলনা মেল খুব ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিল। রাস্তার গ্যাস সবে মাত্র নিবিয়াছে। একটু আগে কর্পোরেশনের লোক রাস্তায় জল দিয়াছে, এখনও তাহা শুকায় নাই। সে-রকম লোক চলাচলও শুরু হয় নাই। মাঝে মাঝে শুধু দু একটি গঙ্গাস্নায়ীকে দেখা যায়, হাতে কমণ্ডলু ও ভিজা কাপড়, কপালে চন্দনের ফোঁটা। এদের মধ্যে প্রৌঢ়া বিধবার সংখ্যাই বেশী।

একটি গঙ্গাস্নায়ী পশ্চিম দিক হইতে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে আসিতেছিল,

যা সৃষ্টি : স্রষ্টুরাদ্যা—

কণ্ঠস্বর মন্দ নয়, কিন্তু উচ্চারণ অস্পষ্ট, আবৃত্তির ভঙ্গী কুৎসিত, ছন্দজ্ঞান মোটেই নাই। লোকটি কালো, বেশ মোটা সোটা—যাকে বলে নাদুস-নুদুস গড়ন, গায়ে নামাবলী, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক। তার আবৃত্তি মহেশের কানে বড় বাজিল। তার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া তাকে বলে, থামুন মশাই, অমন করে আর কালিদাসের শ্রাদ্ধ করবেন না।

একটা অর্ধ-উলঙ্গ উন্মাদ হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের মর্মর মূর্তির কাছে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিল। মহেশ্বরকে দেখিয়া বলিল, চাকরি করবে ছোকরা? ম্যাজিস্ট্রেট হবে, না বাঙাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান! আমি জুটোই দিতে পারি। ওঃ—বাবু জবাব দেবেন না, যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ আর কি!

নেপালী চাকর দরজা খুলিয়া মহেশ্বরকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া কহিল, মা রোগী দেখনেকে গিয়া, বাবু গিয়া পৈরাগ।

সবিতা লেডী ডাক্তার, ভাল পসার। রাত্রে প্রায়ই ডাক হয়। কোন কোন দিন ফিরিতে বেলা হইয়া যায়।

বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন কেন জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্য বলিল, কেয়া জানে, কোন মতলব।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। মহেশ্বর স্নান করিয়া চা খাইয়া একটু গড়াইয়া লইবে ভাবিতেছে এই সময় ছোট ট্রে হাতে করিয়া একটি অপরিচিত তরুণী তার ঘরে ঢুকিল। ঘরখানা যেন আলোয় ভরিয়া গেল। এমন সুন্দরী মহেশ্বর পূর্বে কখনও দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। বয়স বছর সতর, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ। মৃগচঞ্চল দুটি চোখ, মাথার চুল সিল্কের মত কোমল, ঠোঁট দুখানায় রক্ত যেন ফাটিয়া পড়ে। মেয়েটি কহিল, দিদি জরুরী ডাকে বেরিয়ে গেছেন। সিরিয়স কেস। আপনার অভ্যর্থনার ভার পড়েছে আমার উপর।

মহেশ্বর ব্রাহ্ম বাড়ীতে থাকে, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও করে। কিন্তু এখনও সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে দুই হাত তুলিয়া শুধু ছোট্ট একটি নমস্কার করিল।

সামনের চায়ের কাপ হইতে ধোঁয়ার রেখা কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে ওঠে, মহেশ্বর ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া সসারের উপর চামচের শব্দ করে।

তরুণী হাসিয়া কহিল, চা যে জুড়িয়ে যাবে। শুনেছিলাম আপনি লাজুক কিন্তু এতটা যে সে ধারণা ছিল না।

তার চরিত্রের এই দিকটা এই অপরিচিত মেয়েটিও জানিয়াছে দেখিয়া মহেশ্বর যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। একটু পরে কহিল, আপনার চা?

তরুণী বলিল, চা আমি খাই না।

মহেশ্বর তক্তাপোশের তলা হইতে মুখ বাঁধা তিনটি হাঁড়ি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলে মেয়েটি বলিল, এ কী, সাপ খেলা হবে নাকি?

মহেশ্বর হাসিয়া ফেলিল।

তার বাবা প্রতিবারই ছেলের সঙ্গে ত্রিগুণা ও তার স্ত্রীর জন্ত দুচার রকম দেশী খাবার পাঠায়। তৈরি করার টগরকে দিয়া। তাদের অঞ্চলে এ খাবারগুলির খুব প্রচলন, কিন্তু কলিকাতায় পাওয়া যায় না। ত্রিগুণা এগুলি পছন্দ করে। তাই সে বাড়ী না থাকায় মহেশ্বর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু প্রয়াগ গেছেন কেন?

মেয়েটি বলিল, অল ইণ্ডিয়া ফিলজফিক্যাল কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করতে।

ত্রিগুণা কাকার এই সম্মানে মহেশ্বর বড়ই আনন্দ লাভ করিল।

মেয়েটি হাঁড়ির মুখ খুলিয়া এক একটি খাবার বাহির করে আর জিজ্ঞাসা করে, এটা কি?

নারিকেলের চিঁড়া, ফেণী বাতাসা, নারিকেলের পোলাউ নামগুলি তার কাছে একেবারেই নূতন। কিন্তু সব চেয়ে অভিনব হোগল গুঁড়ির পিঠা। হোগলার ভিতরে একরকম গুঁড়া পাওয়া যায়, তার তৈরি শুনিয়া মেয়েটি বলিল, এও লোকে খায়?

মহেশ্বর বলিল, দেখুন না।

মেয়েটি হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, বাঃ, বেশ গন্ধ ত'!

কিন্তু শুধু হোগল গুঁড়ির সন্দেশ নয় মহেশ্বর চালতার পিঠাও আনিয়াছিল। দুটা পিরিচে সব খাবারই কিছু কিছু তুলিয়া লইয়া তরুণী মহেশ্বরের জন্ত আর এক কাপ গরম চা আনিল, নিজের জন্ত আনিল এক বাটি দুধ।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, চালতের পিঠেও দুধের সঙ্গে খেতে হবে না কি?

তরুণী কহিল, এবার আমায় ঠকিয়েছেন দেখছি।

প্রথম কাপটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় কাপে মহেশ্বরের ভারী তৃপ্তি হইল। মেয়েটি বলিল, আপনি আমায় একটা ধন্যবাদও দিলেন না। একবারও বললেন না, থ্যাঙ্কস্।

মহেশ্বর বলিল, মনে মনে বলেছি।

বেশ, তার জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

চা খাইতে খাইতেই অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। মেয়েটি আত্মপরিচয় দিল, তারা বিদেশে মানুষ, দুই পুরুষ ইউ, পিতে। তাই বাংলার পল্লীর খবর কিছুই জানে না। এ দেশের রীতিনীতি, খাবার দাবার সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ। সে উৎসাহের সহিত পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের খবর জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ্বর কহিল, আমাদের অঞ্চলটা প্রায় সব সময়েই জলে ডোবা থাকে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, জোঁক নাকি কিলবিল করে?

ভাল কিছুই শোনেন নি দেখছি।

তরুণী হাসিয়া বলিল, রাগ করলেন বুঝি? ভালও শুনেছি বৈ কি। আপনাদের দেশে খুব কাছিম পাওয়া যায়। বৃষ্টি হলে কই মাছ ডাঙায় ওঠে।

মহেশ্বর বলিল, ভারী সুন্দর আমাদের দেশ। ভাল কথা, আমি একটা কেনেস্তারায় কিছু কই মাছ এনেছি। এখনই তার জল বদলানো দরকার।

মেয়েটি বলিল, বেশ লোক ত', এমন দরকারী কথাটা ভুলে গিছলেন।

আমি মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশি না কিনা তাই ওরকম হয়ে যায়—বলিয়া ফেলিয়াই মহেশ্বর লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

তরুণী এবার সশব্দে হাসিয়া বলিল, তাহলে মেয়েদের আপনি ভয় করেন ?

এই সময় সবিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি অমলা, ভাল মানুষ পেয়ে বেচারীকে বিব্রত করছিস্ বুঝি ?

অমলা বলিল, বিব্রত ওঁকে করতে হয় না। নিজেই হয়ে পড়েন। দেশ থেকে কই মাছ এনেছেন তাও বলতে মনে ছিল না। বড় বড় স্কলারদের বোধ হয় এই রকমই হয়।

সবিতা বলিল, যা আর ফাজলামি করতে হবে না কিছু মাছ বার করে কুটতে দে। মহেশ মাছ-পাতুরি বড় পছন্দ করে।

অমলা মহেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, পশ্চিমের মেয়ে হলেও মাছ-পাতুরি আমি জানি।

সবিতা বলিল, বেশ তুইই রাঁধিস্।

মহেশ্বর ধীরে ধীরে বলিল, কই মাছ জল বদলে রাখলে অনেকদিন থাকে। সরপুরিয়া আর পাতক্ষীর বাদে আর খাবারগুলোও তিন চারদিনে নষ্ট হয় না।

অমলা বলিল, দেখলে দিদি, দাদাবাবুর জন্য মাছ ও খাবার রাখতে ওঁর ইচ্ছে কিন্তু তাও মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

অমলা বাহির হইয়া যাওয়ার সময় তার শাড়ীর লাল পাড়টা মহেশের চোখের উপর জল জল করিতে লাগিল। দরজা পর্যন্ত যাইয়াই সে ফিরিয়া দেখিল মহেশ্বর তার দিকে চাহিয়া আছে। সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মহেশের মনে হইল, এমন সুন্দর হাসি জীবনে কখনও দেখে নাই।

সে বৈকালে হোষ্টেলে গিয়া শুনিল, গত সপ্তাহে গৌতম কলিকাতায় ফিরিয়াছে। কিন্তু আজ দুই তিন দিন তার ঘরে তালা দেওয়া। কেহই তার খবর বলিতে পারে না। মহেশ্বর চিন্তিত হয়। কলিকাতায়

ত' এমন কোন আত্মীয় নাই যার বাড়ীতে গৌতম দুদিন থাকিতে পারে।

এর পরও কয়দিনই মহেশ্বর তাব দেখা পাইল না। যে—সময়টা আগে গৌতমের সঙ্গে বেড়াইত, সেই সময় অমলার সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইতে লাগিল। চড়কের বাণ বঁড়শি ফোঁড়ার গল্প, দুর্গা পূজায় খেউড় গান, মহিষ বলি, দেশের অনেক কথাই সে বলিল। শুনিল অমলার খবর। সে ঢাকায় দিদির কাছে থাকিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে। দিদি সেখানে হেড মিষ্ট্রেস। আপনাব বোন। তাদেব মা থাকেন এটোয়ায়। সে পশ্চিমের রামনবমী ও হনুমান পূজার গল্প করিল, বলিল, ওতে ভাবী ধুমধাম হয। আর হনুমান হচ্ছেন ওদেশেব দেবতা—বলিয়াই অমলা হাসিতে লাগিল।

অপবের দেবতাকে লইয়া মেয়েটিব এই পবিহাস মহেশ্বরের ভাল লাগিল না।

কিন্তু অমলার স্বভাবই ঐ বকম, হাস্য-পবিহাস ও লঘু চপলতায ভরা। রূপের সঙ্গে দুষ্টামি যেন জড়ানো। মহেশ্বরকে বিব্রত করিয়া সে ভারী আনন্দ পায়, বলে, শুনেছ দিদি, ওদেব দেশের কাছিম কোপানোব গল্প? বলুন ত' মহেশ বাবু আর একবার।

সবিতা বলে, আমাদের ত' কখনও বলে নি, তুই তা হলে ওর লজ্জা ভেঙ্গে দিয়েছিস্, বল্?

মহেশ্বর লজ্জায় এতটুকু হইয়া যায়, তাব মনে হয় কাকীমার এ ভারী অন্যায়।

অমলা বলে, আপনি ভাল ছেলে, একদিন হয়ত আই, সি, এস, হবেন, তখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাবেন কি করে?

সবিতা হাসিয়া বলে, তখন তোকে ডেকে নেবে সাহায্য করবার জন্য।

অমলা বলে, আমার ভারী দায় পড়েছে।

সে ঢাকা যাওয়ার পর মহেশ্বরের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইল। সে ভাবিত অমলার কথা, আচ্ছা তারও কি এই রকম মনে হয়?

এই সময় গৌতম হোষ্টেলে ফিরিল। মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

ছিলাম এই—একটি আত্মীয়ের অসুখ ছিল, তার বাড়ীতে—গৌতম অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল। মহেশ্বরের মনে হইল সে সত্য গোপন করিতেছে। সে বলিল, তোমার হষ্টেলের বোর্ডারবা কিন্তু অনেকেই জিনিসটা লক্ষ্য করেছে।

গৌতম জিজ্ঞাসা করিল, কেউ তোমায় এ সম্বন্ধে কিছু বলেছে?

হ্যাঁ, দুর্গাচরণ বলছিল গৌতম যে পরীক্ষা দেবে কি করে তা ত' ভেবে পাই না।

আট নম্বর কিছু বলেছে?

না।

মহেশ্বর অমলার কথা বলিলে গৌতম হাসিয়া কহিল, একেই বোধ হয় তোমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে বলে পূর্বরাগ।

মহেশ্বর বলিল, আমাদের মানে? তোমার নয় কি?

গৌতম উত্তর করিল, ওতে আমার অধিকার নেই, ওটা প্রেমের সাহিত্য।

সে মঞ্জরীর প্রত্যেকের খবর জিজ্ঞাসা করিল, বিশেষ করিয়া নরু ও বীরুর কথা। তারকেশ্বরের সম্বন্ধে বলিল, তারককে আমার বেশ লাগে। সত্য কথা সে সোজাভাবে বলতে পারে।

মহেশ্বর এবার আর গৌতমকে আগের মতন পায় না। রোজ দেখা হয় না। দুতিন দিন পরে যদি বা হয়, গৌতম তার সঙ্গে বেড়াইতে সময় পায় না। কাজ তার প্রচুর।

মহেশ্বর তার সঙ্গ পায় না বটে কিন্তু প্রায়ই তাকে গৌতমের ফরমাশ খাটিতে হয়, ফরমাশ নানারকম।

এই প্যাকেটটা তরুণ বাবুকে দিয়ে এস ত' ভাই, এই ঠিকানায় রঞ্জন গুপ্তকে চিঠিখানা পৌছে দিলে বড় ভাল হয়। আর কাউকে বোলোনা কিন্তু।

বাংলা দেশে এক শ্রেণীর তরুণের তখন সবেমাত্র আবির্ভাব হইয়াছে। গোপনে তারা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মধ্যে মধ্যে হিংসাত্মক কাজের পর দু'একজন ধরা পড়ে। প্রত্যেকেই ভদ্র ঘরের ছেলে, সম্ভ্রান্ত, উচ্চ শিক্ষিত, চরিত্রবান।

মহেশ্বরেব মধ্যে মধ্যে মনে হয় গৌতমও ঐ দলেবই একজন। না হইলে এত তার কিসের কাজ আর এত গোপনীয়তাই বা কেন ?

সে একদিন বলিল, চল গৌতম, একবার আলিপুরেব বোমার মামলার আসামীদের দেখে আসি।

গৌতম কহিল, থাক্, কি দরকার ?

শেষে মহেশ একাই গেল। তখনও আদালতে পুলিসের খুব কড়াকড়ি হয় নাই। সে জজকোর্টে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিড় বেশী নয়। আট দশজন লোক।

প্রিজন্‌ভ্যান সিঁড়ির কাছে আসিয়া থামিলে ভিতর হইতে শব্দ হইল, বন্দেমাতরম্। আসামীরা এক একজন করিয়া নামিলেন। ধীর তাঁদের পদক্ষেপ, প্রশান্ত দৃষ্টি। দর্শকদের মধ্যে একজন বলে, ইনি অরবিন্দ, এই বারীন্দ্র, এই উল্লাসকর। আর মহেশ্বর বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাঁদের দিকে চাহিয়া থাকে।

গৌতমকে এই গল্প বলিলে সে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করে না। স্বদেশীর ব্যাপারে তার কেমন

যেন ঔদাসীন্য দেখা যায়। তাই মহেশ্বর মধ্যে মধ্যে আবার মনে করে, তার অনুমান ভুল। গৌতম বোমারু নয়।

কিছুদিন পরের কথা। গৌতমের ঘরে বসিয়া সে ও মহেশ্বর গল্প করিতেছিল। গৌতম উঠিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। তারপর বাক্সের ভিতর হইতে একটি পিজবোর্ডের বাক্স বাহির করিয়া বলিল, এটা কয়েকদিনের জন্য তোমায় রাখতে হবে।

মহেশ্বর খুলিয়া দেখিল, রিভলভার। সে বলিল, রিভলভার রাখতে হবে?

হ্যাঁ, আঁতকে উঠছ যে?

একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ্বর বলিল, আমি পারব না, আমায় ক্ষমা কর।

গৌতম রুক্ষকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল এ সব ভাল ছেলেদের কাজ নয়।

এই শ্লেষের উত্তরে মহেশ্বর বলিল, ভাল ছেলে ত' তুমিও।

গৌতম বলিল, বাংলা দেশে ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় তা আমি নই। হতেও চাই না।

মহেশ্বর একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, আগেও ক'বার বোধ হয় এই সবই রাখতে দিয়েছ? আর যে সব চিঠি চাপাটি বয়ে বেড়িয়েছি তাও এই সংক্রান্ত?

গৌতম নিরুত্তর।

মহেশ্বর বলিল, তা হলে অন্যায় করেছ।

গৌতমশঙ্করের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। আজই খবর পাইয়াছে তাদের দলের বিনয় একজন স্পাই। এই হোষ্টেলে খানাতল্লাশ হওয়ার আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে। এদিকে মহেশ্বরের মত বন্ধু দু' একদিনের জন্য একটা রিভলভার রাখিয়া উপকার করিতেও নারাজ। পরাধীন জাতির ধরনই এই।

মহেশ্বরের কথায় সে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, ঘাট হয়েছে আমায় ক্ষমা কর। তুমি যে এমন Nincompoomp তা জানতাম না।

তুমি আমার উপর অবিচার করছ—শুধু এই একটি মাত্র কথা বলিয়াই মহেশ্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপর কাটিল প্রায় একটা ঘণ্টা। দুজনেই নীরব। গৌতম রিভলভারটি খুলিয়া একমনে বোর পরিষ্কার করিতে লাগিল। তার পর ভ্যাসিলিন মাখাইল। সন্তানকে মা যেমন যত্ন করে ঠিক তেমনই কোমল হস্তে সে ঐ অস্ত্রটাকে নাড়াচাড়া করিল। কী অপরিসীম তার দরদ!

মহেশ্বরও ঐ দিকে তাকাইয়াছিল কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইল না। ঐ অস্ত্র নয়, কার্তুজ নয়, গৌতমকেও নয়। কি যে ভাবিতেছিল নিজেও তাহা জানিত না।

সে বিদায় লইবার সময় গৌতম বলিল, আমাদের হষ্টেলেব আট নম্বর খুব সাঙ্ঘাতিক লোক, সাবধানে থেকো। আট নম্বর রুমের বোর্ডারের কথা বলছি।

তারপর তিন চাবদিন মহেশ্বরের মন সর্বদাই তোলপাড় করিতে থাকে। কি যে করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। একবার ভাবে গৌতমশঙ্করের পথই ঠিক। আবাব মনে হয়, না ঠিক নয়।

তরুণ মনের উপর রহস্যের প্রভাব অপরিসীম। গৌতমের পথ রহস্যময়, রিভলভার তার প্রতীক। দেশেও তখন সন্ত্রাসবাদের হাওয়া বহিতেছে। সন্ত্রাসবাদীরা যুব-সমাজের আদর্শ। যারা ঐ পথের পথিক নয় তারাও সন্ত্রাসবাদীদের শ্রদ্ধা করে তাদের ত্যাগ ও নির্ভীকতার জন্য। শ্রদ্ধা মহেশ্বরেরও আছে। কিন্তু সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না তাদের এই পথটা ঠিক কিনা।

একদিন সে শেষটায় ত্রিগুণাকে প্রশ্ন করিল। গৌতমের নাম বাদ দিয়া আর সব কথাই খুলিয়া বলিল।

ত্রিগুণা বলিল, তুমি নিজে ভেবে ঠিক করতে পারলেই ভাল। ভাব আর প্রার্থনা কর।

মহেশ্বর ভাবে আর প্রার্থনা করে। শেষটায় তার মনে হয়, এটা কল্যাণের পথ নয়, দেশের মুক্তি ইহাতে অসম্ভব।

একদিন সে ত্রিগুণা কাকাকে বলিল, আমার মনে হয় টেররিজমে দেশের ভাল হবে না।

ত্রিগুণা বলিল, আমারও বিশ্বাস তাই। তুমি যাতে নিজে ভেবে একটা মত গঠন করতে পার সেই জন্য আমি আগে কিছু বলিনি।

মহেশ্বর গৌতমকে বলিল, আমার ভয় হয় তোমরা ভুল করেছ। চলছ ভুল পথে।

গৌতম হাসিয়া বলিল, বেশ ত'।

মহেশ্বর বলিল, আমার অনুরোধ,. তুমি ও পথ থেকে ফিরে এস।

গৌতম উত্তর করিল, সন্ত্রাসবাদ আমাদের আদর্শ নয়, ওটা একটা পথ মাত্র। যাক, আমাদের দু'জনের পথ দেখছি আলাদা, আদর্শ বিভিন্ন। এ অবস্থায় বন্ধুত্বের আর কোন অর্থ হয় না।

এই আঘাতের জন্য মহেশ্বর প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু গৌতম আরও রূঢ় আঘাত করিল, You are a coward. রিভলভার দেখে তোমার মুখখানা সেদিন সাদা হয়ে গিছল।

সেদিন সাদা হওয়ার কথা হয়ত গৌতমের অনুমানমাত্র। কিন্তু আজ বন্ধুর এই রূঢ়তায় মহেশ্বরের মুখখানা সত্য সত্যই ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না গৌতম তাকে এতটা অপমান করিল কেমন করিয়া।

কয়েক দিন পরের কথা। একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে 'প্রভাত' এর সাইন বোর্ড চোখে পড়িল। প্রভাত ছেলেদের কাগজ। দেশ হইতে ফিরিয়া মহেশ্বর এই কাগজে নরুর দুইটি কবিতা দিয়াছিল। তার পর নানা কারণে আর খোঁজ লওয়া হয় নাই। একটি কবিতা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়াছে। সম্পাদক বলিলেন, আর একটিও মনোনীত হয়েছে। শীগগীরই বেরুবে। ছেলেটি বেশ লেখে। ঠিকানা জানা না থাকায় কাগজ পাঠাতে পারি নি।

ছাপার অক্ষরে নরেশের কবিতা দেখিয়া মহেশ্বরের ভারী আনন্দ হইল। এমন আনন্দ জীবনে সে খুব অল্পই পাইয়াছে। যেদিন এণ্ট্রান্সে বৃত্তি পাওয়ার খবর পায় আর যেদিন তার বাবার জরিমানার সংবাদ আসে, ঐ দুইদিনের আনন্দের সঙ্গেই শুধু আজকের আনন্দের তুলনা হয়। শেষের খবরের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজরাখাল লিখিয়াছিল, Your father s really great.

লেখকের প্রাপ্য কাগজের সঙ্গে মহেশ্বর আরও তিনখানা প্রভাত কিনিল। দেশে দুখানা পাঠাইল। একখানা বাবার ও আর একখানা নরেশ্বরের নামে। দুর্গাকে এক কপি পাঠাইল। নিজের কপি ত্রিগুণা কাকা, কাকীমা ও দু'একজন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইল।

নরেশ্বরকে লিখিল, তোমার 'কাউয়ার চর' প্রভাতে বেরিয়েছে, 'হলদে পরী'ও শীগ্‌গীরই বেরুবে। সম্পাদক বললেন, ছেলেটি লেখে বেশ।

আরও দুটো কবিতা পাঠিয়ো। কাউয়ার চর আম্মাকে পড়িয়ে শোনাবে।

স্কুলের পড়ার কথাও ভুলো না কিন্তু। মনে আছে ফাষ্ট হতে পারলে কি পুরস্কার দেব বলেছি ?

চিঠি পড়িয়া নরেশ্বরের ইচ্ছা হইল বাবাকে খবরটা বলে কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিল না। সে চিঠি লইয়া তার বন্ধু চৌধুরী বাড়ীর অনন্তের নিকট ছুটিয়া গেল।

তার কাউয়ার চরের গল্প ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে শুনিয়া দুঃখীর মা বলিল, সেডা আবার কি জিনিস?

নরেশ বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ঠিক না বুঝিলেও বৃদ্ধা মনে মনে খুশি হইল। সে ধারণা করিল যে ব্যাপারটা আনন্দেরই। রাত্রে সে ভাল করিয়া একটা নূতন গল্প বলিল, কানা পুলিশ আর খোঁড়া সিপাইর গল্প।

নরেশ্বর পরদিন দাদাকে দুই ছত্র কবিতা লিখিয়া পাঠাইল—

তোমারে নমস্কার দাদা
তোমারে নমস্কার,
কবিতা লেখার বদলে পেতাম
শুধুই তিরস্কার,
তোমার হাতে প্রথম এবার
পেলাম পুরস্কার
তোমারে নমস্কার।

কবিতাটির নীচে লিখিল, এর জন্য তুমি আবার রাগ ক'র না কিন্তু …

কলিকাতায় বড়বাজারে রাজেশ্বর দোকান ও গুদাম করিল। বাসা করিবারও ইচ্ছা ছিল। বাসায় থাকিয়া ছেলেদের পড়াব সুবিধা হয়। নিজেও আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিতে পারে। কারবারের জন্য প্রায়ই তার কলিকাতায় আসা দরকার। কিন্তু এই সময় দেশের একটা ব্যাপারে সব ওলটপালট হইয়া গেল।

এ অঞ্চলে নয়াবাড়ীর সামনে মঞ্জরীর খালের উপরের বটতলার বাঁশের সাকোই পারাপারের একমাত্র পথ। পুনতি ও কুরপালা প্রভৃতি গ্রামের লোকদের এই সাঁকের উপর দিয়াই হাট-বাজাব, স্কুল ও ডাকঘরে যাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাঁকোটা থাকে না। আষাঢ়ে জল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তখনও সব জায়গায় নৌকা চলে না। লোকেরা জল কাদা ভাঙ্গিয়া খালধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত খালি শোনা যায়, একটু পার করবা ভাই।

সমস্ত দিন হাল চষিয়া মাটি কোপাইয়া কেহ বা কাঠ ফাড়িয়া নৌকা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। শ্রান্ত শরীর চায় একটু বিশ্রাম, চোখ বুজিয়া আসে। কিন্তু উপায় নাই, ফকিরবাড়ীর গাঙ হইতে খালে ঢুকিলেই কানে আসিতে থাকে ঐ এক অনুরোধ, পার করবা ভাই। কাঁসারচক পর্যন্ত পাঁচ সাত জায়গায় পারাপার করিতে হয়। বেশীও হইতে পারে। না বলিবার উপায় নাই। কেহ দাদা, কেহ চাচা, কেহ

ভুঁইয়া, কেহ বা গুরুঠাকুর। তাদের পার না করিলে চলিবে কেন? মানুষের ত' চক্ষুলজ্জা আছে।

প্রকাশ মিস্ত্রীর ছেলে শশী বটতলা হইতে নৌকা ছাড়িবে এমন সময় রতীশ রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, একটু পার কর ভাই।

রতীশ ছাত্র জীবন হইতেই বিদেশে থাকে। চাকরি করে লাহোরে। শশী তাকে চিনিত না।

দেখ না মশায়, নাওতে আর জায়গা নাই, বলিয়া শশী লগিতে খোঁচ দিল।

রতীশেরও পার হওয়া একান্ত দরকার। আজকের ডাকে ছুটির দরখাস্ত না পাঠাইলেই নয়।

সামনের ঐ বাঁকটায় রেখে গেলেই চলবে, বলিয়াই পার হইতে সে নৌকায় লাফাইয়া পড়িল।

জোর করিয়া ওঠবা নাকি, তুমি ত' ভারী আহাম্মক ভুঁইয়া, বলিয়া বাধা দিবার জন্য শশী হাত বাড়াইতেই রতীশ পড়িয়া গেল।

জল সেখানে সামান্য, বেশীই পাঁক। পাঁকের মধ্যে বেতকাঁটা, বাঁশের কঞ্চি এবং মানুষের মল।

রতীশ ফুটফুটে বাবু, দেখিতে সুশ্রী, পরিষ্কার বেশভূষা, হাতে আংটি, বুকে সোনার চেন, ওয়েষ্ট কোটের পকেটে সোনার ঘড়ি। ঘড়ি ও চেন রক্ষা পাইল বটে কিন্তু তার সমস্ত শরীর কাদায় ও ময়লায় ভরিয়া গেল। হাতে ও কপালে বেতের কাঁটা ফুটিল। ব্যথা যতটা পাইল, লাঞ্ছনা হইল তার চেয়ে অনেক বেশী।

খালের উভয় তীর হইতে কয়েকজন লোক ব্যাপারটা দেখিল। তার মধ্যে দুজন তার জ্ঞাতি, একজন ভিটা-বাড়ীর প্রজা, আর একজন শ্বশুর বাড়ীর পাশের লোক। ভিন্ন গ্রামের এই ব্যক্তিটির ঠিক এই সময়ই যে এখানে কি কাজ ছিল রতীশ তাহা বুঝিয়া পাইল না।

লোকের মুখে মুখে কথাটা রটিয়া গেল। রতীশ একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী, অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এ অপমানটা ত' তার নয়, সমস্ত ভুঁইয়া সম্প্রদায়েব। তারা ভীষণ বাগিল, বলিল, ছোট লোকের এ কী স্পর্ধা! প্রতিকারের চেষ্টা অপেক্ষা ক্রোধ বেশী প্রকাশ পাইল এবং ক্রোধেব চেয়েও বেশী হইল তর্জন গর্জন। এদেব অগ্রণী কবালী ভুঁইয়া।

রতীশ ভাল রোজগার কবে। করালীর স্বভাব রোজগেরেদের খুশি রাখা। এ ছাড়া প্রকাশের উপরও তার রাগ ছিল। সে করালীর ঘর বানাইয়াছে। এখনও ঐ বাবদ টাকা পায়। করালী চুক্তির অর্ধেক টাকাও দেয় নাই। সে জন্য প্রকাশ মধ্যে মধ্যে হাটে-বাজারে তাগাদা করে। মিষ্টি করিয়াই বলে, ছোট ভুঁইয়া একটু ক্রেপা করলে ভাল হইত। অথবা বলে, একদিন আপনার ওখানে যাব নাকি?

বিনয়ের সঙ্গে বলিলেও ইহা তাগাদা এবং তাগাদা করালী কোনদিন বরদাস্ত করিতে পাবে না। সে ভাবে, পাওনা আছে থাক কিন্তু ছোট লোকেব এত সাহস!

রতীশের ব্যাপাবে করালী শ্রেণীব লোকদের একটা কাজ জুটিল। ভদ্র সমাজের মান রক্ষাব জন্য তারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কমিটি কবে, সভা করে, নানারূপ সলা পরামর্শ হয়। বিদেশে চাকুরিয়াদের লেখে, তোমরা ইহার প্রতিকার না কবিলে স্ত্রী পুত্র লইয়া দেশে বাস করাই অসম্ভব।

পূজার সময় প্রতিকারের সঙ্কল্প লইয়া তাঁরা দেশে আসিলেন। পূজার ঝামেলা কাটিয়া গেলে ৺বিজয়াব পর শরৎ ডাক্তাবের বাড়ী বৈঠক বসিল। প্রকাশ ও শশীকে ডাকিয়া পাঠান হইল। শশী আসিল না। প্রকাশ পুত্রের হইয়া ক্ষমা চাহিল, বলিল, ভুঁইয়াবা যে শাস্তি দেন, তাই মাথা পাতিয়া নেব'

রতীশ অনুপস্থিত। করালী তার তরফ হইতে ঘটনা বিবৃত করিলে প্রকাশ বলিল, আপনে যা কইলা ভূঁইয়া, তা একেবারেই হাচা। কিন্তু বার্তাডা একটু অন্য কছমের। আমার শশী গাইল দেয় নাই, ঠেলিয়াও ফেলায় নাই। রতীশ ভুইয়া উঠ্‌তি গেলে শশী একটু বাহু বাড়াইয়া দিল—আর ভুঁইয়ার আমারগো কোমল শরীর তিনি একেবারে ক্যাদায় গড়াগড়ি খাইলেন।

করালী কহিল, তুমি মিথ্যে বলছ। শশী প্রথম গাল দেয় তাব পর দেয় ধাক্কা।

প্রকাশ কহিল, আপনার শ্রবণের কথা, আমারও ভাই। শশীব সমাচার আমি কইলাম।

ভুবন উকিল বলিল, বেশ নিয়ে এস শশীকে। আমরা তার মুখেই সব শুনব। তারপর জেবা—যাকে বলে ক্রস্ (cross)। ক্রসেব চোটে সব চি চিং ফাঁক। মহকুমায় এই বিশ বৎসরের প্রাকটিশ। ক্যারাভান সাহেব বলতেন, শুনছ শরৎ ভায়া? I. C. S. Caravan বুঝলে ত'? ক্যারাভান বলতেন, You are the best crosser I ever came across বলিয়াই ভুবন নিজের কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রকাশ কহিল, শশীরে বাড়ীতে দেইখ্যা আসি নাই। তা ছাড়া তারে আনতে যে পারব তাও কইতে পারি না। সে ভারী অবাধ্য। ভদ্দব লোকের ছাওয়ালদের মতন ছাপানো পুঁথি পড়ে নাই। তা হৈলে অবশ্য পিতারে মানতো।

ভুবন উকিল বলিলেন, ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। যাও নিয়ে এস গিয়ে, সে বাড়ীতেই আছে।

শশী ত্রিনাথের মেলায় গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, কানে বিড়ি গোঁজে, গায়ে দেয় রামধনু রঙের জামা। বাপের কোন কথাই সে শোনে না।

প্রকাশ তাকে আনিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ ছিল। সে বলিল, সে কথা আমি দিতে পারবো না।

করালী বলিল, আলবৎ পারবে, পারতেই হবে তোমায়।

ক্রমেই কথায় কথা বাড়িল। প্রকাশ বলিল, ঘাইট হৈছে কইতেছি, জরিমানা দিতেও রাজী আছি। ক্যাদা মাটি পাইয়া তবু আপনারা আমারে পায়ে মাড়াবা ?

করালী বলিল, তুমি একটি আস্ত শয়তান।

কি করছি আমি তোমার, ভুঁইয়া ? তোমার ধারিও না, ধারাইও না বরং—

কী ! মুখে মুখে কথা, হারামজাদা—বলিয়াই করালী প্রকাশের দাড়ি ধরিয়া দুই গালে দুই চড় মারিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভুঁইয়ারা তার পঁচিশ টাকা জরিমানা করিলেন। প্রকাশ বলিয়া উঠিল, এর বিচার করিও পরমেশ্বর, তুমি যদি গরিবের ঈশ্বর হও।

সে পরগনার মধ্যে সবচেয়ে নামী মিস্ত্রী। ভাল কাজ, শৌখিন কাজ করাইতে হইলে লোকে তাকেই ডাকে। শরৎ বাবুর ঘরের কারুকার্য খচিত ঐ যে দরজা জানালা দেখা যায় এগুলি প্রকাশের নিজের হাতের তৈরি, নক্সাও তার নিজের। রোজগার করিয়া সে নিজের অবস্থা ফিরাইয়াছে। স্বজাতির পাঁচজনে তাকে খাতির করে, ভদ্রলোকেরাও দেখিলে হাসিয়া কথা বলেন। আজ পাঁচটা লোকের সামনে তার এই অপমান।

প্রকাশ উঠানের একধারে বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। উঠিবার হুকুম নাই। জরিমানার দশ টাকা সে খুঁট হইতে সঙ্গে সঙ্গেই খুলিয়া দিয়াছিল। বাবুরা বলিলেন, আর পনর টাকার জন্য বাড়ীতে বলে পাঠাও। টাকা এলে উঠতে পাবে।

করালীর হুকুম হইল, শুধু টাকা নয়। শশী আসিবে, সে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে তবে মুক্তি।

অনেকক্ষণ এইভাবেই কাটিল। শরৎবাবুর বাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। তিনি কলিকাতার নামী ডাক্তার। বহুদূর হইতে রোগী আসিয়াছে। কত লোক আসিয়াছে কত রকম দরবার করিতে। সকলেই প্রকাশের দিকে চায়। দুই একজন প্রশ্ন করে, কী হইল মেস্তরী? প্রকাশ উত্তর করে না, হয়ত তার কানেও যায় না।

রৌদ্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঝিম ঝিম করিতে থাকে, মনে হয় চোখের সামনে কতকগুলি জোনাকি জ্বলিতেছে।

রাজেশ্বরের শরীর ভাল ছিল না। সে একটু সাবু খাইয়া শুইতে যাইবে এমন সময় মথুরাবাসীরা আসিয়া খবর দিল। সমস্ত শুনিয়া রাজেশ্বর বলিল, উঠে এল না কেন প্রকাশ খুড়ো?

মথুরা বলিল, সাহস করে নি—

তা' বটে। আমরাই ভুঁইয়াদের বাড়িয়ে তুলেছি। বেশ চল—বলিয়া বাঁশের উপর হইতে একখানা চাদর নামাইয়া লাঠি হাতে করিয়া রাজেশ্বর শরৎ বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

প্রকাশের খবর গ্রামেব সকলেরই কানেই পৌঁছিয়াছিল। পথে স্বজাতীয়দের মধ্যে যার সঙ্গে দেখা সেই রাজেশ্বরের পিছু হইল। কেহ চলিল মজা দেখিতে, কেহ বা সত্যই প্রকাশের জন্য দুঃখ বোধ করিতেছিল।

ভুঁইয়ারা গল্প করিতে করিতে তেল মাখিতেছেন। বেলা অনেক তাই শরৎবাবু বাড়ীতেই সমাগত ভদ্রলোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোন জটিল মামলায় কি ভাবে তার জয় হইয়াছে, হাকিমদের তুষ্ট করাও যে মামলা জিতিবার মস্ত বড় আর্ট ভুবনবাবু এই সব সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলেন এমন সময় রাজেশ্বর উপস্থিত হইল। শরৎবাবু বলিলেন, এস রাজু। ওরে কে আছিস, ওকে একখানা বসবার আসন এনে দে।

ভুবন বলিলেন, কী সমাচার রাজু, শরীর গতিক ভাল ত'?

রাজেশ্বর বলিল, এই দু'দিন একটু সর্দি জ্বর হয়েছে কর্তা। আমি এসেছি প্রকাশ খুড়োর জন্য।

ভুবন কহিলেন, তুমি যখন এসেছ তখন অল্পেই মিটে যাবে। আমরা ওকে বলেছি শশীকে এখানে হাজির করতে। তুমি তাকে হাজির করিয়ে দাও।

রাজেশ্বর কহিল, আপনারা ছেলের অপরাধে বাপকে শাস্তি দিয়েছেন। সেই কী যথেষ্ট নয়? তা ছাড়া ছেলে অপরাধ করেছে কিনা তাও সন্দেহ।

করালী কহিল, কী রকম! অপরাধ নয় বলতে চাও? তুমি যদি পার হৈতে চাও আর আমি যদি পার না করি তা হলে সেটাও অপরাধ।

রাজেশ্বর বলিল, সামাজিক হিসাবে তা বলতে পারেন।

ভুবন উকিল কহিলেন, আজ তুমি এই কথা বলছ। মনে পড়ে কুশাই গয়লার কথা? সে একজন ভদ্রলোককে পার করতে না চাওয়ায় ঈশ্বর দাস মশাই তাকে হুকুম করেছিলেন সাত দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালে নৌকা নিয়ে বেড়াতে হবে। যে চাইবে তাকেই পার করবে।

রাজেশ্বর বলিল, সে-দিন আর এদিনে তফাৎ ঢের। তিনি তখন কুশাইকে সাতদিন খাইয়েছিলেন আর হুকুম তামিল করবার জন্য বিনা সেলামিতে বিনা খাজনায় দু'বিঘে জমি দিয়েছিলেন। এখন দু'পক্ষেরই মতিগতি বদলেছে।

ভুবন বলিলেন, তুমি কী বলতে চাও যে শশীকে আনবে না, জানো তার অপরাধ?

না জানি না। রতীশবাবু এখন নেই। আপনারা অন্যলোকের মুখে শুনে এর মধ্যেই খুড়োকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন।

ভুবন বলিলেন, রতীশের আঘাতটা কি কিছু নয়?

রাজেশ্বর উত্তর করিল, পরের নৌকায় উঠিতে যাবার আগে তাঁর এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল। আর তার জন্য ত' জরিমানা করেইছেন আপনারা।

ওটা যথেষ্ট নয়।

রাজেশ্বর বলিল, কী হলে আপনাদের যথেষ্ট হয় তা ত' বুঝতে পারি না।

ভুবন রাগিয়া বলিলেন, দুটো পয়সা হয়েছে আর আইনের কথা তুলছ। Roman Law, Hindu Law, Juris, Digest কত পড়লাম। এখন আইন শিখব তোমার কাছে ?

রাজেশ্বর বলিল, তা আমি বলিনি, বড় মুনিব।

করালী কহিল ছোটলোকের স্বভাবই ঐ রকম।

রাজেশ্বরও এবার ধৈর্য হারাইল। সে বলিল, এখানে আর কথা বলে কোন লাভ নেই, ওঠো প্রকাশ খুড়ো। প্রকাশ তবু বসিয়া রহিল। রাজেশ্বর বলিল, পড়ে পড়ে মিছিমিছি মার খাবে না কি ?

ভুঁইয়ারা বিস্মিতভাবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারা মনে করিতে পারেন নাই যে রাজেশ্বরের এতটা সাহস হইবে। প্রকাশের জ্ঞাতি ভাগ্য মিস্ত্রী বলিল, ওনারা রাজা। ওনারগো হুকুম বিনা ওঠবে কি করিয়া ?

রাজেশ্বর বলিল, তোমরা অতটা ভয় কর বলেই রাজারা অযথা অত্যাচার করতে সাহস পায়। চল, খুড়ো—বলিয়াই রাজেশ্বর প্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

এত আস্পর্ধা হয়েছে তোমার—বলিয়া ভুবন চোখ লাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে ভুঁইয়ারা তখন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। কিন্তু রাজেশ্বরের পিছনে প্রায় পঁচিশজন নমঃশূদ্র তাই আর কেহই

উচ্চবাচ্য করিলেন না। করালী শুধু একবার বলিল, এক মাঘে শীত যায় না মোড়ল।

সমস্ত পরগনাময় একটা হট্টগোল উঠিল, রাজু মণ্ডল রায়দের বাড়ী হইতে ভুঁইয়াদের অপমান করিয়া প্রকাশ মিস্ত্রীকে ছিনাইয়া আনিয়াছে।

বহুদিন পরে রায়েরা চৌধুরীরা সেনেরা বোসেরা আবার এককাট্টা হইলেন। ভদ্রশ্রেণীর এরূপ ঐক্য শীঘ্র আর দেখা যায় নাই। রাজেশ্বরকে জব্দ করা তাঁদের উদ্দেশ্য। যে ভাবে হোক তাকে শায়েস্তা করিতে হইবে। এরূপ অপমান কিছুতেই তাঁরা বরদাস্ত করিবেন না।

প্রাচীনপন্থী ও প্রাজ্ঞেরা কহিলেন, এর জন্য দায়ী ইংরেজী শিক্ষা, দায়ী ত্রিগুণা। তখন বলিনি যে ম্লেচ্ছ-শিক্ষায় মুড়ি মিছরি এক হয়ে যাবে। ইতরে-বামুনে কোন তফাৎ থাকবে না।

এই ভুঁইয়ারা ভুস্বামী হিসাবে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তারাই সকলে মিলিয়া পরগনার মালিক। অনেকেরই বাৎসরিক দুটাকা পাঁচটাকা মাত্র আয়। পাঁচশ' টাকার উপর খুবই কম লোকের। সব চেয়ে বেশী যার তারও বছরে দু'হাজারের উপর নয়। কিন্তু ভেট, আবওয়াব, খাজনা, সেলামি—প্রজার কাছে ন্যায্য ও অন্যায্য পাওনা এদের অসংখ্য। প্রজারা এদের হাতের পুতুল। অপর কৃষকদের ত' কথাই নাই। রাজেশ্বরের জমি প্রায় তিনশ' বিঘা, তারও প্রত্যেকখানার মালিক এই ভুঁইয়ারা। তাঁরা মনে করিলেন, তাকে জব্দ করা খুবই সহজ।

তার দোকান বয়কট হইল। মাস দুই তিন কোন ভদ্রলোক এবং তাদের নিতান্ত অনুগতরা প্রকাশ্যে তার দোকানে যাইত না। যাদের ধারে কিনিবার দরকার তারা রাত্রে যাইত। বাহির হইয়া আসিবার সময় বলিত, কইওনা কিছু মোড়ল, কেউ যেন টের না পায়।

তবু দোকান বয়কটের জন্য রাজেশ্বরের বেশ কিছু ক্ষতি হইল। কিন্তু সেটুকু সহ্য করিবার মতন মনের বল তার ছিল।

তার জমি অনেক, জমিদারও অনেক। কিন্তু তাঁরা তাকে জব্দ করিতে পারিলেন না। সে সময় মত খাজনা, তহুরী পাঠাইয়া দেয়, তার ভেট পড়িয়া থাকে না। কিছুদিন হইতে সে কিষাণ দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছিল। প্রজারা খাজনা দেয়, পাঁচ রকম আবওয়াব দেয়। এর উপর আবার কিষাণ দিতে হয়। জমিদার তালুকদাররা বিনা পয়সায় খাটাইয়া নেন, কাহাকেও বৎসরে দুই দিন, কাহাকেও চার দিন। গরিবের উপর এটা যেমন অত্যাচার তেমনি আর এক হিসাবে ইহা দাস-প্রথারই সামিল। রাজেশ্বর নিজে খাটিত না। কিন্তু লোক দিয়া কিষাণ দেওয়াইত। এবার সে উহা বন্ধ করিল, তার দেখাদেখি চাষীরা একযোগেই যেন বলিয়া উঠিল, ঠিকই ত' খাজনা দি আমরা, আবার খাটিয়া মরব কেন? আমরা কি মানুষ না?

ভুঁইয়া শ্রেণীর রাগ আরও বাড়িল। কেহ বলিল, দুইটা পয়সা হওয়ায় রাজু ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

কেহ বলিল, এতদিন চাষীর স্বার্থ দেখে আমরা মরলাম আজ রাজু হল তাদের বন্ধু। হেঃ হেঃ—

এ হাসিতে হয়ত বিধাতাও যোগ দিলেন।

রাজেশ্বর সমস্ত পরগনার নমঃশূদ্রদের নেতা, মুসলমানদের বন্ধু, চাষীদের সুহৃৎ। ভুঁইয়াদের নিতান্ত অনুগত দু'চার জন কৃষিজীবী, যারা প্রকাশ্যে তার সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করিত না তারাও গোপনে রাজুকে বলিয়া যাইত, আপনার দলেই আছি মণ্ডল মশায়। আপনে যে আমাগো ভাল চান তা কি বুঝি না? সে জ্ঞানটুক্ আমারগোও আছে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম তার শ্যালকরা। তারা প্রকাশ্যেই রাজেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, বাবুদের বৈঠকে যাইয়া তাদের ক্রোধে ইন্ধন যোগায়। বাবুরাও বলেন, সত্যকার বনেদী হলে তোমরা। তোমরা ত' বিনয়ী হবেই। ও উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

ঈশানরা চার ভাইই ভগ্নীপতির উন্নতিতে ঈর্ষায় ফাটিয়া পড়িত। তবে বেশী রাগ ছিল ঈশানের। সে অগ্নি মণ্ডলের ছেলে, ধনে মানে বড়। মোড়ল হওয়ার কথা তার। কিন্তু হইল রাজেশ্বর।

সে সম্পর্কে ছোট, বয়সে ছোট, গরিবের ছেলে। তার এই উন্নতি যেন তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে একটা ইচ্ছাকৃত অভিযান। তাদের অবস্থা যত খারাপ হয় রাগ ততই বাড়িতে থাকে।

তারকেশ্বর পিতাকে বলে, ওরা ভারী অকৃতজ্ঞ। সব সময় তোমার নিন্দে করে। অথচ টাকাব দরকার হলেই ছুটে আসে। দাও নালিশ করে।

রাজেশ্বর হাসে, বলে, ভুলে যেও না ওরা তোমার মায়ের আপন ভাই।

নিজে সে জানে চাঁপার ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করা তার পক্ষে অসম্ভব।

রাজেশ্বরকে জব্দ করিতে না পারিয়া ভুঁইয়ারা শেষটায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেখি শ্রীমান রাজু এবার লোকাল বোর্ডে যায় কি করে? তাঁরা জেলার বড় উকিল শশাঙ্ক বাবুকে চিঠি লিখিলেন, রাজু মল্লিকের আস্পর্ধা বড় বেড়েছে। দেখবেন সে যাতে জুবি না হতে পারে।

করালীবা থানায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। দারোগা বাবু তাদেরই সমশ্রেণীর। দেখা যাক তাঁকে দিয়া যদি .লাকটিকে জব্দ করা যায়। করালীর সংস্কৃত জ্ঞান অদ্ভুত। সে প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিল, আমরা এবার রাজুর রাজস্থয়ের ব্যবস্থা করছি।

প্রকাশের বাড়ীতে বেশ ভিড়। মহকুমা হইতে পেয়াদা আসিয়াছে মাল. ক্রোক করিতে, সঙ্গে করালী। প্রকাশ বাড়ী নাই, কাজুলিয়ায়

ঘর তুলিতে গিয়াছে। পেয়াদা গরু ও ঢেঁকি ক্রোক দিল, ঘটি বাটি টানিয়া বাহির করিল।

রান্না ঘরের দরজায় বসিয়া মেয়েকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে প্রকাশের স্ত্রী কাঁদিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছিল, খা, আবাগী, খুব খা।

করালী বলিল, ভদ্দর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার সময় মনে থাকে না? ঘরের টিন ক'খানা খুলে না নেই ত' আমি বিরিঞ্চি ভুঁইয়ার ছেলে নই।

প্রকাশের স্ত্রী আরও জোরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আমার কি হবে রে, ওরে কোথায় গেলা রে!

কান্না শুনিয়া বৃন্দাবন ছুটিয়া আসিল। সে বলিল, ছুটাও দেহি ভুঁইয়া, মেস্তরীর টিন। যদি পার ত' আমি জবার সোয়ামী না।

করালী কহিল, সরকারী কাজে বাধা দিচ্ছিস বোনা?

বৃন্দাবন বলিল, রাইখ্যা দাও তোমার সরকার।

করালী পেয়দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, দেখুন, আপনারা ভারত সম্রাটের লোক। বোনা আপনাদের বাধা দেয়।

রাজেশ্বর পয়সার হাট হইতে ফিরিতেছিল। ব্যাপারটা সে সব শুনিল। সারদা সেনের নিকট হইতে প্রকাশ দেড়শ' টাকা ধার নেয়। তারই ডিক্রি। সমন গোপন করিয়া বাদী পক্ষ ডিক্রি জারি করিয়াছে।

প্রকাশের স্ত্রী রাজেশ্বরের বাড়ী টাকার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল। তারক ধমক দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, আমাদের কাছে কি টাকা জমা আছে না কি?

রাজেশ্বর বাড়ী আসিয়া খরচা সমেত সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিল। পেয়াদাকে সমাদর করিয়া খাওয়াইল।

ভুঁইয়ারা আরও রাগিলেন। এই সময় খবর আসিল মহেশ্বর বি, এ-তে 'অনার্সে' প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়াছে। শুনিয়া করালী কহিল, ঘোর কলি, তাই লক্ষ্মী সরস্বতীর রুচিও খারাপ হয়ে গেছে।

দীঘির পাড়ের নবীন চাটুয্যে একজন মাতব্বর, ছোট ছোট জমিদারদের বাড়ী যাতায়াত করে। থানার দারোগা পান খাওয়ার জন্য তার মারফৎ টাকা নেয়। হাটে এক টাকার মাছ কিনিয়া কখনও আট আনা দেয়, কখনও দেয় না। দাম চাহিলে মারিয়া বসে।

আব্দুল রসিদ নামে একটি যুবক তার কাছে চাউলের দাম পাইত। বহুদিন চাটুয্যে-বাড়ী ঘোরাঘুরির পর রসিদ হাটের মধ্যে একদিন একটু কড়া তাগাদা করিলে নবীন তাকে মারিয়া বসিল। রসিদের পিতা নুর আমেদ ছিলেন মুসলমান সমাজের গুরুস্থানীয়। তাঁকে সকলে মানিত। রসিদের অপমানে মুসলমানেরা খেপিয়া গেল। নবীন চাটুয্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। গুজব রটিল তার বাড়ী লুট হইবে।

লুঠতরাজ সংক্রামক ব্যাধির মতন একবার শুরু হইলে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। তাই বিজ্ঞ মুসলমানেরা মিটাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ছেলের দল শুনিল না।

ভদ্রশ্রেণী সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, লাঠি ধরিতে জানে না। গোলমাল হইলে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া তারা ব্যাকুল হইল।

নবীনকে না পাইয়া মুসলমানেরা ঘাঘরের গাঙে তার ছেলের কান মলিয়া দিল। স্কুলে রসিদের ভাইকে মারিয়া হিন্দু ছেলেরা প্রতিশোধ নিল। অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য গ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মহকুমায় গেলেন। ভুবন উকিলের প্রাকৃটিশ নাই বলিলেই চলে কিন্তু তিনি কাজের অজুহাত দেখাইলেন, হাতে জরুরী কাজ, সেসনের ব্যাপার। লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এ অবস্থায় আমি ত' যেতে পারি না।

শিবনাথ সেনও মঙ্গরীর লোক, মহকুমার শ্রেষ্ঠ উকিল। গ্রামে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথা এস, ডি, ও-কে জানাইয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হইয়া আসিলেন।

হিন্দুব মধ্যে রাজেশ্বরেব স্বজাতীয়েরা সংখ্যা গরিষ্ঠ, তারা লাঠি ধরিতে জানে। তার কথায় তারা ওঠে বসে, মুসলমানরাও তাকে মানে। দেশে পৌছিয়াই শিবনাথ রাজেশ্বরের বাড়ী গেলেন।

রাজেশ্বর তাঁকে গুরুর মতন অভ্যর্থনা করিল। চরিত্রের জন্য শিবনাথকে সে ভারী শ্রদ্ধা করিত। তিনি বলিলেন, রাজু, লুণ্ঠতরাজ শুরু হলে তোমরাও বাদ পড়বে না কিন্তু।

রাজেশ্বর বলিল, তা জানি বড় মুনিব। কিন্তু আমরাও লাঠি ধরতে জানি। হঠাৎ আমাদের কাছে কেউ ঘেঁষবে না।

দক্ষিণা চক্রবর্তী কহিলেন, আমাদের এই বিপদ কি তোমাদের নয়? তোমরা আমরা ত' এক।

রাজেশ্বর বলিল, তা হলে আর ভাবনা ছিল না ঠাকুর মশাই। আপনারা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করেন?

শিবনাথ ও দক্ষিণা উভয়েই নীরব রহিলেন। তাঁদের বলিবার কিছু ছিল না। তাঁরা জানিতেন সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রের সামান্য অংশীদার হইয়া কৃষক শ্রেণীকে তাঁরাও কম নিষ্পেষণ করেন নাই।

করালী কহিল, রাজু তোমরা আমরা ভাই। তোমরা বড় ভাই, আমরা ছোট।

শিবনাথ, দক্ষিণা, রাজেশ্বর সকলেই এবার হাসিয়া ফেলিলেন। রাজেশ্বর বলিল, শুধু আমার দ্বারা হবে না। আপনাদেরও থাকতে হবে। মুসলমানেরা চান শুধু টাকা দিলেই হবে না, চাটুয্যে মশাইকে ক্ষমা চাইতে হবে।

শিবনাথ বলিলেন, কিন্তু তিনি ত' দেশে নেই। কোথায় আছেন তাও কেহ জানে না।

কথাটা ঠিক। চাটুয্যের স্ত্রী পুত্রেরাও তার খবর জানিত না। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস অন্য রূপ। তাদের ধারণা ভুঁইয়ারা তাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

রাজেশ্বর সেই রাত্রেই গ্রামে গ্রামে জাত-ভাইদের বলিয়া পাঠাইল, গোলমাল যদি না মেটে তাহা হইলে ভদ্রলোকদের পিছনে তাহাদেরও দাঁড়াইতে হইবে।

আর ভদ্রলোকদের বলিল, দেখবেন শেষটায় ডুবিয়ে দেবেন না কিন্তু।

আগেও দু'একবার এইরূপ হইয়াছে। নমঃশূদ্রদের নামাইয়া দিয়া বাবুরা সরিয়া পড়িয়াছেন, এমন কি তাদের বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছেন।

নমঃশূদ্ররাই সংখ্যা গরিষ্ঠ, তারা সাহসী, লাঠি ধরিতে জানে। কিন্তু লাঠির দরকার হইল না। গোলমাল তাড়াতাড়ি মিটিয়া গেল। টাকার জন্য জামিন হইল রাজেশ্বর। তার সঙ্গে শিবনাথও নবীন চাটুয্যের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

রাজেশ্বরের জয় জয়কার পড়িল। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা হিন্দু মুসলমান সকলে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। করালী রাজেশ্বরকে বলিল, একেই বলে রাজস্য়, বোঝলা রাজু ?

রাজেশ্বরের প্রশংসায় টগরের চোখ জলে ভরিয়া গেল। বুকের মধ্যে সে অনুভব করিল একটা অপূর্ব স্পন্দন।

তার মনে হইল, বয়স ত' চল্লিশ হতে চলল। এ বয়সে এ আবার কি ?

অমলা লিখিয়াছে, কাল ঢাকা থেকে এসেছি। আসছে কাল আপনি হয় ত' এই চিঠি পাবেন। কখন পাবেন জানি না সেই জন্য পরশু আসতে লিখছি। পরশু বিকেলে উপরের ঠিকানায় একবার আসবেন। পাচটা আন্দাজ এলে ভাল হয়। ইতি—অমলা।

পুঃ-আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন। আপনাকে সেই মাছ পাতুরি বেঁধে খাইয়েছিলাম, সবিতাদির বাড়ীতে।

এক বৎসরের উপর পরিচয়। মহেশ্বরের এর মধ্যে অনেকবার •ইচ্ছা' হইয়াছে অমলার খবর নেয়, তার কাছে চিঠি লেখে। সে কখনও আশা করে নাই যে অমলা নিজ হইতে তাহাকে চিঠি লিখিবে। তাই এই পত্র পাইয়া তার খুব আনন্দ হইল। বালিগঞ্জের ঠিকানা, রেল ষ্টেশন হইতে বাড়ীটা বেশ একটু দূর। পথ না জানা থাকায় খুঁজিয়া লইতে সময় লাগিল।

পুরাপুরি সাহেবপাড়া। কম্পাউণ্ডওয়ালা বড় বড় বাড়ী। সাহেব ও মেমেরা ল্যানে টেনিস খেলে। ধবধবে ছোট ছোট শিশুগুলি ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়ায়। সহিসরা ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া লইয়া টহল দিতে বাহির হইয়াছে। বাড়ীগুলি ফাঁকা ফাঁকা, কম্পাউণ্ডের মধ্যে পুকুর, বাগান, ফুলগাছ। বিরাট নগরীর পাশে ধনী শ্রেণী এইখানে পল্লীর স্নিগ্ধ মাধুর্য উপভোগ করে। মাঝে মঝে পিওনোর শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

মহেশ্বর চিঠি খুলিয়া আবার ঠিকানা দেখিয়া লইল। হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে, বাড়ী না যেন প্রাসাদ। ফটকের ডাইনে পাথরের

উপরে লেখা Dilkhusa, বাঁয়ে ছোট কাঠের বোর্ডে, Mr. J. N. Kakati.

জ্যোৎস্না নাথ ককাটি কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার; মহেশ্বর আগেই তার নাম শুনিয়াছিল। তিনি যে অমলার মেসো হন তাহাও জানিত। কিন্তু এত বড় বাড়ীতে মহেশ্বর এর আগে কখনও ঢোকে নাই। সাহেবী ধরনের আদব কায়দা সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা ছিল না তাই দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ফুলের কেয়ারি ও লাল সুরকির ছোট ছোট রাস্তা, ফটকের ডাইনে লনের পশ্চিমে বাঁশঝাড়, তার নীচে একজোড়া ময়ূর ঘুরিতেছে। ময়ূর তার প্রিয়ার চোখে নিজেকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চায়। এক একবার পেখম ধরে আর ময়ূরীর সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বাঁয়ে একটা পুকুর তার পর বিশাল অট্টালিকা, তার প্রতিটি জানালায় ধবধবে সাদা পর্দা।

মহেশ্বর দারোয়ানের ঘরের সামনে রাস্তার উপর খানিকক্ষণ পায়চারি করার পর অমলাকে দেখিতে পাইল, তার সঙ্গে আর একটি তরুণী।

মহেশ্বরকে দেখিয়া অমলা ফটকের নিকটে আসিয়া বলিল, এই যে আসুন। কত ক্ষণ অপেক্ষা করছেন?

মহেশ্বর বলিল, বেশী সময় নয়—এই একটু আগে এসেছি।

দারোয়ানকে দিয়ে খবর দেননি কেন? এখনও সেই লজ্জা—বলিয়া অমলা একটু হাসিল। তারপর বলিল, চেনেন এঁকে? আমাদের সুপ্রভাদিকে?

মহেশ্বর মেয়েটির দিকে চাহিল। তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, গড়নের মধ্যে একটু লালিত্য আছে, বাহু ও গণ্ডদেশ নরম ও কোমল, মনে হয় প্রকৃতিও শান্ত, স্নিগ্ধ। মোটের উপর চেহারা মন্দ নয়। কিন্তু তাকে সুন্দরী বলা চলে না। বিশেষতঃ অমলার সামনে মেয়েটিকে

নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। মুখখানা মহেশ্বরের পরিচিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কোথায় যে দেখিয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

পুকুরের দুইটা দিক ঘুরিয়া বাড়ীতে যাইতে হয়। পারে ফুল ও পাতাবাহারের গাছ, জলে টুকটুকে লাল শালুক, তাদের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুটি সাদা হাঁস সাঁতার কাটে।

করিডরের নীচে একখানা বড় মোটর গাড়ী, পাশে দাঁড়াইয়া লাল পোশাক পরা তকমা আঁটা পাগড়িওয়ালা চাপরাসী। গাড়ীর চেয়েও লোকটি জমকালো। অমলা বলিল, মিষ্টার জষ্টিস্ ইব্রাহিমের গাড়ী, আর তাঁরই চাপরাসী। ইব্রাহিম সাহেব মেসো মশাইর বিশেষ বন্ধু। জষ্টিস্ কথাটার উপর অমলা যেন একটু অনাবশ্যক জোর দিল।

করিডরের পরেই বড় একখানা ঘর। তার উত্তর পশ্চিম কোণে দ্বিতলে যাইবার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাঝখানে পুরানো গালিচা পাতা। এই ঘরের আসবাবপত্র নিতান্তই সাদাসিধা ধরনের, কাঠের পুরানো চেয়ার, অযত্ন রক্ষিত সোফা, বার্ণিশ উঠিয়া যাওয়া টেবিল—মনে হয় স্থানটি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য নয়। ল্যনে, পুকুর পারে, চারিদিকে আলো ঝলমল করে, অথচ ঘরখানা এর মধ্যেই অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলি ভাল দেখা যায় না।

এই আধ-অন্ধকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মহেশ্বর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। একটু পরে টেবিলের তলা হইতে একখানা মুখ বাহির হইল, একটি পাহাড়ী চাকরের মুখ, তার ছোট চোখ দুইটা দিয়া সে ফ্যালফ্যাল করিয়া মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রোঁয়া-তোলা, নাক খাঁদা একটা কুকুর ভৃত্যটির মুখে মুখ ঘষিতেছে। পাহাড়ীটা তার মুখে চুমা খাইল।

কুকুরও অকৃতজ্ঞ নয়, সে প্রভুর নাকে একটি কামড় দিয়া বার দুই ঘেউ ঘেউ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। ভৃত্য তাকে আদর

করিল, বাঃ বলডুন, বাঃ। তারপর মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, কিসিকো মাংতে?

মহেশ্বর বলিল, মিস্ অমলা রায়।

ও—ডাক্তাওয়ালী, বলিয়া পাহাড়ীটা আবার টেবিলের তলায় মুখ লুকাইল।

অমলার পরনে লাল শাড়ী, পায়ে সাদা জুতা, সিঁড়ি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে নামিয়া আসে। সে জানে লাল শাড়ীতে তাকে অপূর্ব দেখায়। তার প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পায় সেই আত্মবিশ্বাস। প্রথম যৌবনের লঘু চপলতা তার ঐ রূপ, তার ভঙ্গী, মহেশ্বরের চোখে ধাঁধা লাগায়।

অমলা তার কাছে আসিয়া বলে, চলুন এবার বেড়িয়ে আসি।

প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ আশাতীত। মহেশ্বর বিস্মিত ভাবে বলিল, বেড়াতে! তা বেশ, চলুন।

বাহিরে আসিয়াই অমলা প্রথমে বলিল, কেমন, আপনাকে অবাক করে দেই নি? আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন নি যে আমি এ রকম প্রস্তাব করব?

তা করি নি মিস্ রায়।

মিস্ রায় কেন? আমাকে অমলা বলবেন। বয়সে আমি আপনার চেয়ে ছোটই হব।

মহেশ্বর হাসিয়া বলিল, ক্রমে ক্রমে হবে। একদিনেই নাম ধরে ডাকি কি করে? আচ্ছা, আমরা বেরিয়ে আসায় ওঁরা কিছু মনে করেন নি?

কারা?

মিষ্টার ককাটি এবং আপনার মাসীমা।

মনে করবেন না বলেই ত' এখানে উঠেছি। মেসো মশাই মক্কেল ও ব্রিফ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাসীমা বাতে শয্যাশায়ী।

আপনার মাসতুত ভাইবোন নেই ?

না।

কথায় কথায় অমলা বলিল, মেসো মশাই সেদিন হাইকোর্টের জজিয়তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন পুওর ইনকম, ওতে খরচা পোষায় না।

সরু গলি, কোথায়ও পুকুরের পাড়, কোথাও বা চাষী গৃহস্থের উঠানের উপর দিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বালিগঞ্জের রেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। মহেশ্বর বলিল, এদিকের রাস্তা দেখছি আপনার চেনা।

চিনেছি সবে এই সে দিন। প্যাট্রে চিনিয়েছে। এর আগে এদিকে কখনও আসিনি। Don t be jealous সে একজন ইয়ং ফ্রেণ্ড, নাম পতিত রায়। এ পাড়ায় সবাই তাকে ডাকে প্যাট্রে বলে। আজ তাকে আসতে নিষেধ করে পাঠিয়েছি, ভাল লাগলে অবশ্য করতুম না।

মহেশ্বর বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চাহিল। অমলা বলিল, আমি সত্যি কথা বলি কিনা তাই লোকে অবাক হয়ে যায়।

বজবজের লাইন ধরিয়া তারা পশ্চিম দিকে চলিল। তখনও লেক হয় নাই, নূতন বালিগঞ্জ গড়িয়া ওঠে নাই। লাইনের নীচ দিয়া উত্তর দক্ষিণমুখী দু তিনটা রাস্তা গিয়াছে, একটা গরিয়াহাটা। দুধারেই ঘন জঙ্গল ও ধেনো জমি। উঁচু লাইনের পাশে পাশে পানা ও শেওলায় বোঝাই ছোট ছোট জলাশয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় গৃহস্থের কুঁড়ে ঘর বা টিনের চালা, উঠানে লাউ কুমড়ার মাচা। চারধারে শান্ত নীরবতা ও স্নিগ্ধ পল্লীশ্রী।

এর মাঝে অমলা হরিণীর মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। আঁশ-শেওড়ার ডাল ভাঙে, লাইনের উপর হইতে পাথরের টুকরা তুলিয়া বলে, আসুন দুজনেই আমরা পাথর ছুঁড়ি, দেখি কারটা দূরে যায়।

পারেন ঐ গাছটা লক্ষ্য করে মারতে? ঐ টুকটুকে লাল ফলটা ফেলতে হবে। কি ফল বলুন তো?

সে একবার স্লিপারের উপর দিয়া মার্চ করিতে আরম্ভ করিল, ওয়ান, টু, থ্রি। বলিল, আপনিও আমার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলুন।

পড়ন্ত সূর্যের আলো আসিয়া অমলার মুখের উপর পড়ে। তার আরক্তিম গণ্ডদেশ লাল ডালিমের মতন দেখায়। ছুটাছুটি করিতে করিতে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। অমলা বলে, এবার বসুন একটু।

পাশাপাশি বসিয়া নিজেদের অজ্ঞাতেই একে অপরের হাতে হাত রাখে। ধীরে ধীরে পরস্পরের হাতে চাপ দিতে থাকে। কথায় কথায় অমলা বলে, আপনি ভাল ছেলে, বিলেতে গেলেন না কেন?

মহেশ্বর বলিল, আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাবা আপত্তি করলেন।

কেন? ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চাইলেন না?

বাবা, ত্রিগুণা কাকা—এঁরা বলেন এ দেশেও মানুষ যথেষ্ট বড় হতে পারে।

কিন্তু আপত্তির কারণ কি?

ওঁদের ধারণা বিলাতে গিয়ে অনেকেই চরিত্র ঠিক রাখতে পারে না।

ওর কোন মানে নেই।

আমারও সেই বিশ্বাস। কিন্তু ত্রিগুণা কাকাই বেশী অমত করলেন। তাঁর অমতে বাবা কিছুই করেন না।

আপনি জোর করলেই পারতেন।

মহেশ্বর বলিল, জোর! বাবার অমতে?

এই উত্তরে অমলা একটু হাসিল।

গাছপালার উপর হইতে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসে। মহেশ্বর বলে, চলুন, এইবার ফেরা যাক।

অমলা উত্তর করিল, বসুন না একটু, এখুনি চাঁদ উঠবে।

চাঁদের আলোয় দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। মাটির বুকে রেল লাইন পড়িয়া আছে যেন দুটা অজগর সাপ, মাঝে পাথরের টুকরাগুলি মণির মতন চিক চিক্ করে।

অমলা জিজ্ঞসা করিল, আপনার ভাল লাগে না এমন চাঁদিনী রাত ?

জ্যোৎস্না এমনিই মহেশ্বরের ভাল লাগে। আজকের এই জ্যোৎস্না-লোকিত সন্ধ্যা আরও বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছিল।

তাদের চলার পথে হঠাৎ বজবজের গাড়ী আসিয়া পড়িল। ইঞ্জিনের ডাগব দুটা রক্ত চক্ষু একেবারে সামনেই জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। অমলা খপ্ করিয়া মহেশ্বরের হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, আসুন আমরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

এ কী পাগলামি ! মহেশ্বর বলে, গাড়ী এসে পড়ল যে !

সেই জন্যই ত' দাঁড়িয়েছি—বলিয়া অমলা হাসিতে আরম্ভ করিল।

মহেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাকে পাঁজা কোলে করিয়া লাইনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর হাওয়া দুজনের কপাল স্পর্শ করিল। একটা খোলা কামরার দরজা আর একটু হইলে মহেশ্বরের কনুইএ লাগিয়া যাইত।

বাহুতে যে তার এত বল মহেশ্বর এমন করিয়া তাহা কখনও অনুভব করে নাই। একটি নারীকে বুকের মধ্যে পাইয়া যৌবনের শক্তি উপলব্ধি করিল আজ এই প্রথম। সে মাথা নীচু করিয়া অমলাকে চুমা খাইতে গেলে অমলা তার মুখখানাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ঠিক এই সময় শোনা গেল একটা অট্টহাস্য, বিদ্রূপ মিশ্রিত ক্রুর সে হাসি। মহেশ্বর চাহিয়া দেখে কাছেই দুইটি লোক দাঁড়াইয়া।

দুইটি বিকট মূর্তি। মাটির বুক চিরিয়া যেন খাড়া হইয়াছে। তাদের মধ্যে কৃশ লোকটি বলিল, আমাদেরও ভাগ দিতে হবে।

মহেশ্বর গর্জিয়া উঠিল, মুখ সামলে কথা বল।

অপর লোকটি বেশ পালোয়ান গোছের, সে হিন্দী মিশ্রিত বাংলায় বলিল, রাগ করছ কেন ভায়া? তোমারও কিছু বিয়ে করা পরিবার নয়, ভাগ দিতে আর আপত্তি কি? এমন খাসা চিজ—বলিয়াই সে কুৎসিত একটা শব্দ করিল।

মহেশ্বর লোকটার উপর লাফাইয়া পড়িল। এবার চলিল অসমান যুদ্ধ। দুইটি পেশাদার গুণ্ডা, অপর দিকে শিক্ষিত এক বাঙ্গালী তরুণ। মহেশ্বর কখনও ঘুষি চালায়, কখনও লাথি মারে। সিংহশাবক যেমন করিয়া বিরাটাকার মহিষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তার পরাক্রম ঠিক তেমনি। যে ভাবে হোক অমলার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে আর কোন দিকে খেয়াল নাই। আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য নাই।

অমলার সর্ব শরীর তখন কাঁপিতেছিল। মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টিতে সে তার দিকে চাহিয়া রহিল। এই সেই লাজুক মহেশ্বর, নিতান্তই ভাল মানুষটি, তার মধ্যে যে এমন একজন সাহসী পুরুষ থাকিতে পারে এ কল্পনাও সে করে নাই।

মহেশ্বর জুজুৎসু জানিত। সুবিধা পাইয়া বলবান লোকটার কব্জির নীচে টিপিয়া ধরিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ছোড় দেও, ছোড় দেও। তার যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সঙ্গীটি আর আগাইয়া আসিল না। মহেশ্বর ছাড়িয়া দিলে জোয়ান লোকটা শের কো বাচ্চা হ্যায় বলিতে বলিতে সঙ্গীকে লইয়া গা ঢাকা দিল।

অমলার মান রক্ষা হইল। সে এবার কাছে আসিয়া মহেশ্বরের হাত ধরিয়া বলিল, তুমি এত বড়। এ কী, এত রক্ত যে—

মহেশ্বরের কপাল বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। অমলা পাশের একটা ডোবায় রুমাল ভিজাইয়া আনিয়া তার কপালে চাপিয়া ধরিল। মহেশ্বরের ক্ষত ঐ একটাই নয়, কনুইয়ে কব্জিতে হাঁটুতে ছোট ছোট অনেকগুলি।

কাছে কোন লোকালয় নাই, যানবাহনও নাই। অমলার শরীরে ভর করিয়া মহেশ্বর কোন রকমে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিল। এক দোকানে যাইয়া ঢক ঢক করিয়া দু গ্লাস জল খাইয়া তার মনে হইল যেন আসন্ন মূর্চ্ছার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ষ্টেশনে আসিয়া তারা ঠিকা গাড়ী করে। অমলা পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলায়। কী সুন্দর তার স্পর্শ, কী কোমল। মহেশ্বরের চোখ বুজিয়া আসে। কেহই কোন কথা বলে না, বলার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। অমলা ধীরে ধীরে মহেশ্বরের মাথাটা তার বুকে টানিয়া নেয়। গাড়ী ককাটির বাড়ীর কাছে আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, একা যেতে পাববে ত' ?

মহেশ্বর বলিল, হ্যাঁ পারব।

অমলা দিলখুসার একটু আগে নামিয়া গেল। দূরে দূরে গ্যাস। খানিকটা আঁধার আবার আলো। মানুষের সুখ দুঃখে ভরা জীবনের মতন রাজপথের এই আলো ও আঁধার বড় রহস্যময় যেমন রহস্যময় অমলা, রহস্যময় তার যৌবন। নারীর স্পর্শে যৌবন রহস্যের প্রথম উপলব্ধি মহেশ্বরকে যথেষ্ট মূল্য দিয়াই অর্জ্জন করিতে হইল। কিন্তু সেজন্য তার কোন ক্ষোভ ছিল না।

আশ্চর্য এই অমলা, কতটুকুই বা তার সঙ্গে পরিচয়, কয়দিনেরই বা দেখা? কিন্তু এই স্বল্পপরিচয়, কতই না ঘটনা-বহুল। নাটকের দৃশ্যের মতন সেইগুলি একটির পর একটি করিয়া তার চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

ত্রিগুণার বাড়ীতে খাওয়া হয় রাত নটায়। সবিতা কলে গেলে ত্রিগুণা তার জন্য আধঘণ্টা অপেক্ষা করে। আজ মহেশ্বরের জন্য আধ ঘণ্টা দেরি করিয়া তারা খাইতে বসিল। সে বাড়ী ফিরিতে কখনও দেরি করে না। নিশ্চয়ই কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া তারা চিন্তিত হইল।

খাওয়ার পর ত্রিগুণা প্রার্থনায় বসিবে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, মহিষ বাবুকা বহুৎ বিমার, খুন গিবতা।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। দেখিল মহেশ্বরের মুখের উপর শুকনা রক্তের দুইটা ধারা। জমাট বাঁধা রক্তে জড়ানো কতকগুলি চুল, মুখে তীব্র বেদনার ছাপ, চোখ দুটি ঘোলাটে।

সবিতা কপালে হাত দিয়া দেখিল জ্বর হইয়াছে। তখনই সে এ্যান্টিসেপটিক লোসন দিয়া ক্ষতগুলি ধুইয়া দিল, খাইতে দিল গরম দুধ ও ব্র্যাণ্ডি।

ত্রিগুণা সমস্ত রাত মহেশ্বরের বিছানার পাশে বসিয়া রহিল। সবিতা মায়ের মতন সেবা করিল। এত যত্ন, এমন নিপুণ সেবা তার বাড়ীতেও হইত কিনা সন্দেহ।

মহেশ্বর বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে, তন্দ্রার ঘোরে এক একবার কি যেন বলিয়া ওঠে। দুবার স্পষ্ট শোনা যায় অমলার নাম। শুনিয়া স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

পরদিন সকালে মহেশ্বর খানিকটা সুস্থ বোধ করে। ত্রিগুণাকাকা ও কাকীমা কাল রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করায় সে বিস্মিত হয়। আবার ভাবে ভালই হইয়াছে। তারা প্রশ্ন করিলে কী বিপদই না হইত।

তাদের স্বামী-স্ত্রীতে কিন্তু এ বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। মহেশ্বরের উপর ত্রিগুণার অগাধ বিশ্বাস। সে বলে, কিছু জিজ্ঞাসা করে কাজ

নেই। লজ্জা পাবে। সভা সমিতি কিংবা ক্লাবে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। ও বয়সে এ রকম হয়।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলে উঁ হু। তা ছাড়া ঘুমের মধ্যে অমলার নাম করল কেন?

ত্রিগুণা উত্তর করে মনের নিভৃত কোণে হয়ত অমলার ছাপ পড়েছে। সাইকো-এ্যানলিষ্টদের মতে ওটা তারই অভিব্যক্তি।

ত্রিগুণার বিশেষ মত না থাকায় সবিতা এ সম্বন্ধে মহেশ্বরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বৈকালে মহেশ্বরের মনে হইল প্যাট রের কথা। তাকে লইয়া অমলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। রোজই যায়। মধ্যে শুধু একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। আচ্ছা, এই প্যাট্ রে বা পতিত রায়টি কে! কি তাদের সম্পর্ক?

মহেশ্বর রোজই আশা করিত অমলা তার খোঁজ লইবে। রোজই তাকে নিরাশ হইতে হইত। চতুর্থ দিন বৈকালে সুপ্রভা আসিল। তখন সবিতা ও ত্রিগুণা বাড়ী ছিল না।

কি ভাবে সুপ্রভাকে অভ্যর্থনা করিবে, প্রথমে কি বলিবে মহেশ্বর এই সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সুপ্রভারও বাধ বাধ ঠেকিল। এরূপ হইবে জানিলে সে হয়ত আসিত না। শেষটায় মহেশ্বরই প্রথম কথা বলিল, নমস্কার, বসুন। ভাল আছেন আপনারা?

হ্যাঁ, পরশু অমলা এটোয়া চলে গেছে। বলে গেছে আপনার খবর নিয়ে চিঠি লিখতে।

অমলা চলে গেছে? একবার ও—মহেশ্বর কথাটা আর শেষ করিল না। সে ভাবিল হয়ত দেখা করায় তার অসুবিধা ছিল। কিন্তু তার কোন খবর না লইয়াই অমলা চলিয়া গেল। আশ্চর্য! মহেশ্বর বলিল, লিখে দেবেন, আমি অনেকটা ভাল আছি।

খানিক্ষণ নীরব থাকার পর সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি কি সিটি কলেজে পড়তেন ?

সুপ্রভা বলিল, হ্যাঁ।

আপনাকে সেখানে দেখেছি। প্রায়ই যেতাম কিনা একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

সুপ্রভা বলিল, তাই আপনাকে সেদিন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি যেতেন বোধ হয় গৌতমশঙ্কর মজুমদারের কাছে।

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

তিনি ছিলেন আমাদের ক্লাশের সব চেয়ে ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে। তাঁর পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় প্রফেসররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। তিনি এখন কচ্ছেন কি ?

মহেশ্বর বলিল, জানি না। তার সঙ্গে দেখা হয়নি প্রায় এক বছর।

উঠিল পড়াশুনার কথা। দুজনেই এম এ পড়ে, মহেশ্বর ইংরাজীতে সুপ্রভা দর্শনে। এম এর পাঠ্য, কে কোন স্পেশাল পেপার নিয়াছে, কোন্ প্রফেসর কিরূপ পড়ান, এই সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হইল।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মিসেস্ ককাটি কেমন আছেন ?

প্রায় একই রকম। উনি বার মেসে রোগী। ভারী কষ্ট পান। বলিয়া সুপ্রভা তাঁর সুখ্যাতি করিল, অত্যন্ত বিনয়ী। নিতান্তই সাদাসিধে ধরনের মানুষ। গোপন দান তাঁর অনেক। এই যে আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি, এও তাঁরই দয়ায়।

মহেশ্বর বলিল, তিনি তো আপনার আত্মীয় হন।

আত্মীয়তা কিছুই নেই। সুবাদে মাসীমা হন যেমন অমলার।

মহেশ্বর বিস্মিত হইল। মিসেস্ ককাটি সুবাদে অমলার মাসীমা হন। অথচ কতবার কত ভাবেই না সে এই আত্মীয়তার গল্প করিয়াছে।

চাকর চা লইয়া আসিল। অনেক অনুরোধের পর সুপ্রভা চায়ের কাপে দুইটা চুমুক দিল। সে চলিয়া গেলে মহেশ্বরের মনে হইল অমলার ঠিকানা না রাখিয়া ভুল করিয়াছে।

কয়েকদিন পরে সুপ্রভার মারফৎ অমলার চিঠি আসিল।

প্রভাদির পত্রে জানলাম তিনি তোমায় অনেকটা সুস্থ দেখে এসেছেন। আশা করি এত দিনে সেরে উঠেছ। তোমায় দেখতে যাইনি বলে হয়ত ভেবেছ, মেয়েটা কী অকৃতজ্ঞ। কিন্তু যে জন্য ঢাকা থেকে এসে ঐ বাড়ীতে উঠিনি, দেখতেও যাইনি সেই একই কারণে। ব্রাহ্ম হলেও জামাই বাবু ও দিদি, সেকেলে ধরনের। একটু বেশী রকমের নীতিবাগীশ। আশা করি এর বেশী কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে না।

মায়ের হাতে আমাদের চিঠি পড়তে পারে এই ভয়ে এটোয়ার ঠিকানা তোমায় দিলাম না। সুপ্রভা দিকে খবর জানিয়ো, তিনিই আমায় লিখবেন।

মহেশ্বর যে তাকে ভুল বিচার করে নাই তা নয়। অমলা এমন মেয়ে যে সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে তাকে ভুল বোঝাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার আকর্ষণ—যেমন আকর্ষণ তার রূপের। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে মহেশ্বরের চোখে পড়িল সেদিনকার খবরের কাগজের একটা শিরোনামা—

"গচাপাড়ায় স্বদেশী ডাকাতি।"

গত বৃহস্পতিবার নেপালপুর থানার অন্তর্গত গচাপাড়ায় বিখ্যাত ধনী সতীশ সাহার বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা নগদে ও গহনায় প্রায় লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিতে করিতে তারা বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ঐ ভাবেই বাহির হইয়া যায়। নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলে! মেয়েদের প্রত্যেককে মা বলিয়া ডাকে। তাদের হাতে

আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় গ্রামবাসীরা বাধা দিতে পারে নাই। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে। কোন আসামী এখনও ধরা পড়ে নাই। তবে কর্তৃপক্ষের ধারণা—এই ডাকাতি ভদ্রশ্রেণীর যুবকদেরই কাজ।

খবরটা পড়িয়া মহেশ্বরের কেনই যেন মনে হইল গৌতম এই দলে আছে। এই জন্যই সেবার সে তাদের দেশের পথ ঘাট সম্বন্ধে অতখানি কৌতুহল প্রকাশ করিয়াছিল। কিছুদিন আগেও মহেশ্বরের অনুপস্থিতে সে একবার মঞ্জরী ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেখানে ছিলও কয়েকদিন। অথচ কলিকাতায় মহেশ্বরের সঙ্গে একবার দেখা করার সে সময় পায় না।

আজ প্রায় এক বৎসর তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

গৌতমের জন্য তার দুঃখ করিতে লাগিল। তার ঠিকানা মহেশ্বর জানে না। জানিলে আর একবার নিষেধ করিয়া আসিত। বলিত, ও পথটা ছেড়ে দাও ভাই।

রাজেশ্বর জেলা বোর্ডের সভ্য, পরগনার স্বজাতীয়দের মধ্যে সব চেয়ে ধনী। মানপ্রতিপত্তি তার যথেষ্ট, কিন্তু খালি দেশ লইয়া থাকা আর চলে না। কলিকাতায় কাপড়ের দোকান দিন দিন বড় হইতেছে, কিছুদিন হইল সে বেলেঘাটায় আড়ত খুলিয়াছে। এখন তার পক্ষে কলিকাতায় থাকা দরকার।

বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশ কিন্তু সে মনে করে জীবনের কাজ সবে ত' এই শুরু হইল, বাকী এখনও অনেক কিছুই। রাজধানীর বড় বড় রাস্তাগুলি দেখে আর ভাবে, এই চওড়া সড়কই লক্ষ্মীর আসিবার প্রশস্ত পথ। এই পথ দিয়া তিনি যে দিন তার ঘরে আসিবেন সেই দিনই হইবে জীবনের সার্থকতা।

পূর্বেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইত, যাওয়া হয় নাই শুধু প্রকাশ মিস্ত্রীর গোলমালের জন্য। ঐ সুযোগে তার শ্যালকরাও তাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মহেশ্বর থাকে ব্রাহ্ম বাড়ীতে, নীচ জাতি যত সব ডোম, হাড়ী মুচির ছোঁয়া খায়। খায় সর্ব প্রকারের অখাদ্য। এ সব উপেক্ষা করা সমাজের অকল্যাণকর।

কিন্তু হিন্দু মুসলমানের গোলমাল মিটাইয়া দিবার পর রাজেশ্বরের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ঈশানরা বুঝিল যে এখন তার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে গেলে নিজেদেরই অপদস্থ হইতে হইবে।

দেশের সব কাজ কর্মের বিলি ব্যবস্থা করিয়া রাজেশ্বর মহেশ্বরকে বাড়ী ভাড়া করার জন্য লিখিল, ঘরগুলিতে যেন আলো বাতাস থাকে

আর বাসাটা হয় ত্রিগুণার বাসার কাছাকাছি অথচ গঙ্গার চেয়েও বেশী দূরে নয়।

মহেশ্বরের চিঠি আসিলে জ্যোতিষীকে দিয়া দিন দেখানো হইল। ঠিক হইল দেশে থাকিবে তারকেশ্বর। জমি জমা কাজ কর্ম সকলই সে দেখিবে। তাকে সাহায্য করিবে ব্রজবাসীরা দুই ভাই ও পরশুরাম।

দেশে থাকিতে তারকেব অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে বিষয় দেখিবে, পরিশ্রম করিবে আর দশ বছব পরে বিদেশ হইতে ভাইরা আসিয়া ভাগীদার হইয়া দাঁড়াইবে, এ জিনিসটা তার ভারী অপছন্দ। পূর্বে সে একবার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল, কোন্ কোন্ জমি আর কারবার আমার তা ঠিক করে দাও।

রাজেশ্বর সেই বুঝিয়াই এবার নিজ হইতে বলিল, কাজ কর্ম মন দিয়ে কব। ভাগাভাগির কথা এখনো ভেবো না। আমার ব্যবস্থায় কারোই লোকসান হবে না।

অন্য কেহ হইলে নিশ্চয়ই ইহাতে লজ্জা বোধ করিত কিন্তু তারকেশ্বব সে পাত্রই নয়। সে বলিল, খাটছি কিন্তু আমিই বাবা, ওরা ত' লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

রাজেশ্বর একটু হাসিল।

সে কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া অনেকেই দুঃখিত হইল। গরিবদের দুর্ভাবনা বাড়িল। বাকীতে জিনিস পাইতে হইলে তার দোকানেই ছুটিয়া যাইতে হয়। রাত দুপুরে কারো অসুখ—ডাক্তারের ফি ও ইন্‌জেকসনের দাম দিতে হইবে, যাও রাজেশ্বরের কাছে, সে বিমুখ করিবে না। শুধু মজুরীর নয়, দূর দূরান্তের অন্ধ আতুর দুঃস্থেরা তার কাছে সাহায্য পায়। তার ধারণা এক পয়সা দান করিলে ভগবান দাতাকে চার পয়সা দেন, একটা মিষ্ট কথায় দশটা মিষ্ট কথা ফিরাইয়া আনে। এই ভাবে মানুষের মধ্য দিয়াই মানুষের আশীর্বাদ আসে। শস্তের পক্ষে

রৌদ্র বৃষ্টির মতন মানুষের পক্ষেও দরকার অপর পাঁচটা মানুষের শুভেচ্ছা।

সে কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া অনেকেই বলিল, তুমি তো চললা মণ্ডল, ভগবান তোমারে কত বড় করছেন, মঞ্জরীর বিলে আর তোমাব পোষাবে কেন? কিন্তু আমারগো উপায়?

রাজেশ্বর বলিল, কোন ভাবনা নেই, আমি না থাকলেও সব আগেরই মতন চলবে।

কিন্তু কেহই ভরসা পাইল না। তারকেশ্বরকে তারা চেনে। বাপ এক টাকা দিতে বলিলে সে চার আনা দিয়া বিদায় করিতে চায়। রাজেশ্বরের সামনেই যখন এই অবস্থা তখন তার অনুপস্থিতিতে তারকেশ্বরের কাছে কড়া কথা ছাড়া আর কিছু জুটিবে না। ইহাই সকলের বিশ্বাস। লোকে বলে, তারকয়া যেন বিশ্বকর্মার পুতুর ছুঁচুয়া।

আজ রাজেশ্বর রওনা হইবে। বাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। গ্রামের নমঃশূদ্রদের ছেলে বুড়া প্রায় সকলেই আসিয়াছে। ভদ্রলোকও অনেকে। অনুরোধ নানা রকম, কেহ পরের মাসে পাওনা চুকাইয়া দিবে। কারও বা এ মাসে গহনা খালাস করবার কথা ছিল। টাকার যোগাড় হয় নাই আরও সময় চাই। শহরবাসীর মা কুঞ্জসখী ধরিয়াছে, আমার শহররে একটু কলিকাতার শহরে নিয়া যাও, বাজু।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় গিয়ে সে কি করবে?

কলিকাতায় শুনছি অনেক বড় লোকের বাস, তুমি তারগো এক জনরে কইয়া দিও, তা হৈলেও অন্ততঃ একটা পেয়াদাগিরি জোটবে, না হৈলে ত' সকল গুষ্টি উপাস কবিয়া মবব।

কটাইর পুত্র গড়াই মহাশয় তার পুত্র চড়ুইকে লইয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে একটা বোঁচকা।

গড়াই বলিল, আমার ছাওয়ালডিরে নিয়া যাইতে হইবে। অর চেহারাডা হস্তীর মতন, কিন্তু খোরাক ইন্দুরের। তোমার বাড়ীতে রাখবা, তোমার কাজ কর্ম করবে, দুইটি খাবে তোমার ওখানে। তোমারগো পাতে যা পড়িয়া থাকবে তাই যথেষ্ট।

রাজেশ্বর অনেক আপত্তি করিল কিন্তু গড়াই নাছোড়বান্দা। সে বলিল, তুমি আমার ভগ্নীরে বিয়া করতে রাজী হও নাই, তখন বাবা একটু বিরক্ত হইছিল। তার পরের থা তোমারে ভারী পেয়ার করত। আর আমরা ত' তোমার ছায়ার মতন।

কথাটা ঠিকই। সর্বকার্যে সর্বক্ষণ ওই মহাশয় বংশ তাকে সমর্থন করে। শেষটায় রাজেশ্বর বলিল, আচ্ছা চলুক।

কাহারও পুত্র উত্তরপাড়ায় কাজ করে, তাহাকে চিঠি দিতে হইবে। কারও ভাই টালিগঞ্জে থাকে, সে আসিয়াছে চিঁড়া ও বাতাসা লইয়া। সকলেরই মুখে এক কথা তোমার বাসার কাছেই হবে। একটু কেলেশ করিয়া পৌছাইয়া দিও।

ঘটের উপর আম্রপল্লব। রাজেশ্বর পিঁড়ায় বসিয়া, পাশে পুরোহিত গুপী ঠাকুর। গুপী বলিলেন, চাদরখানা একটু জড়িয়ে বস। শাস্ত্রে আছে, উত্তরীয়ং জড়েৎ। রাজেশ্বর চাদর ভাল করিয়া জড়াইলে গুপী কহিলেন, বল,

অহল্যাং দ্রোপদীং কুন্তীং খনাং লীলাবতীং সতীং
যাত্রাং বিঘ্ন বিনাশস্তু দক্ষিণাং রৌপ্য খণ্ডকং।

মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, দক্ষিণা কত?

গুপী বলিলেন, যাদৃশী যস্ত যা রুচি—তুমি বড়লোক, তোমার যেরূপ অভিরুচি তাই দাও।

রাজেশ্বর তার পায়ের কাছে পাচটি টাকা রাখিলে পুরোহিত আশীর্বাদ করিলেন—

আশীর্ব্বাদং বংশ বৃদ্ধিং
ধন বৃদ্ধিং স্তথৈব চ
পুত্র বৃদ্ধিং জমির বৃদ্ধিং
সর্ব্ব বৃদ্ধিং ভবিষ্যতি।

তোমার জলজলাট হোক, ধন মান বাড়ুক।

রওনা হইবার জন্য নরেশ্বর এবং বীরেশ্বরও প্রস্তত ছিল। নরেশ্বর পরিয়াছে মুগার পাঞ্জাবি, বীরেশ্বর ভেলভেটের কোট। পিতার পর তারা যাত্রার মন্ত্র পড়িল। দুই ভাই দুইটি টাকা পুরোহিতকে প্রণামী দিল। পুরোহিত ঘটের উপর হইতে ফুল তুলিয়া রাজেশ্বর ও তার কনিষ্ঠ পুত্রের কাপড়ের খুঁটে বাঁধিলেন, তারপর দুঃখীরাম ও তার মা এবং চড়ুইর মাথায় একটি করিয়া ফুল দিলেন।

যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্বাদ সারিয়া নৌকায় ওঠার সময় রাজেশ্বর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। চাঁপা থাকিলে এ দিনটা কত সুখেরই না হইত। কলিকাতায় যাইবার তার ভারী ইচ্ছা ছিল, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কে জানিত যে তার জীবনদীপ অত শীঘ্র নিবিয়া যাইবে?

তখনও অবস্থা সচ্ছল ছিল কিন্তু বর্তমানের তুলনায় সে সচ্ছলতা কিছুই নয়। আজকের কিছুই সে দেখিল না অথচ এ জিনিস গড়িয়া তুলিতে সেও তো সাহায্য বড় কম করে নাই।

নৌকা ছাড়িবার সময়ও অনেকে উপস্থিত ছিল, ছিলেন গুপী ঠাকুর, লোচন মধু, নিশি দাশ, প্রকাশ মিস্ত্রী, মেয়েদের মধ্যে জবা, কুঞ্জলথী, নৃত্যকালী। ছিল না শুধু টগর, সে এই দুইদিন রাজেশ্বরের বাড়ীতে একবারও আসে নাই। রাজেশ্বর আশা করিয়াছিল তার রওনার সময় টগর অন্ততঃ একবার আসিবে।

নৌকা ছাড়িলে জবা চোখ মুছিল। বৃন্দাবন আর থাকিতে পারিল না। লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া বলিল, ইষ্টিমার ঘাট পর্যন্ত আমার

যাওয়া ঠেকায় কোন্—তাবপর জবার উদ্দেশ্যে কহিল, রাত্রেই ফেরুব, মাথারি, কোন কেলেশ করিও না।

জবার সে কথা কানে গেল কিনা সন্দেহ। রাজেশ্বর তাকেই কর্ত্রী করিয়া দিয়াছে তা ঠিক কিন্তু তার অভাবে এ কর্তৃত্বেরও যেন কোন আকর্ষণ নাই।

খালের তুইধারে পুনতি ও ঘুঘরাহাটি মৌজার ভাল জমিগুলি প্রায় সবই রাজেশ্বরের। আউশ ধানের ছোট ছোট চারা সবেমাত্র মাটির তলা হইতে মাথা তুলিয়াছে। দেখিলে মায়া জন্মে। রাজেশ্বরের এই যে ঋদ্ধি, এর মূলে ঐ ফসল, ঐ মাটি। কাজ কারবার সকলেরই গোড়ায় ঐ মাটি আর জমি।

সে চাষীর ছেলে, নিজে চাষী। মাটিকে সে মা বলিয়া জানে। এই মাটি ছাড়িয়া যাইতে তার কষ্ট হইতেছিল। ভিটা, মাটি, চাষের জমি এ সবই তার নিজের অর্জিত—জমি নয় যেন একটা সোনার খনি।

গোপালপুরের অপর পারের কয়েকখানা জমিতে সুন্দর পাট হইয়াছিল। বৃন্দাবন সেই পাট দেখাইয়া কহিল, কী সুন্দর কোষ্টা হইছে, রাজু ভাই। গাছগুলিন আলেপ সেখের গরুর মতন পুরুষ্টু।

ঐ জমির পরই ধানের খেত। খেতও রাজেশ্বরের। সে নৌকার উপর বসিয়াই ডান হাত দিয়া একটু মাটি তুলিয়া কপালে ছোঁয়াইল। নরেশ্বর স্থির করিল, এই সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিবে।

গাঙ দিয়া কত নৌকা যায়, প্রায় সবগুলিই রাজেশ্বরের চেনা। নৌকার লোকেরা ডাকিয়া আলাপ করে, চললা আমাগো ফেলিয়া? সকলেই দুঃখ প্রকাশ করে, কেহ কেহ বলে, এই বিলুয়া দেশ হইল আমারগো গরিবের জন্য। বড় মানসের জন্য নয়, রাজু মণ্ডল এখন ধনমান ব্যক্তি।

পাটগাতি পৌঁছিয়া রাজেশ্বর কয়েক সের দুধ ও কলা কিনিয়া বলিল, বৃন্দাবন দা, দুধ জ্বাল দিয়ে তোমরা সবাই খাও। তারকেশ্বরকে সে অনেক উপদেশ দিল, কেহ যেন দরজা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া না যায়। মানুষকে যাহা দেওয়া যায়, ভগবান তার দশ গুণ দেন।

যারা তার কাছে মাসিক সাহায্য পায় তাদের নামগুলি একত্র করিলে একটা বড় তালিকা হয়। কানা খোঁড়া, অন্ধ আতুর আশ পাশের কেহই বাদ পড়ে নাই।

রাজেশ্বর বলিল, একটা তালিকা হাত-বাক্সে রেখে এসেছি আর একটা আছে পরশুরামের কাছে।

শুধু ইহাই নয়, মনসা, শীতলা বাড়ী, পীরের দরগা ঐ সব স্থানেও বরাদ্দ অনেক। কোন জায়গায় ধান, কোথায়ও টাকা। তার উপর স্কুলে চাঁদা আছে, টোল, পাঠশালা ও মক্তবের জন্য আছে সাহায্য।

তারকেশ্বর কি যেন বলিতে চায় লক্ষ্য করিয়া রাজেশ্বর বলিল, কিছু বলবে?

তারক বলিল, এতটা দান খয়রাতের অবস্থা ত' আমাদের নয়। একি করেছ?

রাজেশ্বর বলিল, দান কর, দেখবে অবস্থা ভাল হবে।

তারকেশ্বর একটু হাসিল।

রাজেশ্বর বলিল, দেনদারদের উপর সহানুভূতি দেখিও। কেউ যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলে।

ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেলে টিকিট দেওয়া আরম্ভ হইল। নরেশ্বর টিকিট কিনিতে গেল। মালপত্র বাঁধা শুরু হইল। বীরেশ্বর বলিল, আম্মা, এবার শেমিজ গায়ে দেও, জাহাজে উঠতে হবে।

তার জন্য কয়দিন হইল শেমিজ কেনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখীর মা কিছুতেই তাহা পরিবে না। বাড়ী হইতে রওনা হইবার সময় বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলিয়াছে, জাহাজে ওঠার সময় পরব।

দুঃখীরাম নিজে একটা খাঁকীর শার্ট পরিল। সেও বলিল, এবার শেমিজটা পর।

তার মা বলিল, বুড়া বয়সে তোরা আমারে সং সাজাইতে চাস? বরাতে সাজ পোশাক থাকলে এই দশা হয়।

রাজেশ্বর স্টীমারের সিঁড়িতে উঠিবার সময় বৃন্দাবন দুই হাত দিয়া তাকে জাপটাইয়া ধরিল। উচ্ছ্বাসভরে তার পায়ের ধূলি তুলিয়া মাথায় দিল।

রাজেশ্বর বলিল, এ করছ কি? তুমি সম্পর্কে বড়। বয়সেও হয়ত বড় হবে।

বৃন্দাবন কহিল, বড় ছোট হৈল মনের খেল রে ভাই। ইচ্ছা হইল সেবা দিতে তাই দিলাম। মা মনসা তোমারে রাজা করবুন। আর একটা কথা কই, আমার মাথারি তোমারে আমার থাও বেশী পেয়ার করে। বোঝলা ত'?

ষ্টেশন মাষ্টার বলিল, রাজেশ্বর বাবু, স্টীমার যে ছেড়ে দেবে।

যতক্ষণ দেখা যায় বৃন্দাবন একদৃষ্টে স্টীমারের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারকেশ্বর বলিল, চল জেঠামশাই, এর পর ভাঁটা হবে।

বৃন্দাবনের সে কথা কানেই গেল না।

রাজেশ্বরও তার কথাই ভাবিতেছিল। জীবনে অনেককেই দেখিল কিন্তু বৃন্দাবন আর দুটি মিলিল না। যেমন বিশ্বাসী তেমনি হিতাকাঙ্ক্ষী। কী গভীর তাঁর প্রেম!

চাঁপা বলিত, ও তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে। মানুষের ভালবাসা পেয়েছ তাই তোমার বরাত অত খুলে গেছে।

স্টীমার দেখার জন্য বৃন্দাবন নদীর পার দিয়া আরও খানিকটা ছুটিল। তাকে শেষটায় বাধা দিল সামনের একটি ছোট খাল। ধীরে ধীরে তার চোখের উপরেই জাহাজখানা দিগন্তে মিলাইয়া গেল। বৃন্দাবন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জবা নিজের মতন করিয়া রাজেশ্বরের সংসারের সমস্ত কাজ করিত। যাহাতে কিছু লোকসান না হয় সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল রাজেশ্বরের মতন প্রখর। কোন আলস্য নাই, রাত দুপুর পর্যন্ত খাটিয়া আবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই ওঠে।

দেশে তখন বড় রকমের চুরি ডাকাতি ছিল না বলিলেই চলে। তবে সাধারণ লোক বড় গরিব। তাই ছোটখাট জিনিসের উপর কড়া নজর রাখার দরকার হইত। ধান ভানিতে, চিঁড়া কুটিতে যে সব মেয়েরা আসে একটু অসতর্ক হইলেই তারা পান সুপারি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য তৈজসপত্র ও কাপড় চোপড় সরাইয়া ফেলে। রঙিন চিরুণী, জল খাওয়ার ছোট চুমকি, ছিটের কাপড এই সবেই তাদের লোভ বেশী।

রাজেশ্বর কলিকাতায় যাওয়ার বছর দুই আগের কথা। জবা একদিন তাকে বলে, তোমার বাড়ীতে আমার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দাও। সেই হইতে সে ও বৃন্দাবন এই বাড়ীতেই থাকে। তাহাতে রাজেশ্বরের সুবিধা হইয়াছে অনেক।

সংসারের ভিতরকার ঝামেলা রাজেশ্বরকে কোন দিনই তেমন করিয়া পোহাইতে হয় নাই। তাই সে সম্বন্ধে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণাও ছিল না। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হইতেই তাকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইল। সে আশা করিয়াছিল, দুঃখীর মার দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য হইবে। কিন্তু হইল না কিছুই। নরেশ্বর ও বীরেশ্বরের

খাবার সময় সে তদারক করে বটে, তা' ছাড়া সংসারের কোন কাজেই অগ্রসর হইতে চায় না। গল্প গুজব করিয়া দিন কাটায়।

পাড়ায় কয়েকটি বর্ষীয়সীর সঙ্গে এর মধ্যে তার বেশ ভাব হইয়াছিল। তারা রোজই দুপুরে গল্প শুনিতে আসে। দুঃখীর মাও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কীর্তন ও কথকতা শুনিতে যায়। তার মুখে ঠাকুর দেবতার গল্প শুনিয়া কেহ হয়ত ভক্তি গদ্গদ চিত্তে তার পায়ের ধুলা নিয়া মাথায় দেয়। দুঃখীর মা বাধা দেয়, বলে, ও কী করতেছ বোন?

প্রণামকারিণী উত্তর করে, তুমি হলে পুণ্যাত্মা মানুষ, তোমার পায়ের ধুলা নেওয়াও ভাগ্যের কথা।

দুঃখীর মা এখানে আসিয়া শেমিজ পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কথায় কথায় কলিকাতার মেয়েদের অনুকরণে কথা বলে, মাইরি ভাই।

একটা তার বড় দুর্বলতা। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নিজেকে নমঃশূদ্র বলিতে সে লজ্জা পায়। অনেক সময় কোন উত্তর করে না। কখনও বা মিথ্যা পরিচয় দেয়, বলে, আমরা হলাম কায়স্থ। কখনও বা বলে সচ্চাষী। ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে তাকে বেশ মুশকিলে পড়িতে হয়।

সাংসারিক অসুবিধার জন্য রাজেশ্বরের ইচ্ছা হইল মহেশ্বরের বিবাহ দিয়া একটি বৌ ঘরে আনে। এ সম্বন্ধে ত্রিগুণাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এর মধ্যে বিয়ে!

রাজেশ্বর বলিল, বয়স তো কুড়ি পার হল।

ত্রিগুণ হাসিয়া বলিল, তা বটে, ছেলে প্রায় অরক্ষণীয় হয়ে পড়েছে। যাক, তার মত নিয়েছ?

তার কি কিছু দরকার আছে?

আছে বৈকি। যার বিয়ে তার মত না হলে চলবে কেন? তা ছাড়া আমার ধারণা মহেশ অমলা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

রাজেশ্বর বিস্মিতভাবে বলিল, ভালবাসে!

ত্রিগুণা হাসিয়া বলিল, তোমার ঐ বয়সের কথা ভুলে গেছ, দেখছি।

রাজেশ্বর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু—

ত্রিগুণা বলিল, ছেলেদের বেলায়ই যত কিন্তু আর তা বটে। তা হলে চলবে কেন?

তাদের বাটীতে অমলা ও মহেশ্বরের পরিচয়। তাদের একত্র বেড়ান, একদিন রাত্রে মহেশ্বরের আহত হইয়া ফেরা, তন্দ্রার ঘোরে অমলার নাম করা ত্রিগুণা এই সব বিবৃত করিলে রাজেশ্বর সেই দিনই মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেশ্বর বালিগঞ্জে বেড়ানো এবং গুণ্ডার আক্রমণের কথা বলিল।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাকাবাবুকে বলনি কেন?

মহেশ্বর কোন উত্তর করিল না।

রাজেশ্বর ত্রিগুণাকে বলিল, বেশ লোক তো তুমি। মহেশকে একবার জিজ্ঞাসাও করনি যে ব্যাপারটা কি?

সব শুনিয়া ত্রিগুণা বলিল, বল কি হে? আমি ত এতটা বুঝতে পারি নি, তাই দরকারও মনে করিনি। সবিতা অবশ্য বলেছিল।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিল, তিনি জগৎকে দেখছি তোমার চেয়ে বেশী চেনেন।

রাজেশ্বর সবিতাকে দিয়া অমলার দিদি বিমলার কাছে ঢাকায় চিঠি লিখাইয়া দিল। কিন্তু ত্রিগুণাকে কহিল, এ কাজ হবে না।

ত্রিগুণা প্রশ্ন করিল, কেন?

আমরা যে ছোট জাত।

তারা ব্রাহ্ম, জাতের বিচার করবে না।

ব্রাহ্ম কেন, বাঙ্গালী খৃষ্টানরাও জাত বিচার করে। সেদিন একজন খৃষ্টান মুখুয্যে বলছিলেন, মার শ্রাদ্ধটা এগার দিনেই করব ভাবছি।

তাতে তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে। শত হলেও বামুনের ঘরের বৌ। মুসলমানরা এ সম্বন্ধে সব চেয়ে উদার কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে মদিনার সম্পাদক এই সেদিন গর্ব করছিলেন, এক সময় আমরা ছিলাম বাড়ুয্যে বামুন। মুসলমান হয়েছি সাত পুরুষও হয়নি।

অমলার দিদি সবিতার চিঠির কোন জবাব দিল না। দ্বিতীয় পত্রের উত্তর আসিল মাসখানেক পরে।

বিমলা লিখিল, অমলার বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই। তার মতামতের উপরই সব নির্ভর করে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কোন জবাব দেয়নি। তুমি লিখেছ ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আছে। সেটা বোধ হয় ভুল। অন্ততঃ অমলার দিক্ থেকে। সে ছেলেটিকে চেনে, কিন্তু তার মনে কোন রেখা পড়েনি।

মহেশ্বর এই জবাব শুনিয়া বলিল, ওঃ—। অমলার সম্বন্ধে তখনও তার ধারণা ছিল অন্যরূপ। সে ভাবিল, তার দিদি নিশ্চয়ই বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। হয়ত তাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সে অমলাকে নিজে চিঠি লিখিয়া দিল। লিখিল, তুমি যে আমায় ভুলতে পেরেছ তা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার নিজের হাতে লিখে জানাবে।

এবার অমলার নিজের হাতের লেখা চিঠিই আসিল। মাত্র একটি লাইন। আশা করি এ ভাবে আমাকে আর বিব্রত করিবেন না।

আশ্চর্য—এই নারী চরিত্র! নারী জাতির প্রতিই মহেশ্বরের বিতৃষ্ণা জন্মিল। আন্তরিকতার লেশমাত্র তাদের নাই, শুধু অভিনয় আর অভিনয়।

কয়েক দিন পরে রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখি, কি বল?

মহেশ্বর বলিল, থাক্ এখন।

শীতকাল। কি এক বিখ্যাত যোগ। এই উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিলে ঊর্ধ্বতন অসংখ্য পুরুষের মক্তি সুনিশ্চিত। নিজেরও সহস্র জীবনের পাপ স্খালন হইবে। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী আসিয়াছে, পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া গঙ্গার প্রধান ধারা বহিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সে নদী পুণ্যতোয়া নয়। তাই পূর্বাঞ্চলের লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়াছে কলিকাতার নীচের ভাগীরথীতে স্নান করিতে। আসিয়াছে ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল। বেহারের যে সব স্থান হইতে গঙ্গা দূরে সেখানকার যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

পথে ঘাটে পুণ্যার্থীর ভিড। যাদের আশ্রয় জোটে নাই, তারা বোঁচকা বুঁচকি লইয়া ফুটপাথে সংসার পাতিয়াছে। কেহ সেইখানেই রান্না করে, কেহ বা খাবার কিনিয়া খায়। তারা কাপড়ে গাঁটছড়া বাঁধিয়া চলে। রাস্তা পার হওয়ার সময় বিশ পঁচিশজন একসঙ্গে দৌড় দেয়। তাদের জন্য পথ ঘাট মানুষের চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোম্পানি যাত্রীগুলিকে পশুর মতন বোঝাই করিয়া আনে। গাড়োয়ান কুলী দোকানদার সবাই তাদের ঠকায়, এক পয়সার জিনিস চার পয়সায় বেচে।

মঞ্জরীর যাত্রী সংখ্যা শতাধিক। তার উপর আশে পাশের গ্রামের লোক। একদিন রাজেশ্বরের বাড়ীতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন যাত্রী উপস্থিত হইল। পরের দিন আর এক দল। যাত্রার এইরূপ অভিযান চলিল তিন চার দিন ধরিয়া। এদের অনেকেই তার স্বজাতীয়। তাদের মধ্যে বিধবাই বেশী। একদলকে লইয়া আসিল গোপীঠাকুর। আর একদলকে রামচরণ হীরা।

যাত্রীরা এই সব চরণদারের খরচা যোগায়। আর চরণদারেরা তাদের পয়সায় শুধু পুণ্য সঞ্চয়ই করে না, জামা জুতা কিনিয়া নগদ কিছু সঞ্চয় করিয়া ঘরে ফেরে। রোজগার তাদের নানা রকম।

কারও অসুখ করিলে নিম ও নিসিন্দার বড়ি খাওয়ায়, জলপড়া দেয়, মন্ত্র আওড়ায়।

ওঁ, হ্রীং অরং যাতু, হ্রাং কাশিং, ক্লীং সদ্দিং—পেটব্যথাং ফট্ স্বাহা, ওঁ কালী, হ্রীং কালী, শ্রীং কালী।

রাজেশ্বরের বাড়ীতে তিল ধারণের স্থান নাই। বারান্দায়, উঠানে, ছাদে এমন কি রাজেশ্বরের ঘরে যে যেখানে পারে স্থান করিয়া লইয়াছে। বাড়ীর অবস্থা যাত্রীবাহী রেলস্টীমারের মতন। বাড়ীটাকে তারা নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে ইচ্ছা থুতু ফেলে, মল মূত্রের দুর্গন্ধে নাক চাপিয়া থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম তারা জানে না, বলিয়া দিলেও মানে না। কুসংস্কার পর্বত প্রমাণ। সকল বিষয়েই গোঁজামিলের চেষ্টা তবুও রাজেশ্বরের এদের ভাল লাগে। কী গভীর ধর্ম বিশ্বাস, বিশ্বাসের জন্য কী কৃচ্ছ্রসাধনই না করে! মুক্তি বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা এই সাধনায়ই পাওয়া যায়।

একদল আসিলেন ভদ্রলোক। তারা রাজেশ্বরের বাড়ীতে থাকেন তারই পয়সায় হোটেলে খান। বলেন, এবার যা পুণ্য করছ রাজু, এখন শত জন্ম তোমার আর কোন ভাবনা নেই। অবশ্য, আমরা ত্রিগুণার ওখানেও উঠতে পারতাম কিন্তু শত হলেও সে বিধর্মী। আর তুমি হলে আমাদেরই একজন।

ইহাদের একদল আবার ত্রিগুণার বাড়ীতে উঠিয়াছেন। এই সব ভদ্রলোকদের ভাব এইরূপ যে কোন রকমে ছোঁয়াছুঁয়ি বাচাইয়া, পুণ্যসঞ্চয় করিয়া এই অস্পৃশ্য পারিপার্শ্বিক হইতে নামিতে পারিলেই যেন বাঁচেন।

স্নানযোগের আদি মধ্য ও অন্তে তিনবার ডুব দিয়া টগরের জর হইল, সঙ্গে গায়ে বেদনা। প্রথম রাত্রিটা সে গান করিয়াই কাটাইয়া দিল।

জবাকে বলিল, তোমাদের চেয়ে আমি পুণ্য করলাম ঢের বেশী।

সকালে দেখা গেল তার মুখ চোখ ফুলা। আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া বলিল, ওঃ মা, এ কি ছিরি হয়েছে। মানুষ কেন, ঠাকুর দেবতাকেও যে আর এ মুখ দেখানো চলবে না।

সকলে হাসিয়া ফেলিল। নৃত্যকালী বলিল, তুমি সেই টগরটিই রয়ে গেলে, একটুও বদলালে না।

বৈকালে জ্বর যন্ত্রণা ও ফুলা তিনটাই বাড়িল। সে বার ছিল বসন্তের বৎসর। প্রতি পঞ্চম বর্ষে শহরে এই মহমারীর প্রাদুর্ভাব হয়। কালীপ্রসন্ন বলিলে, বাটাজোরের কবিরা এখানে আছেন, তাঁদের ডাকুন। এ বিষয় তারা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

বরিশালের বাটাজোরের বসন্ত চিকিৎসকদের কবি বলে। রাজেশ্বর তাদের নাম শুনিয়াছিল। বহুদর্শী শশী কবিকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। তাঁকে পাওয়া গেল না।

রাত্রে রাজেশ্বরকে একা পাইয়া টগর বলিল, আমি আর বাঁচব না মণ্ডল কিন্তু বড় দুঃখ যে এই কুৎসিত চেহারা তোমার দেখতে হল। মরণটা তার আগে এল না।

রাজেশ্বর বলিল, কী বলছ তুমি ?

টগর বলিল, রূপের বড় গর্ব ছিল আমার, আর ওকে যত্ন করে রেখেও ছিলাম এত বয়স পর্যন্ত কিন্তু আজ তোমার সামনে—

পরদিন কবি আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মজাল বসন্ত, খুব শক্ত কেস।

রাজেশ্বর বলিল, কোন রকমেই কি সারানো যায় না ?

কবির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সেই দিনই তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন; রাজেশ্বর বাবুর বাড়ীর কেস শিবের অসাধ্য। আজ থেকে চতুর্থ দিনে মৃত্যু নিশ্চিত।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই ভদ্রলোককে অনেক রোগী দিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন তখনই রাজেশ্বরকে ডাকাইয়া বলিলেন, রোগিনীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।

রাজেশ্বর বলিল, শুনেছি বসন্তের হাসপাতালে রোগীদের সেরূপ যত্ন হয় না।

কালীপ্রসন্ন কহিলেন, তা বটে কিন্তু এতগুলো লোকের প্রাণ নির্ভর করছে খালি সতর্কতার উপর।

রাজেশ্বর বলিল, আপনি দয়া করে একটি বাড়ী দেখে দিন, আজই সব সেখানে যাক। আর যাত্রীদের আমি দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জবা প্রথম দিন হইতেই টগরের সেবা করিতেছিল, সব শুনিয়া সে বলিল, টগরকে ফেলে আমি যেতে পারব না। কে দেখবে ওকে?

নৃত্যকালী বলিল, বড় সাহস ত তোমার। ঐ রোগী নিয়ে থাকতে চাও?

সেই দিনই যাত্রীরা প্রায় সকলে দেশে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট কয়েক জন মহেশ্বরদের সঙ্গে যাইয়া নতুন বাড়ীতে উঠিল। গেল না শুধু জবা একা। রাজেশ্বরকে সে বলিল, তোমাদের ফেলে কিছুতেই আমি যাব না—তোমাকে, টগরকে।

বৃন্দাবন আসিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিল। তুমি থাকলে আমি এই দরজায় কপাল ঠুইক্কা মরব, মাথারি।

বৃন্দাবনের উপর এতটা রাগ জবার জীবনে কখনও হয় নাই। কিন্তু চেঁচামেচির ভয়ে তাকেও শেষটায় নতুন বাড়ীতে যাইয়া উঠিতে হইল। রাস্তায় বৃন্দাবন বলিল, বসন্ত, ও রে বাপ! তোমার যদি হয়?

জবা বলিল, মণ্ডলকে ত' তুমি ভালবাস তার যদি হয়?

বৃন্দাবন বলিল, তার হবে বসন্ত, হিঃ হিঃ। মণ্ডলেরও বরাত, আমারগোও বরাত।

টগরের জন্য দুইজন শুশ্রূষাকারিণী রাখা হইয়াছে। কবি রোজ আসিয়া দেখিয়া যান। টগর চোখে আর কিছু দেখিতে পায় না কিন্তু জ্ঞান ঠিকই আছে। কবি বলেন, এও এক আশ্চর্য ব্যাপার। তৃতীয় দিন পর্যন্ত যে জ্ঞান থাকে, তা দেখলাম এই প্রথম।

রাজেশ্বর ভাবে, অদ্ভুত ওর ইচ্ছা শক্তি। হয়ত বাঁচিয়া উঠিতেও পারে।

টগর জিজ্ঞাসা করে, চোখ হারিয়ে বেঁচে থাকতে হবে না ত' কবরেজ মশাই—?

না না আপনি সেরে উঠবেন, চোখও ভাল হবে।

টগর একটু হাসে। সেই দিনই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা বিধবা শুশ্রূষাকারিণী বলিল, খুব স্বামীভাগ্য করে এসেছিলে, মা। মুখে কথাটি নেই। আজ দুইদিন দরজায় ঠায় বসে আছে।

টগর ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বসে আছেন বুঝি?

হ্যাঁ, মা—.

ওকে ডেকে দিন একটু।

রাজেশ্বর ঘরে ঢুকিলে টগর বলিল, এসেছ তুমি? ওরা কেউ নেই ত'?

রাজেশ্বর বলিল, না।

একটু কাছে এস। মাথার কাছে দাঁড়াও এসে।

রাজেশ্বর পাষাণমূর্তির মতন আসিয়া তার মাথার কাছে দাঁড়াইল। টগর বলিল, পা দুখানা একটু এগিয়ে দাও ত'।

রাজেশ্বর ইতস্ততঃ করিতেছে বুঝিয়া টগর কহিল, তুমি বামুনের পায়ের ধূলো নেও না?

তা নেই।

তা হলে তুমিও যাও। তুমিই আমার বামুন।

টগর তারপর রাজেশ্বরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমায় ক্ষমা কর। সেই বর্ষার রাত্রে তুমি যখন আমার ঘরে গিছলে, আমিও তখন তোমারই চেয়েছিলাম।

রাজেশ্বর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত—টগর তখন ঠাকুরের মধ্যে তন্ময় ছিল। ধীরে ধীরে তার মনে পড়িতে লাগিল, সেই ঘন-বর্ষার রাত্রি, জলেডোবা উঠান, চাঁপার মৃত্যু শয্যা, তার শেষ চীৎকার।

একটু পরে সে বলিল, আর কিছু বলবার আছে তোমার?

না, বড় হতভাগিনী আমি। তারপর আরও জোরে রাজেশ্বরের পা আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বল, এ বাড়ীতে আর থাকবে না। আমার এই অসুখে বাড়ীর হাওয়াটা বিষিয়ে গেছে।

এই সময় কবিরাজ আসিয়া পড়িলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আর বড় জোর তিন ঘণ্টা বাঁচবেন।

সন্ধ্যার একটু আগেই টগরের মৃত্যু হইল। টগরের জীবন রাজেশ্বরের নিকট হইতে একটা সত্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই, যে টগরকে কতখানি ভালবাসিত।

মহেশ্বর হাইকোর্টে ওকালতি করে, বিখ্যাত উকিল শ্যাম মিত্রের সে জুনিয়র, মফঃস্বলের অনেক আপিল পায়, তার সম্প্রদায়ের উকিল মোক্তাররা প্রচুর কেস দেন। ফাঁকি সে দেয় না, প্রতিটি মামলার জন্য পরিশ্রম করে, তাই অল্পেই তার প্রাকটিশ বেশ জমিয়া উঠিল।

এর উপর আছে ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান। ইংরেজীতে চিঠি লেখা, হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজের জন্য লোক আছে যথেষ্ট কিন্তু প্রত্যহই রাত্রে তাকে সেগুলি একবার করিয়া দেখিয়া দিতে হয়।

রাজেশ্বরের কারবার আজকাল অনেক, বেলেঘাটায় চাল ও গুড়ের আড়ত, বড়বাজারে কাপড়ের দোকান। এগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কন্ট্রাক্টরি ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের এক ফার্ম খুলিল, নাম—আর, মল্লিক এণ্ড সন্স।

প্রথমে সে কর্পোরেশন ও ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের রাস্তার কাজ পায়, কতগুলি ইমারতের কন্ট্রাক্ট। অল্পদিনের মধ্যেই প্যাটার্সন কোম্পানির বড় সাহেব স্যার চার্লসের নজর পড়ে এই ফার্মের উপর। মহাযুদ্ধের বাজার, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, সেই হিসাবেই প্যাটার্সন কোম্পানির সঙ্গে মল্লিক এণ্ড সন্সের কাজের চুক্তি হয়। টাকাও আদায় হইয়া যায়। জিনিসের দাম চুক্তি অপেক্ষা কম পড়ায় রাজেশ্বর প্যাটার্সন কোম্পানিকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ফিরাইয়া দিতে গেল। সাহেব সমস্ত শুনিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তার করমর্দন করিলেন।

পিতার পক্ষ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিল মহেশ্বর। রাজেশ্বর ইংরেজী জানে না শুনিয়া সাহেব বিস্মিত হইলেন।

মিষ্টার আর মল্লিক অতিকষ্টে চেকে নাম সই করিতে পারেন, অথচ ছোট বড় কারবার তাঁর অনেকগুলি এবং সমস্তই নিজের হাতে গড়া শুনিয়া সাহেব মহেশ্বরকে বলিলেন, Your father must be a genius.

সত্যই প্রতিভা তার অসাধারণ, কাজ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরের বুদ্ধিবৃত্তিরও অদ্ভুত বিকাশ হয়। ত্রিগুণার কাছে সে সামান্য বাংলা শিখিয়াছিল এবং কাজ চালাইবার মত কিছু গণিত। কিন্তু কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারে না। দালান তোলা, রাস্তা সারানো এসব সে দেখে নাই কোনদিন। শুধু মিস্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়রদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া ব্যাপারটা আয়ত্ত করিয়াছে। এখন তাকে ঐ সম্বন্ধে ভুল বুঝান একরূপ অসম্ভব।

স্যার চার্লসের সুপারিশে বড় বড় সাহেব ফার্মের কাজ জুটিতে লাগিল, পাঁচ, সাত লাখ টাকার এক একটা অর্ডার। শুধু কাজই তিনি যোগাড় করিয়া দেন না, দরকার হইলে অর্থ সাহায্যও করেন। তাঁর চেষ্টায় যুদ্ধের কতকগুলি অর্ডারও মিলিল।

রাজেশ্বরের বৈবাহিক বেচুরাম গঙ্গাল অবাক্ হইয়া গেল। রাজু মল্লিক বিলাতী কাপড় পোড়াইয়া সাহেব হাকিমের কোর্টে জরিমানা দিল অথচ সাহেবরা তাকেই কাজ দেয়, সে যুদ্ধের মাল সরবরাহের ভার পায়। আশ্চর্য!

বেচু গঙ্গাল দেখিল বৈবাহিকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। উপযাচক হইয়া সে রাজেশ্বরের নিকট চিঠি লিখিল, নিজে লোক দিয়া দুর্গাকে পাঠাইল। জামাতা বঙ্কিম আবার চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। বাংলায় পত্র লিখিলেও আগে সে সম্বোধন করিত,

My dear father-in-law বলিয়া। এবার আরম্ভ করিল, My dear father.

কলিকাতায় সংসারের কাজ অনেক, খরচা প্রচুর। দেখা-শুনার জন্ত রাজেশ্বর জবাকে আনাইয়াছে। তার উপরই সংসারের ভার। বৃন্দাবনের বয়স হইয়াছে, কাজ কর্ম কিছু করে না। বসিয়া বসিয়া তামাক টানে আর রাজেশ্বরের গল্প করে, রাজু ভাই যা নাও বাইত, ও রকম বাইছা আর দেখলাম না। কি খাসা রসুই করত যেন মিয়া বাড়ীর ছালুন।

কাঠ কাটা, মাটি কোপানো, হাল চষা—বৃন্দাবনের মতে সর্ববিষয়েই তার রাজু ভাই অপ্রতিদ্বন্দী। জবার ইচ্ছা মহেশ্বরের বিবাহ দেয়। রাজেশ্বরের কাছে কথাটা পাড়িলে, সে বলিল, মহেশের যে মত নেই। অমতে বিয়ে দিলে শেষটায় ওর জীবনটাই অশান্তির হবে।

জবা হাসিয়া উত্তর করে, এত জান আর এইটে বোঝ না, মণ্ডল। বিয়ে দাও, দেখবে ছেলে-বউতে মিল হয়ে যাবে।

রাজেশ্বর উত্তর করে, মহেশ সে ছেলে নয়। জবা হাসিয়া বলে, ছেলেকে কি চিনি নে? নিজের হাতে মানুষ করলাম। বিয়ে করলেই বউ ছেলেতে মিল হয়ে যায়। ও করে বয়সে।

বৃন্দাবন এই সময় উপস্থিত হইয়া বলিল, ছাই বোঝ তুমি। রাজু ভাই যা বলে তাই ঠিক।

জবা স্বামীকে ধমক দিল, সব কথায় থাক কেন বল দেখি? বল ত' কি কথা হচ্ছিল?

কথাটা বৃন্দাবন শোনে নাই। সে বলিল, বোঝব আবার কি? দরকার নেই বোঝবার, রাজু ভাই যা কয় তাই হাচা।

রাজেশ্বর তবু একবার মহেশ্বরকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ঠিক সেই দিনই মহেশ্বর বীরেশ্বরের চিঠি পায়। বীরেশ্বর হাজারিবাগ

হইতে লিখিয়াছে। চিঠিটা পাইয়া অবধি মহেশ্বরের মন ভাল ছিল না। সে পিতার প্রশ্নের উত্তরে আগেরই মতন জবাব দিল, এখন থাক, পরে আমি তোমায় বলব।

বীরেশ্বরের স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ। আজ জ্বর, কাল সর্দি, অসুখ লাগিয়াই আছে।

দুঃখীর মার স্নেহযত্নে মাঝে কয়েকদিন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইল না। কিছুদিন পরে এই বৃদ্ধার যত্ন হইতেও সে বঞ্চিত হইল। টগরের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই বসন্ত রোগে দুঃখীর মৃত্যু হয়। সেই হইতেই তার মা পাগল হইয়া গিয়াছে। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, খাওয়াইলে খায়, স্নান করাইলে করে, এমনি কোন সাড়া শব্দই নাই। রাজেশ্বর-অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছে, ছেলেরা ও জবা সেবা যত্ন করিয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

শরীরের জন্য বীরেশ্বর পড়াশুনা বেশী করিতে পারিল না, তবু ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইল। আই, এ পড়িবার সময় তার প্লুরিসি হইল, চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন পশ্চিম যাইবার। সেই হইতে সে হাজারিবাগে থাকে, কলিকাতায় আসিলেই তার শরীর খারাপ হয়, কাশি বাড়ে ঘুষঘুষে জ্বর হয়, বুক বেদনা করে।

পড়াশুনায় তার খুবই আগ্রহ কিন্তু ডাক্তাররা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দুইই বন্ধ করিয়া দিলেন।

হাজারিবাগে বীরেশ্বর থাকে ভাল কিন্তু চিত্তে কোন প্রসন্নতা নেই। চারদিকে কর্মব্যস্ততা, বাপ ভাই সকলেই ধাপে ধাপে উঠিতেছে। পড়িয়া রহিল সে শুধু একা।

এই সময় তার জীবনপথে অমলা আসিয়া দাঁড়াইল। যেমন চোখ ঝলসানো তার রূপ, পরিপূর্ণ যৌবনে ভরা বর্ষার নদীর মতন তেমনই উচ্ছল দেহলাবণ্য।

হাজারিবাগ হইতে মহেশ্বর দাদাকে নিয়মিত চিঠি দেয়। ডাক্তারের পরামর্শে কলেজের পড়া তার বন্ধ আছে বটে কিন্তু সর্বদাই সে বইর মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পড়ে অনেক কিছু, ফিলজফি, ইকনমিক্স, ইতিহাস, সাহিত্য। পড়িতে পড়িতে মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে, মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়।

কিন্তু সেদিনের পত্রে ছিল শুধু অমলার কথা—একটি মহিলার বিষয় আজ তোমায় লিখছি। স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। ভদ্রলোক ভুগছেন অনেকদিন, সম্ভবতঃ টি, বি। সংসার অভাবের, কাজ ঢের। সবই সেই মহিলাকে নিজের হাতে করতে হয়, তার উপর আছে রুগ্ন স্বামীর সেবা। স্বামী সর্বদাই খিটখিট করেন কিন্তু এঁর মুখে অসন্তোষের ছাপ পড়ে না।

মাসখানেক হ'ল আলাপ হয়েছে। কিন্তু আজ তার বিষয় এত লিখলাম কেন জান? তিনি তোমায় চেনেন। আমার পরিচয় শুনে সেদিন বললেন, ওঃ, তোমার দাদা মহেশ্বর মল্লিক, এম, এতে যে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিল, বি, এতে ঈশান স্কলার?

এই সময় তার স্বামী এসে পড়ায় কথাটা চাপা পড়ে। তারপর আর তুলবার সময় হয় নি। চেন নাকি এই মহিলাকে? এর নাম অমলা, স্বামীর নাম মুকুন্দ কোলে। তিনি ডায়মণ্ড হারবারের উকিল।

মহেশ্বর দেখিল তার বাবার অনুমান ভুল। তারা ছোট জাত বলিয়াই যে অমলা বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তা নয়। কারণ অন্য কিছু।

সে ভাবে, কে এই মুকুন্দ কোলে? লোকটা ভাগ্যবান বটে। মহেশ্বরের একবার তাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়; এমন কি তার আকর্ষণ যার জন্য অমলা তাকে অমন করিয়া ভুলিয়া গেল।

মহেশ্বর বীরুকে লিখিল, মুকুন্দ বাবুর টি, বি ব'লে যখন সন্দেহ হয়েছে তখন ও বাড়ীতে যাতায়াত না করাই ভাল, বিশেষতঃ তোমার এই দুর্বল শরীর নিয়ে।

সেই হইতে বীরেশ্বর মুকুন্দের অসুখের কথা আর কিছু লেখে না। কিন্তু প্রত্যেক চিঠিতেই থাকে তার অমলাদির খবর। তার প্রশংসা আর নিজেব জীবনের ব্যর্থতার জন্য খেদ।

এক চিঠিতে লিখিল, দেখতে যদি দিদিকে এমন অবস্থায়। দুঃখের আগুনে পুড়ে তিনি খাঁটি সোনা হয়ে গেছেন।

মহেশ্বর অনুভব করে, এই পাতানো সম্পর্কের মধ্য দিয়া তার রুগ্ন ভ্রাতা দিনের পর দিন অমলাব দিকে একটু বেশী রকমই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। অতটা ভাল নয়।

তাকে অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে শুনিয়া বীরেশ্বর দাদাকে এক কড়া চিঠি লিখিল, আমি মনে করি নিজের সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকবার মতন বয়স আমার হয়েছে, বুদ্ধি এবং শিক্ষা দীক্ষাও কিছু আছে। এখানে আমি বেশ ভালই আছি। এখন তোমরা আমার অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টা ক'র না। করলে ক্ষতিই বেশী হবে।

মার মৃত্যুর মুহূর্ত্ত থেকেই আমাব দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। অমলাদির স্নেহ সেই ক্ষতির অনেকটা পূরণ করেছে। সে স্নেহ যে কি জিনিস তোমরা বুঝবে না। যারা তার ভালবাসা পায় নি, তাদের পক্ষে ধারণা করাও অসম্ভব। চিঠিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়ে থাকলে ক্ষমা ক'র।

কনিষ্ঠের জন্য মহেশ্বরের যতটা চিন্তা হইল, তার চেয়েও বেশী রাগ হইল অমলার উপর। তার প্রত্যাখ্যানের অপমান আজ দশ গুণ বড় হইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতে বীরেশ্বরের উপরও তার রাগ হইল।

এই সময় তারকেশ্বরের বিবাহ। পাত্রী দেশেরই মেয়ে। তারা এত দরিদ্র যে দুবেলা অন্ন সংস্থান হওয়াই মুশকিল। কিন্তু মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী বলিয়া রাজেশ্বর নিজে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। পাত্রীর পিতা অক্ষয় বদ্দি আপত্তি করিল, আপনি বড় মানুষ, রুই কাতলার জাত, বৃক্ষ হিসাবে বটগাছ আর আমি হইলাম গরিব, খৈলসা পুঁটির সামিল, তৃণেরও অধম, বিলের ক্যাদা।

আসল ব্যাপার ইহা নয়। সামান্য কয়টি টাকার জন্য তারক তাকে অপমান করে। বাড়ীতে মাল ক্রোকের পরোয়ানা লইয়া গিয়া তার রুগ্ন স্ত্রীর শিয়র হইতে জল খাওয়ার পিতলের শেষ চুমকিটি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করে।

খবরটা শুনিয়া রাজেশ্বর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, ছেলেকে বলিল, ছিঃ তারক। নিজে অক্ষয় বৈদ্যের নিকট যাইয়া তার হাত দুখানা ধরিয়া ক্ষমা চাহিল।

সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় জল হইয়া গেল, বলিল, আপনারে দেইখ্যা মাইয়া দিলাম। মাইয়া আমার গেল জন্মে ভারী পুণ্য করছিল তাই আপনার বৌ হইল। কিন্তু দ্যাখবেন গরিবের মাইয়া বলিয়া উমা মা যেন শেষে আমার অপমানী না হয়।

রাজেশ্বর বুঝিল, মালক্রোকের সেই অপমানটা অক্ষয়ের হৃদয়ে কত গভীর ভাবে বাজিয়াছে।

সে কহিল, তাবক ছেলে মানুষ, ওকে ক্ষমা করুন।

অক্ষয় বলিল, দু দিন পরে সে আমার জামাই হবে। তার উপর আর গোসা করি কেমন করিয়া?

কন্যাপক্ষের সমস্ত খরচাই রাজেশ্বর দিল। কিন্তু বাহিরের লোকেরা বুঝিতেও পারিল না যে তারা অতখানি দরিদ্র।

কলিকাতা হইতে কালীপ্রসন্ন, ত্রিগুণা, সবিতা প্রভৃতি বন্ধু বান্ধব এবং রাজেশ্বরের বহু কর্মচারী এই উপলক্ষে নেপালপুরে আসিলেন।

আসিলেন বেচু গঙ্গালেরা তিন ভাই। বেচু প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতী করিয়া পঞ্চম জর্জের মূর্তি খোদিত ব্রোঞ্জের মেডেল পাইয়াছিলেন। স্নানের সময় ভিন্ন সর্বক্ষণই তিনি উহা গলায় ঝুলাইয়া রাখেন। তার ধারণা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর পঞ্চম জর্জের মূর্তি ধারণ করা একটা মহাপুণ্য।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলে, মাঝে মাঝে মেডেল ধুয়ে একটু জল খাবেন।

দুর্গা আসিয়াছে দুইটি ছেলে লইয়া। রাজেশ্বরের তারা বড় আদরের ধন। ফেলু লিখিয়াছিল, সম্ভবতঃ ছুটি পাইবে না। সেও বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধুমধাম খুবই, বাদ্য বাজনা, দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে বাড়ীটা মুখর। চারিদিকে আলো ও আতশবাজির জলুস। রাজেশ্বরের নূতন পাকা বাড়ীতে অতিথিদের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। তাই সে কলিকাতা হইতে তাঁবু আনিয়াছে, গ্রীন বোট ভাড়া করিয়াছে।

চারিদিকে সাধু সাধু রব। কাঙালীরা ভূরিভোজন করিয়া জয়ধ্বনি করে। ব্রাহ্মণরা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন। গুপীর মহা আনন্দ, তার যজমানের কাজ, সে কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়।

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—বোঝলা কি, না, আমরা কাশ্যপ বংশ। আমারগো দ্যুতি হইলা তোমরা, শিষ্য যজমানেরা।

রাজেশ্বরের বিবাহের সময় গুপী বলিয়াছিল, কাত্তব কান্তাং, কস্তব পুত্রং সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রং।

এবার বলিল, ও শ্লোক আর এ যাত্রায় কব না। ঐ শ্লোকে ভাগ্যটা রাজুর ভাল হইছে। ছাওরাল হইছে সোনার চাঁদ। কিন্তু বউটি অসময়ে মরল। এবার তারা রওনা হইবার সময় সে, আশীর্বাদ করিল,

অস্তি গোদাবরীং তীরে বিশালং—

রাজেশ্বরের লেখাপড়া জানা ছেলেরা ইহাতে লজ্জাবোধ করে। ভাবে বাহির হইতে পাঁচজন বিদ্বান লোক আসিয়াছেন, তাঁরা কি মনে করিবেন?

রাজেশ্বর বলিল, সবই বুঝি কিন্তু ওঁরা কুলপুরোহিত, ওঁরা রাগ করলে অমঙ্গল হবে। তা ছাড়া মঙ্গল কামনা করে শুদ্ধ মনে ভুল শ্লোক আওড়ালেও ভগবানের কানে তা পৌঁছায়।

বাহির হইতে কেহই বুঝিতে পারিল না যে বিবাহের এই আনন্দ রাজেশ্বর মোটেই উপভোগ করিতে পারে নাই। তার মনে পড়ে চাঁপার কথা। আজ সে নাই, মেয়ে দুর্গার বিবাহের সময় ছিল না।

মানুষ অর্থ চায়, মান প্রতিপত্তি চায়। আবার সময় সময় সে সবই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। চাঁপা বাঁচিয়া থাকিলে রাজেশ্বরের কাছে আজ সব এইরূপ নিরর্থক মনে হইত না। স্বামীর জীবনে সে কী বিরাট ফাঁকই না রাখিয়া গিয়াছে।

এ দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না। সেও হয়ত এতটা বুঝিত না, বুঝিল বীরেশ্বরের জন্য। সে আসে নাই। পিতাকে লিখিয়াছে, মুকুন্দ বাবু এই সেদিন মারা গেছেন। এ অবস্থায় দিদিকে একা ফেলে যাই কি করে?

বিবাহের পরদিন গভীর রাত্রে রাজেশ্বর একা খালের ঘাটে বসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল বীরুর অসুখের কথা, অমলার কথা, মহেশ্বরের দুঃখ এরূপ আরও কত কি?

চাঁপা থাকিলে বীরু না আসিয়া পারিত না। হয়ত দরকারও হইত না তার পশ্চিম যাইবার। শৈশবে মাতৃহীন বলিয়াই ত' তার এই অবস্থা।

রাজেশ্বরের মনে পড়ে টগরকে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ— সামনে খাল, খালের পর ধূধূ করে মাঠ, পিছনে দেখা যায় তার

ধবধবে সাদা বাড়ী, দুপাশে বাগান। সবই সুপ্তিমগ্ন। আধো অন্ধকার, আধো আলোয় ঢাকা প্রকৃতি। এর মাঝখানটায় চাঁপা, টগর বীরেশ্বর, অমলা জীবিত ও মৃতের দল যেন তার সামনে মিছিল করিয়া আসিতে থাকে।

বহুদিন হইতেই কংগ্রেসীদের মধ্যে দুটা দল ছিল, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী। জাতীয় মহাসভার প্রতি অধিবেশনেই উভয় পক্ষের বল পরীক্ষা হইত। সংখ্যাধিক মধ্যপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীরা আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

১৯১১ সনে মহেশ্বর কলিকাতা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার দলের অন্যতম ক্যাপটেন হয়। সেই হইতেই তার সহানুভূতি চরমপন্থীদের দিকে। কিছুদিন পরে সে হোমরুল লিগে যোগ দেয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বেশান্তের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ সময় হইতে চরমপন্থীরা প্রাধান্য লাভ করে। মহেশ্বর সেবার ছিল অভ্যর্থনা সমিতির বিভাগীয় সম্পাদক। রাজনীতিক কর্মকুশলতার জন্য কিছু খ্যাতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। এর শেষ কোথায়, এই আবেদন নিবেদনের? মধ্যপন্থীই হোক আর চরমপন্থীই হোক, কারও গঠনমূলক কোন কার্যসূচী নাই। জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। কাজের মধ্যে শুধু সভা ডাকিয়া প্রস্তাব পাশ আর আবেদন। এক দলের ভাষা উগ্র আর এক দলের নরম, এক দল নির্ভীক আর এক দল হিসাব করিয়া চলে। এক দল বলে, আজই স্বরাজ চাই আর এক দল ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পাইলেই খুশি। কর্ম তালিকাহীন এই যে বিতণ্ডা এর মূলে সে শক্তি কোথায় যাহাতে স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে?

একদিন প্রাতভ্রমণের সময় কোন থানার ফটকে টাঙানো ইস্তাহারের উপর তার নজর পড়িল। একটি যুবকের মৃতদেহের ছবির উপরে লেখা, পাঁচশত টাকা পুরস্কার। ছবিখানা দেখিয়াই মহেশ্বরের পা একটু টলিল, নিঃশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল।

ছবির নীচে ছিল—

গত মার্চ মাসে ঢাকা জিলার হরিহরপুরে ডাকাতির সময় স্থানীয় জমিদারের গুলিতে উপরোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই যুবককে সনাক্ত করা যায় নাই। ইহার সহকর্মীরা পলাইয়া গিয়াছে। যে বা যাহারা এই যুবকের পরিচয় জানাইতে পারিবে অথবা ঐ সম্বন্ধে কোনও সাহায্য করিতে পারিবে মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাহাকে বা তাহাদিগকে উপরোক্ত পুরস্কার দিবেন। এই ঘোষণা অদ্য হইতে ছয় মাস বলবৎ থাকিবেক।

জিওফ্রে নক্স

১লা মে, অস্থায়ী ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, সি আই, ডি বেঙ্গল।

সারাটা দিন মহেশ্বরের চোখের উপর ভাসিতে লাগিল গৌতমশঙ্করের সেই ছবি। মৃত্যুর পরেও জগতের দিকে চাহিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। এ হাসির অর্থ কি? তার জাত ভাইদের প্রতি ব্যঙ্গ না মৃত্যুর গৌরবের আনন্দ?

গৌতমের সঙ্গে মহেশ্বরের মতের মিল কখনও হয় নাই। এবং এই জন্য উভয়ের মধ্যে প্রায় বিচ্ছেদই ঘটিয়াছিল। কিন্তু মহেশ্বর বরাবর তাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। এই মানুষটির নিজের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ছিল না, ছিল না কোন স্বার্থবোধ। তার ধ্যান জ্ঞান সবই দেশ ও দেশের মুক্তি। এ রকম মানুষের মৃত্যু জাতির দুর্ভাগ্য।

মহেশ্বরের মনে পড়িল গৌতমের বৃত্তি পাওয়ার গল্প। বাল্যে এই দরিদ্র বালককে তার এক আত্মীয়া পালন করেন। দূর সম্পর্কিত হইলেও তিনি গৌতমকে বড় ভাল বাসিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, গল্প গুজব করে তুই কাটিয়ে দিচ্ছিস্ অথচ একজামিন যে এসে পড়ল।

গৌতম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আত্মীয়া বলিলেন, লোকে কি বলে জানিস?

কি বলে?

বলে, যে কিসের পিছনে তুমি টাকা ঢালছ? ও কি আর পাশ করতে পারবে?

গৌতম বলিল, তোমার তাতে বড় লাগে?

হ্যাঁ, বাবা।—আত্মীয়ার চোখ জলে ভরিয়া গেল।

গৌতম বলিল, আমি ভাল পাশ করলে ত' তোমার কোন দুঃখ থাকবে না?

না, বাবা।

বেশ, কথা রইল আমি পাশ করে তোমার হাতে এনে জলপানির টাকা দেব।

সেইবারেই এন্ট্রান্স পরীক্ষার জলপানির টাকা দিয়া গৌতম সেই মহিলার মুখে হাসি ফুটাইল। এফ্ এ, তেও বৃত্তি পাইল। তার বি-এ পরীক্ষার আগেই আত্মীয়াটি মারা গেলেন।

গৌতম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। কিন্তু পড়াশুনায় কোন দিনই তার ঝোঁক ছিল না, বিশেষ করিয়া পাঠ্য পুস্তকে। সে বলিত, পরাধীন জাতির প্রত্যেকটি যুবার ধ্যান জ্ঞান হওয়া উচিত দেশের মুক্তি।

কিছুদিন পরের কথা। মহাযুদ্ধে ইংরেজের জয় হইয়াছে। ভারতীয় বীরগণ ইংরাজ ও ফরাসীর পাশে দাঁড়াইয়া ফ্রান্সে ও ফ্লাণ্ডার্সে, আফ্রিকা ও মেসপটেমিয়ায় হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছে। কেহ

কেহ ভিক্টোরিয়া ক্রস পাইয়াছে। সেনানায়করা তাদের বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন।

প্রাণ দিয়া ভারতবাসীরা সাহায্য করিল। যুদ্ধের পর তারা ভাবিল —দিন আগত ঐ।

কিন্তু সে ভুল ভাঙিল জালিনওয়ালার বাগিচায়। এই সময় রাজনৈতিক জগতে গান্ধীজীর আবির্ভাব। কৃশতনু এই মহামানব দিলেন এক নূতন বাণী। ভীরুকে দিলেন অভয়—দুর্বলকে দিলেন বল। এই সত্যসন্ধ নেতা আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবার ভারতবর্ষে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

রাজনীতির যুদ্ধে অহিংসার প্রয়োগ এক নূতন অস্ত্র। জগৎ অবাক্ বিস্ময়ে ভারতের দিকে চাহিয়া রহিল। গান্ধীর পতাকাতলে হিন্দু মুসলমান সকলে সমবেত হইল, আসিল কোল ভিল সাঁওতাল। রাজার ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি ছাড়িয়া আসিলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিলেন। আসিলেন সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ, মতিলাল ও লাজপত এবং মোসলেম জগতের মুকুটমণি আলি ভাইগণ। আজমল ও আনসারি যোগ দিলেন। জুম্মা মসজিদ হইতে শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু মুসলমানগণকে জাতির ডাক শুনাইলেন। আসমুদ্র হিমাচলে শোনা গেল—

জয় মহাত্মা গান্ধীকী জয়।

তিনি জাতিকে এক কর্মসূচী দিলেন। সঙ্গে দিলেন ছুৎমার্গ পরিহারের বাণী। গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায়, সারা দেশে নূতন করিয়া কংগ্রেস কমিটি গঠন করিবার পরিকল্পনা হইল।

মহেশ্বরের ইচ্ছা হয় এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে যেমন পড়িয়াছেন জ্যোৎস্নানাথ ককাটি, তাদের গ্রামের ব্রজরাখাল। তার মনে পড়ে গৌতমকে, তার ত্যাগ মহেশ্বরকে প্রেরণা দেয়। আবার ভাবে পিতার

কথা। বহু পরিশ্রমের পর তিনি কতকগুলি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। শত শত মানুষের তাতে অন্ন হয়। স্বজাতীয় লোক, পরগনার বহুলোক তাদের কারবারে খাটে। পিতাকে সাহায্য করা দরকার, তাঁরও ত' বয়স হইল। এর উপর ছিল নিজের প্রাকৃটিসের আকর্ষণ। অল্পেই তার প্রাকৃটিস বেশ জমিয়াছে। হাইকোর্টে অনেকেই বলে, মহেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

একদিন জ্যোৎস্না নাথ আসিয়া উপস্থিত। তিনি এখন আর মিষ্টার ককাটি নন। বালাপোশ গায়ে, খদ্দর পরিহিত বাঙালী জ্যোৎস্না নাথ। তাঁর সঙ্গে ছিল সুপ্রভা। কয়েক বছর আগে জ্যোৎস্না নাথের বাড়ীতে এই মেয়েটির সঙ্গে প্রথম দেখা। তারপর মহেশ তার আর কোন খবর জানিত না। এই কয় বৎসরে সুপ্রভার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ঠিক যেন আগেরই সেই শান্ত শিষ্ট মেয়েটি। তবে আদর্শের প্রেরণা তার চোখে মুখে একটা দীপ্তির সঞ্চার করিয়াছে।

জ্যোৎস্না নাথ রাজেশ্বরকে কহিলেন, আপনার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। আপনাকে আমরা চাই।

রাজেশ্বর বলিল, আমি রাজনীতি বুঝি না। অশিক্ষিত মানুষ।

জ্যোৎস্না নাথ বলিলেন, আপনি তিন চারটে জেলায় আপনার স্বজাতির নেতা। মহাত্মা আপনার মত লোকই চান।

রাজেশ্বর একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমার কারবার?

জ্যোৎস্না নাথ বাধা দিয়া বলিলেন, Business can wait but Swaraj cannot. ইংরেজীতে বলার জন্য মাফ করবেন। আগে চাই স্বরাজ, তা না হলে জাতির মৃত্যু নিশ্চিত।

তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা দেখিয়া রাজেশ্বর মুগ্ধ হইল। কথাগুলি ঋষি মুখ নিঃসৃত বাণীর মতন। ইহা জ্যোৎস্না নাথের মুখেই সাজে

যিনি মাসিক দশ পনর হাজার টাকার প্রাকৃটিস স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। শুধু তাই নয় ছাড়িয়াছেন বিলাস ব্যসন। তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই বদলাইয়াছে।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, জ্যোৎস্না নাথ ঠিক তেমনি ভাবে রাজেশ্বরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন। তিনি ডাকিতে আসিয়াছেন, এই ডাকের পিছনে আছে দেশবন্ধুর আহ্বান, গান্ধীর আহ্বান, তাদের মধ্য দিয়া মৃত পূর্ব পুরুষরা ডাকিতেছেন, ডাকিতেছেন দেশমাতৃকা। এদিকে ব্যবসায় প্রীতি তার অস্থি মজ্জায় বাসা বাঁধিয়াছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার কাছে এক একটি মহেশ্বর ও বীরেশ্বর। সে বলিল, আমি ভেবে পরে বলব।

আবার আসব কবে?

আসতে হবে না, যদি যোগদান করি তবে নিজেই গিয়ে হাজির হব।

জ্যোৎস্না নাথের মুখে হাসি ফুটিল। তিনি মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর তুমি?

তাকেও প্রাকৃটিস ছাড়িতে হইবে। ঠিক দেখিতে না পাইলেও মহেশ্বর অনুভব করিতেছিল যে সুপ্রভা তার দিকে চাহিয়া আছে। ঠিক এই সময় রাজপথে একদল বলিয়া উঠিল, বন্দেমাতরং, গান্ধী মহাত্মা কি জয়।

মহেশ্বর বলিল, আমিও আছি আপনার পিছনে।

শুধু জ্যোৎস্না নাথ নন, তাঁর স্ত্রী রুগ্ন শীর্ণ কৃষ্ণকুমারীও আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। আশপাশের শ্রমিক ও কৃষক মেয়েরা, ভদ্র ঘরের বধূরা, মেম ভাবাপন্ন মহিলারা প্রতিদিন তার বাড়ী আসিয়া সমবেত হন। সকলে একত্রে চরকা কাটেন, সঙ্গে সঙ্গে গান করেন—

গান্ধী আনিলেন বোন্ এ কী মন্তর
স্বরাজ লাভের এক নব যন্তর।

সাদা সুতা বার করে ঘোরে ঘর্ঘর
নব বেদ বলে, হও নিজ নির্ভর।

কৃষ্ণকুমারী এর উপর আবার অশিক্ষিতদের পড়ান। মেয়ে ও মা এক সঙ্গে বর্ণপরিচয় পড়ে। গুনিতে শেখে এক দুই তিন চার। এই কাজের প্রেরণায় তাঁর শরীরও কিছু ভাল হইল।

কয়েক দিন পরে রাজেশ্বর নরেশ্বরকে বলিল, বছর খানেক তুমি একা কাজ কর্ম দেখতে পারবে?

কেন?

আমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি।

দাদা ত আগেই যোগ দিয়েছেন। তুমিও যাবে?

হ্যাঁ, মোটে ত' এক বছরের কথা। গান্ধী বলেছেন এক বছরেই স্বরাজ দেবেন।

নরেশ্বর একটু হাসিল।

তার উপর লাখ লাখ টাকার কারবারের ভার দিয়া রাজেশ্বর আন্দোলনে যোগ দিল। সে ও মহেশ্বর দুই জনেই মঞ্জরীতে চলিয়া গেল।

রাজেশ্বরকে সকলেই ভালবাসিত, মহেশ্বর ছিল ছাত্র সমাজের আদর্শ, পিতাপুত্র কারবার ফেলিয়া প্রাক্‌টিস ছাড়িয়া আসিয়াছে ইহা দেখিয়া দলে দলে লোক আসিল। হিন্দু মুসলমান, যুবা বৃদ্ধ আসিয়া তাদের পিছনে দাঁড়াইল। মঞ্জরীতে কংগ্রেস কমিটি হইল, গ্রামে গ্রামে কমিটি, থানা কমিটি।

রাজেশ্বর নিজ ব্যয়ে প্রথমেই আড়াইশ চরকা বিলি করিল। সুতা কাটিতে সে কী উৎসাহ! বিশেষতঃ বৃদ্ধাদের। রাজেশ্বরের বাড়ীতে আলোক আশ্রমে সকলে সুতা কাটে আর গান গায়—

নব যুগে নব দুত নূতন বাণী
প্রেম মন্তর তার অভয় পানি

আপনার মাঝে লভি আপনার বল
সত্যাগ্রহীদের গড়ে তোল দল
মোসলেম হিন্দু নহে ঠাঁই ঠাঁই
হাতে হাত দিয়ে বল জয় ভাই ভাই।

গানের পর কর্মীর দল প্রচারে বাহির হয়, সুতা সংগ্রহ করে, তাঁত বুনিতে শেখায়। রাজেশ্বর কলিকাতায় কোন কোন লোকের কাছে শুনিয়াছিল, চরকার অর্থ নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। যন্ত্র যুগে চরকা অচল হইতে বাধ্য। দেশে আসিয়া দেখিল, পণ্ডিতদের এ কথা সত্য নয়, সত্য হওয়া উচিতও নয়। অনেক কর্মহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে, বেকারের সংখ্যাও নগণ্য নয়। তারা বসিয়া বসিয়া খায়। উপার্জন করে না কিছুই। তুলা দিয়া দেখা গেল অনেকেই মাসে ন্যূনকল্পে দুই টাকার সুতা কাটিতে পারে। দরিদ্র পল্লী পরিবারের পক্ষে এই অতিরিক্ত আয় মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়। আর বহু পরিবারেই এইরূপ আয় করিবার লোক আছে একাধিক।

যন্ত্রযুগে কুটীর শিল্প যে অচল নয় তার প্রমাণ জাপান। যন্ত্র শিল্প ও উটজ শিল্প পরস্পরকে উৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়াই জাপান অত সস্তায় মাল দিতে পারে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও আজ সে য়ুরোপ আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। যন্ত্র শিল্প ও কুটীর শিল্প পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া প্রতিপোষক হইলে দেশের উৎপাদন শক্তিরই মঙ্গল। অবশ্য তার জন্য চাই সংগঠন।

ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন করিয়া রাজেশ্বর বহুলোকের মুখে হাসি ফুটাইল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় নেপালপুরের মুসলমান জোলাদের একবার সুদিন আসিয়াছিল। রাজেশ্বর তাদের ঘরে বহু টাকা তুলিয়া দিয়াছে। নিজেও অনেক রোজগার করিয়াছে। মাঝে জোলাদের কারবার একটু মন্দা পড়ে। গান্ধী আন্দোলনে আবার সুদিন ফিরিল।

জোলারা গরু কিনিল, জমি কিনিল, টিনের ঘর তুলিল। কেহ বা নূতন দুইটি একটি বিবিও আনিল।

মহেশ্বর জেলা ও প্রাদেশিক কমিটিতে প্রতিমাসে রিপোর্ট পাঠায়। মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্নানাথকে চিঠি লেখে। জ্যোৎস্নানাথ উৎসাহ দিয়া চিঠি দেন। একবার তিনি লিখিলেন, দেশবন্ধু তোমাদের কাজে বড় খুশি হয়েছেন। বলেছেন, এবকম লোক দু পাঁচশো থাকলে দেশের আর কোন ভাবনা ছিল না। তোমার বাবাকে এই খবরটা দিও আর আমার নমস্কার জানিও।

রাজেশ্বর শুনিয়া বলিল, দেশবন্ধু বলেছেন! বল কি মহেশ?

লাখ লাখ টাকার কাজের অর্ডার পাইয়াও এতটা আনন্দ তার কোন দিন হয় নাই।

মঞ্জরীতে এবার জেলা কনফারেন্স। ব্রাহ্মণ জমিদার চিরঞ্জীব রায় চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক মহেশ্বর। কালীপ্রসন্ন বাবু কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। জেলা ও মহকুমার বহু নেতা উপস্থিত হইলেন। আসিলেন জ্যোৎস্নানাথ, সঙ্গে সুপ্রভা। সভাপতি ও জ্যোৎস্নানাথকে গার্ড অব অনার দিল শান্তিসেনার দল।

বিলাঞ্চলে প্রাপ্ত তাম্র শাসন, পুরাতন একাদশ শতাব্দীর সূর্যমূর্তি, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায়গণের হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি, মধুসূদন সরস্বতীর বাড়ীর ছবি, পরগনার আর্টিষ্টদের আঁকা তৈলচিত্র, নানা রকম জোলার কাপড়, চরকা, শামুকের খেলনা, বনশিয়ার দা কাঁচি, কাটারি, সুন্দর সুন্দর কাঁথা এবং আরও অনেক জিনিস প্রদর্শিত হইল। এস্তাজের দল লাঠি খেলা দেখাইল। ব্রজরাখালের ভাই নবগোপাল লক্ষ্য ভেদে সকলকে চমৎকৃত করিল। জ্যোৎস্নানাথ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

এতবড় ধুমধাম এ অঞ্চলে আর হয় নাই। মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজনা, ঘনাঘন বন্দেমাতরং ধ্বনি ও স্বদেশী সঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখরিত।

বিশ পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূর হইতে চাল চিঁড়া বাঁধিয়া, কৃষকের দল পায়ে হাঁটিয়া গান্ধীরাজ দেখিতে আসিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করে, গান্ধী কে? কেহ বলে, আমাগো থানা হবে কোথায়? মাজেষ্টর কেডা? দারোগা সাইবই বা কোন জন?

কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিল সুপ্রভা, তার সঙ্গে একদল স্বেচ্ছাসেবক। গানটা লেখে ব্রজ রাখাল।

(১)

জাগো মঞ্জরী জাগো
মজুর কিষাণ যত
দেশের সেবায় সবে লাগো
জাগো মঞ্জরী জাগো।

(২)

জাগো মঞ্জরী জাগো
বীরের এ সংগ্রাম
আর কারও নাই ঠাঁই
ভীরু দুর্বল সবে ভাগো
জাগো মঞ্জরী জাগো।

(৩)

জাগো মঞ্জরী জাগো
মহান্ এ ব্রত তব
ব্রত উদ্‌যাপনে
জননীর আশিষ মাগো।
জাগো মঞ্জরী জাগো।

কন্‌ফারেন্সের পর নেতারা সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। আছেন শুধু জ্যোৎস্নানাথ আর সুপ্রভা। জ্যোৎস্নানাথের একটু বিশ্রামের দরকার। তাঁর ইচ্ছা এই সুযোগে বাংলার পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হন। রোজই তিনি সুপ্রভা ও মহেশ্বরকে লইয়া বাহির হন। কোনদিন নৌকায় যান, কখনও বা হাঁটা পথে।

সুপ্রভার সান্নিধ্যের জন্য মহেশ্বরের উৎসাহ বাড়িয়াছে। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখায়, বলে, পনর বছরের আগের মঞ্জরীর গল্প। খালটা তখন এর চেয়ে অনেক বড় ছিল। তখন কচুরিপানায় জলপথ বন্ধ হইয়া যাইত না। এই ধরনের পানার জন্ম গত মহাযুদ্ধের সময়, তাই এর নাম জার্মান কচুরি।

সুপ্রভা বলে, শস্যের তো ভারী ক্ষতি করছে এতে।

হ্যাঁ রক্তবীজের বংশের মতন এর বাড়তি।

পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে জ্যোৎস্না নাথ ও সুপ্রভার কোন পরিচয় ছিল না। এবার তাঁরা দেখিলেন দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ। ছেঁড়া হোগলার উপর মরণাপন্ন রোগী শুইয়া, কাঁথা নাই, বালিশ নাই। ঔষধ ত' দূরের কথা, সময় মত পথ্যও পায় না। প্রায় পরিবারের ছেলে মেয়েরাই আট নয় বছর পর্যন্ত দিগম্বর হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সর্বত্র এই একই দৃশ্য। এর উপর আছে শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার।

জ্যোৎস্না নাথ বলেন, এই আমার দেশ, আমার পল্লীমাতা। বইতে অনেক কিছু পড়েছিলাম, পল্লীবধূর রূপ, কৃষকের স্বাস্থ্য, তাদের ছেলের শুভ্র উজ্জ্বল হাসি, গোবর নিকান ঝকঝকে তকতকে ঘর—আর দেখলাম এই দৃশ্য।

কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হইয়া আসে। ধীরে ধীরে তিনি বলেন, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।

একদিন গ্রামের শিক্ষাব্রতী তরণী সেন বলিলেন, শুধু কি তাই? আমরাও যে এদের কি ভাবে শোষণ করি তা আপনারা জানেন না। তরণী বাবু ভূস্বামীদের শোষণের গল্প করিলেন। বলিলেন, দারোগার

দালালদের মামলা বাঁধাইবার ফন্দি। ঝগড়া বাঁধাইয়া উভয় পক্ষ হইতে তারা টাকা খায়। টাকা নেয় দারোগার নামে। বলে, না দিলে শুধু এ মামলাই যে হারবি তা নয়। আরও অনেক বিপদ আছে। এই দালালের ভয়ে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত। এরাই আবার আজ-কাল মোড়ল, মাতব্বর।

তারপর আছে সুদখোর। জিনিস বা জমি বন্ধক রাখিয়া টাকায় মাসে এরা এক আনা সুদ নেয়, মাসে মাসে সুদের চক্রবৃদ্ধি।

জ্যোৎস্না নাথ বলিলেন, Cut-throats. বিশেষ আইন করে এই শয়তানের দলকে সাজা দেওয়া উচিত।

তারকেশ্বরের স্ত্রী উমা খাবার লইয়া আসিয়াছিল। কথাটা তার কানে গেল।

জ্যোৎস্না নাথ বলিলেন, ইচ্ছে হচ্ছে কিছুদিন থাকি এখানে। তুমি থাকবে সুপ্রভা?

মাসীমাকে দেখবে কে?

তিনি এখানে এসে থাকবেন।

আশ্রম ছেড়ে আসতে তাঁর কষ্ট হবে। শরীরের পক্ষেও তা ভাল হবে কিনা সন্দেহ।

বেশ, তুমি তাঁকে নিয়ে কলকাতায় থেক, আমি মঞ্জরীতে এসে কিছুদিন রাজেশ্বর বাবুর সঙ্গে কাজ করব।

রাজেশ্বর বলিল, মঞ্জরীর তা' হলে খুব সৌভাগ্য বলতে হবে।

কয়েকদিন পরে জ্যোৎস্না নাথ ও সুপ্রভা রওনা হইলেন। জ্যোৎস্না নাথ বলিলেন, মাসখানেকের মধ্যেই তিনি আসিয়া আলোক আশ্রমে যোগ দিবেন।

ষ্টেশন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেল মহেশ্বর। পথে অনেক কথাই হইল। জ্যোৎস্না নাথ বলিলেন, দেশ ত' সে রকম প্রস্তুত হয় নি, আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে দেখছি।

মহেশ্বর বলিল, বিরাট এ দেশের তুলনায় কাজ ত আমাদের কিছুই হয় নি। বাকী এখনও ঢের। লোকে সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করতে চায় না। স্বরাজ আমাদের আসবে কি করে?

স্টীমার ছাড়িয়া দিলে মহেশ্বরের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইল। এ কার জন্য? সুপ্রভার? কোন মেয়ে যে তার জীবনে আর প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে মনে করিত অমলার সঙ্গেই ঐ অধ্যায়ের শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তা ত' নয়। সুপ্রভার কথা যত ভাবে ততই তাকে বেশী করিয়া ভাল লাগে।

এর কয়েকদিন পরে তারকেশ্বর স্ত্রীর হাতে একটা সোনার সাতলহরী দিয়া বলিল, সাবধান করে তুলে রাখ। মুনিব বাড়ীর ছোট মুনিব বড় সাধ ক'রে তৈরী করেছিলেন, ছোট ঠাকরুনের জন্য।

উমা বলিল, ত্রিশ টাকায়!

তারকেশ্বর কহিল, হ্যাঁ, আর খালাস করতেও হবে না। অলক্ষ্মী ওদের সংসারে বাসা বেঁধেছে।

উমা বলিল, তুমি এ কারবার ছেড়ে দাও। লোকের এতে অভিশাপ পড়ে, পাঁচ জনে নিন্দেও করে।

অভিশাপ না ছাই। ও আমি ভয় করি না। নিন্দে আবার করলে কে?

জ্যোৎস্না কাকারা সেদিন বলেছিলেন, মহাজনরা দেশের সর্বনাশ করল। ওরা দেশের শত্রু, শয়তান।

পিতার অজ্ঞাতে তারক মোটা সুদে বন্ধকী কারবার করে। রাজেশ্বরেরও এই কারবার ছিল। সে চক্রবৃদ্ধি সুদ নিত না, সুদ ছাড়িত, পীড়ন করিত না। তাতে লোকের সাহায্যই হইত বেশী। তারকেশ্বরের কারবার ঠিক তার বিপরীত।

সে বলিল, রাত দুপুরে ঘরের কড়ি বার করে দিয়ে পরের উপকার করি এই আমাদের অপরাধ?

অত সুদ নাও—

বেশী আর কি নেই? পুরো ষোল আনার টাকাটা দিয়ে মাত্র চার পয়সা সুদ নেই। টাকা না দিলে দেশের হা-ঘরে, হা-ভাতেরা বাঁচত কি করে?

উমার মনে পড়িল তার পিত্রালয়ের কথা। মাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্ব হইতে জল খাওয়ার শেষ পাত্রটি টানিয়া বাহির করিবার করুণ দৃশ্য। সে চুপ করিয়া রহিল।

তারকেশ্বর আবার বলিল, 'ওদের কথায় কান দিও না।

তার বাবা তিন দিনে আট হাজার টাকা খরচা করিয়া গ্রামে সভা করেন। জ্যোৎস্না নাথ মাসিক পনর হাজার টাকা আয়ের প্রাকটিস্ ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে গান্ধীর জয়গান গাহিয়া বেড়ান। এ সবের অর্থ তারক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে ভাবে, এ যেন এক পাগলের মেলা বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা করে, হয় ত উমাও ঐ দলে ভিড়িয়া পড়িবে

টেনিসের ল্যনে অমলার বন্ধু ঝঞ্ঝা মুকুন্দেব সঙ্গে তার পরিচয় করাইয়া দেয়, ইনি যেমন ভাল খেলোয়াড় তেমনি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র এবার ফাইনান্স দেবেন, আর ইনি অমলা রায়—

তাব কথা শেষ হইবার আগেই মুকুন্দ আগাইয়া ঘাড় একটু বাঁকাইয়া বলিল, ওঃ ডিয়ার ডিয়ার। খেলতে খেলতেই আপনাকে লক্ষ্য করেছি। আপনি তারার মতন জ্বলজ্বল করছিলেন।

এতগুলি মেয়ের সামনে নিজের রূপের এই প্রশংসায় অমলা ভারী খুশি হইল। কিন্তু রাগিল ঝঞ্ঝা, রাগিল আশে পাশের আরও দুই চারটি মেয়ে। একজন মুকুন্দের মুখের উপরই বলিল, What a pity.

মুকুন্দের উন্নত দোহারা গড়ন, চুলগুলি ব্যাকব্রাশ করা, মুখে খেলোয়াড় সুলভ সপ্রতিভ ভাব। টেনিস স্যুটে তাকে সুন্দর মানাইয়াছিল। লোকটি ভারী মডার্ণ, যেন যুগের আগে আগে চলে। অমলার মনে হইল, ঠিক এই রকম লোকই তার পছন্দসই।

অল্পেই তাদের আলাপ জমিল এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে ঝঞ্ঝার সঙ্গে অমলার মনান্তর ঘটিল।

ক্রমে ক্রমে মুকুন্দ নিজের পরিচয় দিল, My governor is an executive officer some where in Behar. (বেহারের কোন জায়গায় আমার বাবা শাসন বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী)। আর একদিন জানাইয়া দিল শীঘ্রই সে বিলাত যাইতেছে। কথাটা ইংরেজীতে এমনভাবে বলিল, যাতে মনে হয় বিলাত দেশটা তার

বিশেষ পরিচিত। তাদের পরিবারের সেখানে যাতায়াত আছে। আর তা ছাড়া বাংলা দেশে শিক্ষার ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তার প্রতিভা ও আকাঙ্খার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়।

ঠিক এই সময় ত্রিগুণা মহেশ্বরের সঙ্গে অমলার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চিঠি লেখে। অমলার দিদি তাকে বলিল, মহেশকে ত' চিনিস, ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র, ঈশান স্কলার, বাপও বড়লোক।

অমলা বলিল, সবিতাদির বাড়ীতে দেখেছিলাম বটে। বড়লোক নাকি? তা ত' জানতুম না। তবে শুনছি ওদের চাষবাস ভাল।

তার ভাব গতিক দেখিয়া বিমলা ত্রিগুণাকে লিখিল, মহেশ ও অমলার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আছে আপনার এ অনুমান ভুল। অন্ততঃ অমলার দিক দিয়ে কোন আকর্ষণই নেই এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আজকাল করিয়া মুকুন্দের বিলাত যাওয়া আর হইল না তবে এলাহাবাদ যাইয়া সে ফাইনান্স পরীক্ষা দিয়া আসিল।

মুকুন্দ এবার ব্রাহ্মধর্ম আলিঙ্গন করিল এবং তিন সপ্তাহ পরে অমলার সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া গেল। অমলা ভারী সুখী। মনে করে তার মত ভাগ্যবতী কয়জন? মুকুন্দের মতন মানুষ তার জন্য সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ধর্ম ত্যাগ করে, পিতার বিরাগ-ভাজন হয়। মানুষ হিসাবে সে অতুলনীয়।

কিন্তু অমলার এই তাসের ঘর দুদিন পরে ভাঙিয়া পড়িল। মুকুন্দ ফাইনান্স পাশ করিতে পারিল না। অমলা দেখিল, তার স্বামীর বিলাত যাওয়ার মতন আর্থিক সচ্ছলতা কোন দিনই ছিল না। অবস্থা অতি সাধারণ। তার বাবা সাঁওতাল পরগনায় পুলিসের সাব্-ইনস্পেক্টর। মুকুন্দ তার প্রথম পক্ষের সন্তান। ভদ্রলোক দ্বিতীয় সংসার লইয়াই ব্যস্ত। অমলা মনে করে, মুকুন্দ আগাগোড়াই তাকে

প্রবঞ্চিত করিয়াছে। মিথ্যার এই জাল বুনিয়াছে শুধু তাকে পাইবার জন্য—

স্বামীকে সে ক্ষমা করিতে পারে না। মাঝে মাঝে সে ইঙ্গিতে কথাটা তোলে কখনও বা খোলাখুলিই বলে, কি বিলাত যাওয়ার কি করলে ?

মুকুন্দের রাগ হয়। ভাবে এমন সহানুভূতি শূন্য স্ত্রী জীবনের মস্ত বড় অভিশাপ। ফাইনান্স পরীক্ষা ফেল করিয়া এমন কিছু অপরাধ সে করে নাই। অনেক ভাল ছেলেও ফেল করে। তার বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় নাই। মোটের উপর অমলার নিকট তার অপরাধ যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অমলার রূপ আছে বটে, কিন্তু ত্রুটিও ত কম নয়। সে প্রজাপতির মতন নিজের সৌন্দর্য লইয়াই ব্যস্ত। সে চায় পাঁচজনে তাকে দেখুক, দেখিয়া মুগ্ধ হোক।

আর অমলা মনে করে, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের কী পার্থক্য ! কী সে আশা করিয়াছিল, আর পাইলই বা কতটুকু ?

মুকুন্দ নতুন উকিল, রোজগার নাই কিন্তু ঠাঁট আছে। বৈঠকখানা, আইনের বই আলমারি, মুহুরী সবই আছে, নাই শুধু মকেল। লোককে আপ্যায়িত করিবার জন্য অমলার মধ্যে মধ্যে চা যোগাইতে হয়। তার উপর আছে রান্না, বাসন ধোয়া, সংসারের সমস্ত রকম কাজ। পরিশ্রম ও দারিদ্র্যে অমলার অমন যে রূপ তাহাও ম্লান হইয়া যায়।

মুকুন্দ আজকাল আর "ও, ডিয়ার, ডিয়ার" বলে না। সেই ব্যাক-ব্রাশ করা পমেটম মাথা চুল আর নাই। নাই সেই সপ্রতিভ ভাব।

আজ তার মনে পড়ে ছাত্র জীবনের কথা। এই সেদিনকার সেই অতীত সর্বদাই যেন বর্তমানকে ব্যঙ্গ করে।

এই দম্পতির জীবন শুধু সংগ্রাম ও ব্যর্থতার ইতিহাস। ভিতরে ও বাহিরে দ্বন্দ্ব সর্বত্র। বাহিরে পাওনাদারের তাগাদা, ভিতরে

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সহানুভূতির অভাব। মনের মিলন ত নাইই বরং পরস্পরের প্রতি বিরক্তি ও সন্দেহ। মুকুন্দ স্ত্রীকে সন্দেহ করে, সে ভারী পুরুষঘেঁষা। পাঁচটি তরুণের সঙ্গে মেশার তার খুব আগ্রহ, গায়ে পড়িয়া মেশে, হাসাহাসি করে।

মুকুন্দ পরিশ্রম করিত খুবই। সে ছিল আশাবাদী। খানিকটা ভগবৎ বিশ্বাসী। ভাবিত, বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন, সুদিন আসিবে কিন্তু সুদিন আসিল না। আসিল ব্যাধি। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সে শয্যাশায়ী হইল।

প্রথম দিকটায় ভাল চিকিৎসাই হইল না। রোগ বেশ বাড়িয়া গেলে অমলার দিদিরা কিছুদিন চাঁদা করিয়া চালাইল। তার বৃদ্ধা মা জামাইর জন্য সঞ্চিত শেষ কপর্দক ব্যয় করিলেন।

মুকুন্দের পিতা কোন সাহায্যই করিতে পারিলেন না। শুধু সহানুভূতি জানাইয়া পুত্রবধুকে একখানা কার্ড লিখিলেন। তার শেষ দিকটায় ছিল, গত পরশু রাত্রে তোমার শাশুড়ী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রসব নির্বিঘ্নেই হইয়াছে। প্রসূতি ও শিশু উভয়েই ভাল আছে। শিশুটি দেখিতে ভারী সুন্দর হইয়াছে। লোকে বলে, তার মায়ের মতন।

বৃদ্ধ শ্বশুরের এই পত্র পড়িয়া অমলা একটু হাসিল। দুঃখের দিনে ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে সে অনেকটা মানাইয়া লইয়াছিল। স্বামীর সেবা-যত্নে তার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু মুকুন্দের মেজাজ আজকাল রুক্ষ। কথায় কথায় ত্রুটি ধরা, অপমান করা এসব লাগিয়াই আছে। অমলা কোন প্রতিবাদ করে না, নীরবে সব সহ্য করিয়া যায়।

এই সময় হাজারিবাগে বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয়। তারা ছিল পরস্পরের প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়ী। বীরেশ্বর এই সুন্দরী তরুণীর সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে নীরবে সেবা করে। এর উপর আছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। বীরেশ্বর

ভাবে বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ের কী অসীম ধৈর্য্য। সে অমলাকে দিদি বলিয়া ডাকে। তাকে সোজাসুজি সাহায্য করিতে ভরসা পায় না। আজ দিদিকে একখানা কাপড় উপহার দেয়, কাল মুকুন্দ বাবুর জন্য একটি ফ্লানেলের শার্ট লইয়া আসে। ডাক্তার ব্যবস্থা করা মাত্রই প্রেস্ক্রপসন চাহিয়া লয়। ঔষধ কিনিয়া আনে, বলে, চেনা ডাক্তারখানা, এদের ওষধ্ খুব ভাল, তাই নিয়ে এলাম। অমলা দাম দিতে চাহিলে বলে, ব্যস্ত কি, ওদের কাছে আমার ক্রেডিট আছে।

একদিন সে একটা মুরগী আনিয়া বলিল, ডাক্তার আমাকে খেতে বলেছেন। আমি আজ থেকে এখানে এসেই খাব। কি বলেন দিদি? আর চাকরটা যা হয়েছে, সুপ মোটেই করতে পারে না।

ডাক্তার মুকুন্দকেও সুপ খাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যহ দেওয়া সম্ভব হইত না।

অমলা হাসিয়া বলিল, দিদির মান রক্ষে করে সাহায্য করতে ভাই আমার বড় ওস্তাদ। শেষের দিকটায় তার গলা কাঁপিয়া গেল।

বীরেশ্বর বলিল, এ কি বলছেন দিদি?

মুকুন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, দিদি তোমার অভিনয় করতে ভারী ওস্তাদ। এরপর আরও কত দেখবে।

অমলার মুখখানা একেবারে লাল হইয়া গেল—তার স্বামী তাকে নাহক এতটা অপমান করিল।

মুকুন্দ আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল, সে বলিল, মেয়ে মাত্রেই অভিনেতা। অমলা তাদের মধ্যে ক্লাস ওয়ান্।

অমলা সারাদিন জল গ্রহণ করিল না। রাত্রে আসিয়া সব শুনিয়া বীরেশ্বর দিদিকে সাধ্যসাধনা করিল।

অমলা বলিল, আমার জন্য কেন তুমি অতটা কর? আমি তোমার কে?

মুকুন্দ অমলাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে, বীরেশ্বর এলেই তোমার মুখখানা বেশ হাসিহাসি হয়। একদিন বলিল, আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা সমবয়সীদের বেশী ভাল বাসে। এখন দেখছি ছোটদের উপর তাদের টান আরও বেশী হয়। বলিয়াই শুরু করে, অতীত জীবনের গল্প। কোন এক পাতানো দিদি তাকে কি রকম আদর করিতেন সেই কাহিনী। হাসিতে হাসিতে মন্তব্য করে, পাতান মা, পাতান দিদি এদের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশী গভীর হয়। নিজের মা বোনের সঙ্গে মানুষ অতটা বাড়াবাড়ি করে না, করতে পারে না।

স্বামীর এই নির্লজ্জতায় অমলা লজ্জা বোধ করে। বলে, শুনলে বীরু কি ভাববে বল দেখি ?

মুকুন্দের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়। মেজাজও রুক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বলে, All that glitters is not gold. অন্ততঃ সুন্দরীর সম্বন্ধে এ কথা ভারী সত্যি।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে তার খুব উঁচু ধারণা ছিল। বীরেশ্বরের সামনে অমলকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, মনে পড়ে Full many a gem of purest ray—গ্রের কবিতা ? এর জলজ্যান্ত উদাহরণ আমি। এসেছিলাম শক্তি নিয়ে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। এরই নাম বিধিলিপি। তার মুখে ফুটিয়া উঠিল স্পোর্টসম্যান সুলভ দীপ্তি। এই দীপ্তিই প্রথম দিন অমলাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

তার অমলাদির সুখ দুঃখের মধ্যে বীরেশ্বর নিজেকে মিলাইয়া দিয়াছে। তার সেবায়ই বীরেশ্বরের তৃপ্তি। মেজদাদার বিবাহে দেশে না গেলে বাবা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইবেন তাহা সে জানিত, তবু গেল না। দিদির প্রতি কর্তব্যই তার কাছে বড় হইয়া উঠিল। মহেশ্বরকে লিখিল, সদ্যশোকাতুরা দিদিকে ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব।

মুকুন্দের মৃত্যুর পর অমলার মা তাকে এটোয়ায় বা ঢাকায় যাইতে লিখিলেন। অমলা গেল না। শেষটায় মায়ের কড়া হুকুম আসিল চিঠি পাওয়া মাত্র এটোয়ায় চলে আসবে। নইলে জেনো আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

হাজারিবাগে বহু বাঙ্গালীর বাস। অনেকেই পরিচিত। তারা পাঁচজনে পাঁচটা কথা বলিতে পারে এই ভয়ে অমলা ও বীরেশ্বর শেষটায় হাজারিবাগ ত্যাগ করিল। গেল ভাইজাগে। সেখানে বাঙালী খুব কম। কাহারও সঙ্গে মিশিতে হয় না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। দিন বেশ কাটিয়া যায়।

সকাল বৈকাল তারা সমুদ্রের তীরে বেড়ায়। কখনও যায় ডলফিনস্ নোজে পাহাড়ের উপর। সেখানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের শোভা দেখে। সাগরের বিশালতায় মন গভীর বিস্ময়ে ভরিয়া ওঠে। সাগরের কী রূপ, যেন গালানো হীরাকষের অনন্ত প্রবাহ।

একদিন বীরেশ্বর অমলার হাত ধরিয়া বলে, তুমি ঐ সাগরেরই মতন মহান্ সুন্দর। অমলা হাসে।

নরসিংহ দেবের মন্দিরে দাঁড়াইয়া বীরেশ্বর একদিন বলিল, এস দেবতা সাক্ষী করে আমরা এক হয়ে যাই।

অমলা বলিল, আমি দেবতাকে মানি না। কিন্তু তুমি মান। দেবতাকে নিয়ে এ রকম খেলা করতে নেই।

বীরেশ্বর উত্তর করে, তা বটে, খেলা করতে আছে শুধু মানুষকে নিয়ে।

অমলা চাহিয়া দেখিল, বীরেশ্বরের চোখ দুইটা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। অমলার দৃষ্টির সামনে বীরেশ্বর চোখ নীচু করিল বটে কিন্তু অমলাও ভয় পাইল। ভয় তার এই প্রথম। আজ বুঝিল যে এতদিন সে আগুন লইয়া খেলিয়াছে।

তার স্নেহ যত্নে বীরেশ্বর বেশ একটু সারিয়া উঠিয়াছিল। এই ঘটনায় তার শরীর আবার ভাঙিতে লাগিল। মেজাজ রুক্ষ হইয়া গেল। কারণে অকারণে অমলাকে সে কড়া কড়া কথা শুনায়। আবার কখনও ক্ষমা চায়। বালকের মতন কাঁদিয়া ফেলে, বলে, দিদি আমি ভারী দুর্বল। তার মনে তখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একবার ঝড় ওঠে আবার শান্ত হয়। একদিন সে অমলাকে বলিল, তুমি যে এমন করে ঠকাবে তা কখনও বুঝতে পারি নি।

অমলা উত্তর করিল, ঠকাই নি ভাই। ভাল আমি খুবই বাসি, ঠিক ভাইয়ের মতন।

বীরেশ্বর গর্জন করিয়া উঠিল, Oh damn it.

অমলা চুপ করিয়া রহিল।

পরিস্কার আকাশ। অমলা বীরেশ্বরের শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল অনেক কথা। বীরুর অবস্থা খারাপ বলিয়া রাজেশ্বরকে তার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি আসিলেন না। তবে কি রাগ করিলেন? বীরেশ্বর তার করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, বাবাকে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?

কিন্তু অমলা জানে বীরেশ্বরের বাবা তার উপর কখনই রাগ করেন নাই। তাঁর প্রত্যেকখানি চিঠি কী সুন্দর, কী গভীর স্নেহে ভরা। বিশ্ব যখন রাগ করিল তখন তিনি ক্ষমা করিলেন। আত্মীয় স্বজনরা দুজনকেই কড়া চিঠি লিখিলেন, রাজেশ্বর পাঠাইলেন আশীর্বাদ। অমলা মনে করে তিনি রাগ করিয়া থাকিলে তার জন্য দায়ী সে নিজে। দায়ী

তার ভুল, তার মোহ। আর সেই মোহের পথেই আসিল যত অমঙ্গল।

মুকুন্দের ধরন ধারনের মধ্য দিয়া প্রথমে এই অনর্থের আবির্ভাব। তারপর হইতে বরাবরই সে ভুল করিয়া আসিয়াছে। বীরেশ্বরের বেলায় তারই পুনরাবৃত্তি করিল। ভাবিতে ভাবিতে তার মনে পড়িল মৃত স্বামীকে, মহেশ্বরকে।

বেলা প্রায় দশটা। জানালার লাল শার্শির উপর সূর্যের আলো ঝলমল করে। তারই রক্তিম আভা পড়িয়াছে অমলার হিম শুভ্র গণ্ডের উপর। সেই আলোয় তার বাঁ কানের নীল পাথরের ইয়ারিংটাকে উজ্জ্বল দেখায়।

বীরেশ্বর তার চুলের গোছা লইয়া একবার আঙুলে জড়ায় আবার খুলিয়া ফেলে। চাহিয়া দেখে তার অপরূপ রূপ। ধীরে ধীরে বলে, জীবনে পেলাম না কিছুই। ভাগ্যে জুটল শুধু ব্যর্থতা, শুধু ফাঁকি।

অমলা বলিল, কেন, পেয়েছ ত অনেক কিছু।

বীরেশ্বর হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

অমলা চাহিয়া দেখিল, তার ললাটের উপরের নীল শিরাগুলি আরও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দুটি আগের চেয়েও রক্তহীন, ম্লান। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন জ্বলজ্বল করিতেছিল। মহেশ্বরের চোখের সঙ্গে এই চোখ দুটির অদ্ভুত সাদৃশ্য। অমলা ভাবে চোখের এই সাদৃশ্যের জন্যই কি বীরেশ্বরকে তার ভাল লাগিয়াছিল? হয়ত তাহাই।

বীরেশ্বর বলিল, আমার একটা ভিক্ষা আছে।

কি?

বীরেশ্বর চাহিল একটি চুম্বন। শুধু একটি চুম্বন—মৃত্যুর পর যাহা হইবে তার একমাত্র সান্ত্বনা।

অমলা বীরেশের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল মৃত্যুর ছাপ তার মুখের উপর। অথচ কী উদগ্র পিপাসা। সে ভাবিল, এই মরণ পথ যাত্রী স্নেহের এতটুকু নিদর্শন পাইয়াই যদি খুশি হয়, হোক।

মাথা নীচু করিয়া অমলা তার কপোলে ওষ্ঠ স্পর্শ করা মাত্রই বীরেশ্বর তার মুখখানা দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে ছাইয়া ফেলিল। অমলা বাধা দিল না। মাথা একটু সরাইয়াও নিল না। তার বুক তখন দ্রুত কাঁপিতেছিল।

বীরেশ্বর হাঁপাইয়া পড়িল। অমলা এবার ধীরে ধীরে মাথা সরাইয়া নিল।

এই সময় বাহিরে শোনা গেল গলা খাঁকরির শব্দ। বীরেশ্বর শশব্যস্তে বলিল, দেখ ত', বাইরে বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি।

অমলার কেশ সুবিন্যস্ত করারও সময় ছিল না। সে ছুটিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিল, সৌম্য সুদর্শন এক প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া। গায়ে তার দুগ্ধ ধবল গরদ, পরনে সাদা ধুতি। পায়ে সাদা জুতা যেন শুভ্রতার জ্বলন্ত মূর্তি।

রাজেশ্বর অমলার অপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, তুমিই অমলা ?

অমলা সম্মতি সূচক মাথা নাড়িল।

রাজেশ্বর বলিল, চল মা, ভিতরে চল। বীরেশ কেমন ?

রাজেশ্বরের সম্বন্ধে অমলা অনেক কিছুই শুনিয়াছিল। মনে মনে সে তাঁকে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু মানুষটা যে এত বড় তার পরিচয় পাইল রাজেশ্বরের ক্ষমাসুন্দর কণ্ঠে। অমলা গলায় কাপড় জড়াইয়া উবু হাঁটু হইয়া তাকে প্রণাম করিল।

রাজেশ্বরের চোখ বাষ্পার্দ্র হইল। সে আশীর্বাদ করিল, রাজরাণী হও মা।

অমলা নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। বলিল, ক্ষমা করুন আমায়।

তার দুই দিন পরে বীরেশ্বরের মৃত্যু হয়। সে বাপের হাত ধরিয়া বলে, অবাধ্যতা করে শেষটায় তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।

আর একটা কথা, অমলাদিকে তোমরা ভুল বুঝ না। তুমি—দাদা—। আমিও প্রথমে ওকে চিনতে পারি নি।

রাজেশ্বর বলিল, না ভুল বুঝব কেন? মাকে দেখা মাত্রই আমি চিনেছি।

বীরেশ্বরের মুখে হাসি ফুটিল। মরার আগে তার অমলাদির সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল।

রাজেশ্বর অমলাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলে বাড়ীর সকলেই বিস্মিত হইল। নরেশ্বর একটু বিরক্তও হইল। ভাবিল, ক্ষমারও একটা সীমা থাকা উচিত। তার পিতার এটা ক্ষমা নয়, ভুল, মতিভ্রম।

রাজেশ্বর জবাকে ডাকিয়া বলিল, আমার অমু মাকে নিয়ে এসেছি। ও এখানে থাকবে।

জবা বীরেশ্বরের জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল, এবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমলার অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। সে অপরাধীর মতন চুপ করিয়া থাকে। সদা সর্বদাই সঙ্কোচ বোধ করে। কেহ কিছু বলে না, অমর্যাদা দেখায় না, অসম্মান করে না। করিলে বোধহয় ভাল হইত, সে খানিকটা শান্তিলাভ করিত। আবার ভাবিল, না অতটা ক্ষমার যোগ্যও ত' সে নয়।

শেষটায় সেই প্রার্থিত শান্তি মিলিল। দুঃখীর মা প্রথম কয়দিন রাজেশ্বরকে দেখে নাই। সে দিন তাকে সামনে পাইয়া বলিল, আমার বীরুর করলা কি? আমার ছোট দুঃখীরামের।

বহুদিন পরে দুঃখীর মা কথা বলিল আজ এই প্রথম। বলে, খালি দুঃখীরামের কথা, বীরেশ্বরের কথা। তারা দুইজন তার রাম আর লক্ষ্মণ।

একদিন অমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, ও রূপসী, তুমি উড়িয়া আইলা কবে? আমার বীরুরে চেনো? একটা সুন্দর মাইয়ারে সে ভালবাসত। মাইয়াটা ডাইনি, বোঝ্‌ছো?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া ওঠে। কেহ তাকে কিছু বলে নাই, সেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু কেনই যেন অমলাকে দেখিলে সে বিরক্ত হয়। বৃদ্ধার ধারণা তার বীরুর সঙ্গে এই রূপসীর কি যেন একটা সম্পর্ক আছে।

এমনি আছে বেশ কিন্তু অমলা সামনে আসিলেই দুঃখীর মার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। আপনা আপনিই সে বলিতে থাকে, রূপ না আগুন—আগুন।

দুই বৎসরের মধ্যে রাজেশ্বর একবারও বীরেশ্বরকে দেখিতে যায় নাই। ছয়মাস সে জেলে ছিল, তার আগে ব্যস্ত ছিল কংগ্রেসের কাজে।

হাজারিবাগে বীরেশ্বরের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। সকলেই মনে করিল ধীরে ধীরে সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। হঠাৎ অবস্থা যে এত খারাপ হইয়া পড়িবে কেহই তাহা বোঝে নাই, রোগী নিজে নয়, ডাক্তাররাও নয়।

তাই পুত্রের মৃত্যুতে রাজেশ্বর বড়ই আঘাত পাইল। বীরুকে দেড় বছরেরটি রাখিয়া চাঁপা মারা যায়, সেই হইতেই তার স্বাস্থ্য খারাপ। কত ঝঞ্ঝাই না এই শিশুর উপর দিয়া বহিয়া গেল। পুকুরে ডুবিয়া যাওয়ার দৃশ্য—বীরুর সর্বাঙ্গে কাদা, ভয়ে সে কাঁদিতেছে, দুঃখীর মা আসিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল—মনে হয়, এই সেদিনের ঘটনা। কিন্তু তারপর কাটিল দীর্ঘ প্রায় দেড়টা যুগ। পরিবর্তন হইল অনেক কিছু। আসিল ধন মান প্রতিপত্তি, অভিজ্ঞতাই বা হইল কত রকমের।

আবার হারাইল যাহা তাহাও বড় কম নয়। চলিয়া গেল পুরাতন যুগ, পুরাতন জীবন, বহু ছাপ, বহু স্মৃতি রাখিয়া। গেল চাঁপা, গেল বীরেশ, গেল টগর।

রাজেশ্বর ভাবে সত্য এর কোনটা? নূতন না পুরাতন, জীবন না মৃত্যু? এক একবার মনে হয় মৃত্যুই সত্য, আবার অনুভব করে চলার পথে সত্য দুটাই, গঙ্গার ধারার পক্ষে যেমন সত্য গঙ্গোত্রি তেমনিই সত্য সাগর সঙ্গম।

চেনা পথ ত ফুরইয়া আসিল। এর পর অজানা সবই, সকলই অন্ধকার। তার জন্যও ত কিছু পাথেয় চাই, তাই রাজেশ্বর সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরঘরে বসিয়া নাম জপ করে, রাত্রে বিশ্রামের আগে করে তাঁরই ধ্যান। শোয়ার ঘরের পাশেই ঠাকুরঘর, মারবেলের মেজে, ছাদ ও দেওয়াল গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা, মাঝখানে সিংহাসন। রাত্রে আলো জ্বালিলে চার ধারের গৈরিক আভায় ঠাকুরের মূর্তি জ্বল জ্বল করিতে থাকে।

এই ঘরের ভার অমলার উপর। সে নিজ হাতে ঝাড় পোঁছ করে, পূজার সাজি সাজায়, ধূপ ধুনা দেয়। দেবতার সঙ্গে সঙ্গে করে রাজেশ্বরের সেবা। যত্ন করে ঠিক মেয়ের মতন। রাজেশ্বর আজ বুঝিল, বীরেশ আত্মীয় স্বজন সব ভুলিয়াছিল কিসের জন্য। অমলার স্নেহযত্নে সে নিজেই শোক দুঃখ ভুলিল, আশৈশব স্নেহ কাঙাল বীরেশ্বর যে সব ভুলিয়া থাকিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

অমলা পাছে সঙ্কোচ বোধ করে এইজন্য রাজেশ্বর তার সামনে বীরেশ্বরের নাম করিত না। অমলাও তার কথা বলিত না।

ক্রমে ক্রমে উভয়েরই এই সঙ্কোচ কাটিল। মৃত এই তরুণের কথাই তাদের আলোচনার একটা প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বীরেশ্বর কি ভালবাসিত, তার মতামত কি ছিল, বলার ভঙ্গীই বা ছিল কিরূপ, আজকাল প্রায়ই এইসব কথা ওঠে। রাজেশ্বর বলে, শিশু বীরেশ, কিশোর ও তরুণ বীরেশের কথা। অমলা করে তার পরিণততর জীবনের গল্প।

গান্ধী আন্দোলনের উপর বীরেশ্বরের ভারী শ্রদ্ধা ছিল। সে প্রায়ই বলিত, শরীর ভাল থাকলে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়তাম, দিদি।

রাজেশ্বর বলিয়া উঠিল, বলত নাকি? চিঠিতে ত' এসব কখনও লেখে নি।—তারপর ধীরে ধীরে যেন স্বগতোক্তি করিল, বীরু ছিল লাজুক, মুখচোরা। ছেলেবেলা মা মরে গেলে অমনটিই হয়।

অমলা একদিনের একটি ঘটনা বলিল।

বসে, বসে বীরেশ একটি মেয়ে ঔপন্যাসিকের ইংরেজী বই পড়ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, উঃ কী সাহস, কী ধৃষ্টতা! এত অপমান কববার ভরসা কবল, শুধু আমরা গোলামের জাত, এইজন্যই ত' ?

জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপাব কি? সে বইখানা আমাব হাতে তুলে দিল।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসু নেত্রে অমলার দিকে চাহিলে সে একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, সেই স্ত্রীলোকটি—মহিলা নামেব সে অযোগ্য—তার নায়কের মুখ দিয়ে বলাচ্ছে, ভারতবাসীকে আবার লজ্জা, ছোঃ, আমবা কী গৃহপালিত পশুকে লজ্জা করি?

রাজেশ্বর বলিল, এই লিখেছে? ইস্। তাব চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল, বইখানা পড়িতে পড়িতে যেমন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল বীরেশ্বরের। একটু পরে রাজেশ্বর কহিল, ছেলেবেলা থেকেই ও দেশকে বড় ভালবাসত।

অমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, বাসবে না? সে যে আপনাব ছেলে—তার দাদা অমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করল, অমন ব্রিলিয়াণ্ট—হঠাৎ মাঝপথে সে থামিয়া গেল।

রাজেশ্বর বড় আনন্দ বোধ করিল, বলিল, নষ্ট নয় মা। পরাধীনের চরম সার্থকতাই ঐখানে।

মহেশ্বর আজ এক বছরের উপর জেলে আছে। কারাগারে নিত্য নূতন বন্দী আসে, দেশভক্তের দল। তাদের কাছেই সে স্বরাজ পার্টির কথা শোনে। দেশবন্ধু নূতন এক প্রোগ্রাম দিয়াছেন, কাউন্সিল দখল করিয়া সরকারের কাজে বাধা ঘটাইবেন, শাসন যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ

করিবে অসহযোগ চালাইবেন। এ বিষয়ে তাঁর সমর্থক মতিলাল ও বিঠলভাই প্যাটেল।

স্বরাজ্য দলের কার্যতালিকা মহেশ্বরের ভাল লাগিল, সে স্থির করিল জেল হইতে বাহির হইয়া এই পার্টিতে যোগ দিবে। এই সময় আসিল বীরেশ্বরের মৃত্যু সংবাদ। মহেশ্বর সেই সঙ্গেই শুনিল তার বাবা অমলাকে আশ্রয় দিয়াছেন। ভ্রাতার মৃত্যু অপেক্ষাও এই খবর তাকে বেশী পীড়া দিল। যে মেয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কনিষ্ঠকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, বাবা তাকে আশ্রয় দিলেন কেমন করিয়া? শোকে নিশ্চয়ই তাঁর বুদ্ধি বৈক্লব্য ঘটিয়াছে।

মহেশ্বর এতদিন ভাবিত কংগ্রেস, স্বরাজ পার্টি, অহিংসা চৌরিচৌরা, এখন তার খালি মনে পড়ে অমলাকে। বীরেশ্বরের কথাও ভুলিয়া যান। তাঁকে যতটুকু মনে পড়ে সে শুধু অমলার সম্পর্কে। সে তাকে কতটুকু ভালবাসিত, বীরেশকেই বা কতটা।

সেদিন সুপ্রভার আসার কথা। পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করার জন্য তারও ছয় মাস জেল হয়। কারাগার হইতে বাহির হইয়া প্রতি ইংরেজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে সে মহেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। শরীর অসুস্থ থাকায় গত মাসে আসিতে পারে নাই।

মহেশ্বর প্রতিবার সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করে। এবার আগ্রহ আরও বেশী। দিনের পর দিন মেয়েটিকে তার আরও বেশী করিয়া ভাল লাগে। সুপ্রভা যেন মাধুর্য দিয়া গড়া, এই মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তার অপূর্ব সমাবেশ! প্রয়োজন হইলে সে কঠোর হইতে পারে, হাসিতে হাসিতে জেলে যায়। আবার রুগ্না মিসেস্ ককাটির সেবা করে ঠিক মেয়ের মতন। বালিগঞ্জে তাদের বাড়ীতে যে সব গরিব ছেলেমেয়েরা সুতা কাটিতে কিংবা লেখাপড়া শিখিতে আসে তারা যেন তার ছোট এক একটি ভাইবোন। সে তাদের খাবার দেয়, জামা

বুনাইয়া দেয়। কারও অসুখ করিলে তার বাড়ীতে যাইয়া ঔষধ পথ্য দিয়া আসে। নবেশ্বরের মত সমালোচকও বলে, এ যুগের মেয়ে বলতে গেলে প্রভাদি।

বৈকালে সুপ্রভা আসিলে মহেশ্বর গরাদের মধ্য দিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। একটু দূরে বন্দুকধারী সান্ত্রী দাঁড়াইয়া, নিকটে একজন বাঙ্গালী গোয়েন্দা।

সুপ্রভা মহেশের প্রসারিত হাত ধরিয়া বলিল, দুমাসে ভারী শুকিয়ে গেছ।

মহেশ কহিল, রোগা হয়েছ তুমিও।

তারপর উভয়েই ব্যাকুলভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে মহেশ ডাকিল, প্রভা।

উত্তরে সুপ্রভা তার হাতে একটু চাপ দিল।

এবার গোয়ন্দা একটু সরিয়া যায়। মহেশ্বর বলে, জান অমলার খবর?

হ্যাঁ, শুনেছি।

বাবা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। কি অন্যায় বল ত'? সুপ্রভা কোন উত্তর করিল না।

মহেশ্বর বলিল, আশ্চর্য যে তিনি ওকে ক্ষমা করতে পারলেন।

সুপ্রভা ধীরে ধীরে কহিল, তোমার বাবা জীবনকে খুব গভীর ভাবে দেখেছেন। তাঁর পক্ষে ক্ষমাই স্বাভাবিক।

কথাটা মহেশ্বরের মনঃপুত হইল না। একটু পরে সে বলিল, আমি কিন্তু পারতাম না। সুপ্রভা কহিল, পারতুম না আমিও।

মহেশ্বর কহিল, আমি বড় দুর্বল। সুপ্রভা উত্তর করিল, দুর্বল আমরা সবাই। মানুষ দুর্বল এইটেই তার খাঁটি পরিচয়।

মহেশ বলিল, তুমি কিন্তু দুর্বল নও। এইজন্য তোমাকে অত ভাল লাগে।

সুপ্রভা হাসিয়া কহিল, তুমি জান না।

গোয়েন্দা হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া জানাইল, আধ ঘণ্টা হয়ে এলো, মল্লিক মশাই।

মহেশ্বর বলিল, হ্যাঁ, আর এই দুমিনিট।

দুই মিনিট সময় তারা পাইল। তারা আগে জানিত না যে এইটুকু সময়ও মানুষের কাছে কত মূল্যবান হইতে পারে।

সুপ্রভার কথায় মহেশ্বরের মনে ক্ষোভ কিছুটা কমিল। কিন্তু অমলাকে পুরাপুরি সে ক্ষমা করিতে পারিল না।

জেলের দরজায় মহেশ্বরকে অভ্যর্থনার জন্য অনেকেই উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসকর্মীরা তার গলায় মালা পরাইল, বলিল, বন্দেমাতরং, গান্ধী মহাত্মা কী জয়।

পিতার পদধূলি লইয়া আর সকলকে নমস্কার করিয়া মহেশ চাহিল সুপ্রভার দিকে। কী আনন্দোজ্জ্বল স্নিগ্ধ চোখ দুটি, কী সুষমা! দেখিলে শুধু ভালই লাগে না, একান্ত আপনার করিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়।

প্রথম কয়েকটা দিন আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিতেই কাটিয়া গেল। তারপরই মহেশ্বর আরম্ভ করিল স্বরাজ পার্টির কাজ। বিভিন্ন পার্কে মিটিং করা, বক্তৃতা দেওয়া, কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লেখা, নূতন কমিটি, সাব কমিটি গঠন ইহা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকে। মধ্যে মধ্যে গ্রামে যাইতে হয়। সেখানেও কাজ ঐ একই, স্বরাজ পার্টির প্রচার।

তাকে উৎসাহ যোগায় সুপ্রভা। মহেশ্বর এক একবার তাকে দেখে আর নূতন প্রেরণা লাভ করে। কী তার উৎসাহ! মডারেটদের, জমিদারের, স্বার্থান্বেষীদের হাত হইতে তারা এসেম্বলি কাউন্সিলের

আসন ছিনাইয়া লইবে। দেশ তাদের দিকে, জনমত তাদের চায়, মহাত্মা স্বরাজ দলকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। কংগ্রেসের নামে তারা প্রার্থী হইবে। জিতিবে নিশ্চয়।

পার্টির কাজে মহেশ্বর বাহিরে সমর্থন ও উৎসাহ পায়, কিন্তু বাড়ীতে পায় শুধু বিরোধ। রাজেশ্বর একজন নো-চেঞ্জার। অর্থাৎ পরিবর্তন সে চায় না, পুরাপুরি গান্ধীবাদী, স্বরাজ দলের সে বিরোধী। নরেশ্বর রাজনীতি চর্চা করে না, কিন্তু বিরোধী সেও।

রাজেশ্বরের ধারণা, কাউন্সিল প্রবেশের এই ছিদ্র পথে নূতন আর একদল মডারেটের সৃষ্টি হইবে। একদল স্বার্থান্বেষী আসিবে, তারা চাহিবে ছেলের জন্য চাকরি, নিজের জন্য মান, অর্থ ও প্রতিপত্তি।

মহেশ্বর মনে করে তার বাবার এ ধারণা ভুল। আয়র্লণ্ডে এই প্রোগ্রাম সফল হইয়াছে। ভারতেই বা হইবে না কেন?

রাজেশ্বর বলে, এক দেশের নজির আর এক দেশে চলে না। এ দেশে এর ফলে হিন্দু মুসলমানে, বর্ণ হিন্দু ও অস্পৃশ্যে কলহ শুরু হবে।

নরেশ্বর বলে, হ্যাঁ বাবা। হবে রুটির টুকরো নিয়ে। গান্ধীবাদের সমর্থক আমি নই কিন্তু এটা বলতে বাধ্য যে তাঁর আন্দোলনের আত্মিক একটা দিক আছে, আছে ত্যাগের প্রেরণা যাতে করে জাতি গড়ে ওঠে। আর এটা হবে মন্ত্রীত্বের লড়াইর আখড়া।

মহেশ্বর বলিল, মাহাত্মা আমাদের সমর্থন করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন।

নরেশ্বর উত্তর করিল, ভুল করেছেন যেমন করেছিলেন চৌরিচৌরার ঘটনার পর আন্দোলন বন্ধ ক'রে।

এই তিন জনের আদর্শের পার্থক্য অনেকখানি। নরেশ্বর ব্যবসা লইয়া থাকে, বোঝে কারবার, লেজার বই, ব্যাঙ্ক, প্রফিট এই সব। অবসর সময় মধ্যে মধ্যে এখনও কবিতা লেখে আর বই পড়ে।

গান্ধীবাদের কথা উঠিলেই সে হাসে—তার চেয়েও বেশী হাসে স্বরাজ্য দলকে। বলে, ওরা হচ্ছে, Neo-Moderates.

রাজেশ্বরও কারবার দেখে কিন্তু তার বেশী সময়ই কাটিয়া যায় পূজা অর্চনায়।

তার আর এক আকর্ষণ চরকা ও তাঁত। অনেক জায়গায়ই চরকা জ্বালানি কাঠে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাজেশ্বরের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের চরকাগুলিতে এখনও সুতা হয়, তাঁতে কাপড় বোনে। এখনও এইজন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করে। কাটুনিদের তুলা দেয়, তাদের সুতা কিনিয়া দেয়। খদ্দর তৈয়ারি করায়, নিজে দোকানে দোকানে যাইয়া এই খাদি বেচে। মঞ্জরীর এই খদ্দর তার ভারী প্রিয় বস্তু। তার দুঃখ এই যে ছেলেরা কেহ ইহার মূল্য বুঝিল না, এই আদর্শ গ্রহণ করিল না।

খদ্দরে লাভ হয় বুঝাইতে গেলেই তারক বলে, জমি বন্ধকে লাভ আরও বেশী।

ছিল এক মহেশ্বর। সেও আর ইহাতে বিশ্বাস করে না। সভায় ও কাউন্সিলে যাইবার আগে চাকরকে বলে, মিটিংএর কাপড় নিয়ে এস। তখন আসে খদ্দর।

এই গোজামিলে রাজেশ্বর আরও দুঃখিত হয়। দেশের সর্বত্র এই যে গোজামিল ইহাতে সুফল হইতে পারে না—কখনও কোন দেশেই হয় নাই।

বাড়ীতে তার একটি মাত্র সমর্থক অমলা। সে সুতা কাটে, কখনও তকলিতে কখনও চরকায়। যে নিষ্ঠা লইয়া রাজেশ্বরের পূজার ঘর সাজায়, সুতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতেও দেখা যায় সেই একই নিষ্ঠা। সে মনে করে ইহা তার আত্মশুদ্ধির উপায়, চিত্তশুদ্ধির এক-মাত্র পথ।

মনে না করিলে হয়ত এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। আধ-পাগল দুঃখীরামের মার 'রূপ না যেন আগুন' তাকে কম পীড়া দেয় নাই, জবা তাকে অপছন্দ করে, উমাও ভাল করিয়া মেশে না। মহেশ্বর জেল হইতে আসার পর অমলার এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু যাইতে পারে নাই রাজেশ্বরের জন্য। তার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে নিজেরই বুকে বাজিয়াছে। সে ভাবিয়াছে আসুক দুঃখ আমার মহেশকে নিয়ে, তার ভাই বীরেশকে নিয়ে। এই যে দুঃখ, এর সান্ত্বনাও ত বড় কম নয়। এই ভাবে পুড়িয়া দিনের পর দিন সে সোনা হইয়া যাইতেছিল।

প্রথম সেদিন রাজেশ্বরকে সে নিজের তৈরি খদ্দর উপহার দেয় সেদিন উভয়েরই সে কী আনন্দ। সে বলে বাবা, এর প্রত্যেকটি সুতো আমি নিজ হাতে কেটেছি, বুনেছিও নিজে।

রাজেশ্বর তার মাথা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, বীরুর শোক আমি তোমাকে দিয়েই ভুলব মা।

তার সমর্থক ছিলেন আরও একজন। তিনি জ্যোৎস্না নাথ ককাটি। এই কর্মী পুরুষ প্রাকটিস ছাড়িয়া সহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া আজও মঞ্জরীর বিলে জলে কাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অহিংসা ও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের বাণী ঘোষণা করেন, প্রচার করেন ছুঁৎমার্গের কুফল। আর মঞ্জরীর আলোক আশ্রমে বসিয়া নীরবে সুতা কাটেন।

এসেমব্লি কাউন্সিলের কথা শুনিয়া হাসেন, বলেন, সর্বনাশ। ঐ ফাঁদে পা দিতে আছে।

কলিকাতা হইতে নেতাদের তার আসিল, কোনও জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁকে দাঁড়াইতে হইবে। স্বরাজ পাটির কর্তারা লিখিলেন, আপনিই এ সম্বন্ধে যোগ্যতম ব্যক্তি। এই কেন্দ্রের সভ্যপদ সরাইলের

জমিদারের রিজার্ভ সিটের মতন। আপনি ছাড়া কেউ আর তাঁকে হটাতে পারবে না।

জ্যোৎস্নানাথ উত্তর দিলেন, ক্ষমা করবেন, আমি অক্ষম।

রাজেশ্বরকে তার নিজের জেলায় এবং আশে পাশের জেলায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে সে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল।

এবার শুরু হইল নির্বাচন। কংগ্রেসের টিকিটে, দেশবন্ধুর আশীর্বাদে একজন বিখ্যাত জমিদারকে তাঁরই জমিদারিতে বহু সহস্র ভোটে হারাইয়া মহেশ্বর কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হইল।

একদিন নরেশ্বর পিতাকে বলিল, দাদার ইচ্ছে প্রভাদিকে বিয়ে করে। সে তোমার অনুমতি চায়। রাজেশ্বর ইহাই আশা করিতেছিল। সে বলিল, আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, অমলাকে কি তুমি ভুলতে পেরেছ? যদি পেরে থাক ত' সুপ্রভার সঙ্গে বিবাহে আমার আপত্তি নেই।

মহেশ্বর বলিল, অমলার কথা থাক।

রাজেশ্বর বলিল, তাকে আমরা ভুল বুঝেছি, তুমি—আমরা সবাই। তোমার ছোট ভাই বলেই বীরেশ্বরকে সে ভালবাসত।

মহেশ্বর সে কথার কোন উত্তর করিল না।

ধনীর ছেলের বিবাহ, পাত্র হাইকোর্টের উদীয়মান উকিল, কংগ্রেসী এম, এল, সি, পাত্রী ব্যারিষ্টার ককাটির পালিতা কন্যা! দেশ হইতে রাজেশ্বরের অনেক আত্মীয় স্বজন আসিল, দরিদ্র চাষী মজুরের দল। নগ্নদেহে, নগ্নপদে তারা ঘুরিয়া বেড়ায়। মেজের মারবেল পাথর দেখিয়া কেহ বিস্মিত হয়, বাতির বালবের উপর বিড়ি ধরাইবার চেষ্টা করে। বাড়ী নোংরা করিয়া রাখে। দেখিয়া রাজেশ্বরের ভারী দুঃখ হয়।

সে চাহিয়াছিল তার জাতির মঙ্গল—তার সমাজ যাতে উন্নত হয় সেই ছিল তার ঐকান্তিক কামনা। নিজের জীবনে সে বাসনা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তার জাতির ত' কিছুই হইল না। এ কাজ বড় বিরাট—তার মতন একজন ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি যে এক জীবনে ইহা সম্পন্ন করে?

বিবাহের রাত্রে বিরাট নগরী যেন এই বাড়ীতে ভাঙিয়া পড়িল। কংগ্রেসী, বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার, নানা জাতির ব্যবসায়ীর সে কী ভিড়। এদের সঙ্গে ছিলেন নরেশ্বরের বন্ধু কয়েকজন সাহিত্যিক।

বাড়ীময় আনন্দ কিন্তু সবচেয়ে বেশী আনন্দ জবার। মহেশ্বর তারই কোলে মানুষ, তাকে বড় মা বলিয়া ডাকে। সে এতদিন বিবাহ না করায় জবা বড় কষ্ট বোধ করিত। আজ মহেশের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সে বৌ আনিতে চলিয়াছে। জবা চায় বৌর কোলে শীগগীরই একটি থোকা আসুক।

সামনের বাগানে গাছে গাছে লাল নীল আলোর মালা, ধুমধাম বাদ্য বাজনাই বা কত, গাড়ীতে মোটরে বাটীর সামনের রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম। দুর্গার ছেলেরা জরির পোশাক পরিয়া বেড়ায়, তার শ্বশুর বেচুরাম গঙ্গাল গলায় পঞ্চায়েতির পুরস্কার ব্রোঞ্জের মেডেল ঝুলাইয়া দরজায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন, পাশে দাঁড়াইয়া একজন নাইট, তাঁরও চাপকানের উপর ষ্টার ও মেডেলের জলুস।

জবার মনে হয় এই আনন্দ ঐশ্বর্য ধুমধাম, এ যেন বাস্তব নয়। বৃন্দাবনকে সে বলিল, মনে পড়ে মঞ্জরীর সেই দিন আর আজ? আমরা যেন স্বপ্ন দেখছি।

বৃন্দাবন বলিল, আরে রাখ মাথামুণ্ডি, এ সকলই রাজু ভাইর হাতের তৈয়ারি—এ হাতেরও কিছু কিছু আছে। হাচা এর সগল।

সেলুনে যাইয়া সে আজ চুল ছাঁটিয়াছে, ধবধবে পাঞ্জাবি পরিয়াছে তার উপর চাদর। বৃন্দাবন বুক উঁচু করিয়া বলে, এ সগলই আমার রাজু ভাইর খদ্দর। বেচুরামকে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমারে বরযাত্রের মতন মানাইছে ত'?

দুর্গা, উমা ব্যস্ত এ বাড়ীর সবাই। অমন যে দুঃখীর মা সেও এক ঝুড়ি পান সাজিয়াছে।

সন্ধ্যার পর বর রওনা হইল। সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া ঠাকুর প্রণাম সারিয়া বীরেশ্বরের ছবির দিকে একবার চাহিয়া রওনা হইবার সময় রাজেশ্বরের মনে হইল অমলার কথা। সে তার ঘরে গেল।

অমলা তখন জানালার গরাদ ধরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। ঐ পথ দিয়া মহেশ্বর সুপ্রভাকে আনিতে গিয়াছে। অমলা ভাবিতেছিল, একদিন ও পথটাও ছিল তারই, নিজের হাতে সে উহা বন্ধ করিল।

রাজেশ্বর ডাকিল, মা।

কি বাবা?

শুনলাম সকাল থেকে তুমি কিছু খাওনি, দুর্গা বলল।

অমলা নীরব।

রাজেশ্বর বলিল, এ দুর্বলতা তোমার সাজে না।

অমলা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তার চোখ দিয়া জল কখনও বাহির হয় না, কোন দুঃখ কষ্টেই নয়। আজ স্নেহ তাহা সম্ভব করিল। তাকে ফল, দুধ ও মিষ্টি খাওয়াইয়া রাজেশ্বর রওনা হইয়া গেল।

পরদিন বৈকালে বর কনে আসিলে সর্বাগ্রে বধূবরণ করিল অমলা। সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে বিধবার এই শুভ কার্য করিতে নাই। সে সুপ্রভার হাত ধরিয়া বলিল, এস দিদি, এস।

বিস্মিত হইল সকলে, সবচেয়ে বেশী রাজেশ্বর। সে কল্পনাও করিতে পারে নাই যে অমলা এক রাত্রির মধ্যে নিজেকে এইরূপ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে।

এই দৃশ্য দেখিয়া দুঃখীর মা বলিয়া উঠিল, এ রূপসী ত' বড় ভাল মাইয়া।

সুপ্রভা শ্বশুরকেও প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল। অমলাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, ভাই অমু—।

ফটকে তখন বধূবরণের সানাই বাজিতেছে।

কয়েক বৎসর পরের কথা। রাজেশ্বরের বাড়ীতে এর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহেশ্বরের স্বরাজ পার্টি ত্যাগ—তার মধ্যে অন্যতম। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বাংলার কংগ্রেসের নেতা হন। কাউন্সিল প্রবেশের কুফল তার আগেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পদলোভী বহু ধনী নাম ডাকের জন্য কংগ্রেসে প্রবেশ করায় কংগ্রেস আদর্শ ভ্রষ্ট হয়। শুরু হয় দলাদলি। ইহাতে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে। আবার প্রাকটিস আরম্ভ করিয়া দেয়। গতবার অল্প দিনেই তার সুনাম হইয়াছিল। এবার প্রথম হইতেই বেশ সুবিধা হইল। বৃহৎ পরিবার, কাজকর্মের অসুবিধা হয় দেখিয়া সে বালিগঞ্জের বাড়ী ছাড়িয়া আলিপুরে এক বাড়ী ভাড়া করিল। আইনের ভাল লাইব্রেরী সাজাইল, প্রাকটিসের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল।

সুপ্রভা ব্যস্ত তার ছেলেকে লইয়া। ছেলে চন্দনকে নিত্য নূতন পোশাকে সাজায়, চাহিয়া চাহিয়া দেখে তাকে কেমন মানাইল। মহেশ্বর স্ত্রীকে উপহাস করে, হবেই ত, বুড়ো বয়সের ছেলে কিনা!

রাজেশ্বর প্রায়ই আসে। দাদুকে দেখিলেই চন্দনের দুষ্ট বুদ্ধি যেন আরও সজাগ হয়। দাদু পুতুল দিলে সে চকোলেট চায়, চকোলেট আনিলে আব্দার ধরে খেলনা মোটরের জন্য। চন্দন দাদুকে কখনও ঘোড়া সাজায়, কখনও বলে, তমি চোল, আম্মি বুল্হি।

সুপ্রভা বলে, কী দুষ্টু হয়েছ চন্দন!

রাজেশ্বর বলে, ছেলেরা ঐ রকমই হয়। কিছুদিন আগেও তারকের ছেলে সান্ ইয়াট সেন আমার চশমা লুকিয়ে রেখে বলত, পাস্তয়া দাও, না হলে দেব না।

প্রত্যেক মানুষেরই স্বতন্ত্র কতকগুলি সত্বা থাকে। কতকগুলি বিভিন্ন মানুষ বা চিন্তাধারা লইয়া এই সত্বার বিকাশ হয়। রাজেশ্বরের এতদিন ছিল চরকা খাদি ও কারবারের জগৎ, এখন আবার নাতিদের কেন্দ্র করিয়া সে আর একটা নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিল। এখানে তিনটি মাত্র প্রাণী। তারকের ছেলে সান্, মেয়ে শিপ্রা আর সুপ্রভার চন্দন। চন্দন তিন জনের মধ্যে ছোট কিন্তু বুদ্ধি তারই সব চেয়ে তীক্ষ্ণ। রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, বল ত চন্দন কাক কি ডাকে।

চন্দন উত্তর করে; কা কা।

বাবা ডাকে না কেন ?

কাকের বাবা নেই, খালি কাকা আছে।

রাজেশ্বর সুপ্রভাকে ডাকিয়া বলে, শোন বৌমা ছেলের বুদ্ধি।

চন্দন ভারী সুন্দর, মুখখানি লাবণ্যে ভরা, ডাগর দুইটি চোখ, টকটকে ফরসা রং, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। দেখিতে খানিকটা অমলার মতন।

রাজেশ্বর ভাবে, বাপ মার মতন না হইয়া চন্দন অমলার মতন হইল কেন ? এই সম্বন্ধে ত্রিগুণাকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, ব্যাপারটা জটিল। তবে আমার অনুমান যে মহেশ অমলাকে ভুলতে পারে নি তাই ছেলের চেহারা তার মতন হয়েছে।

এমন হয় নাকি ?

বলেছি ত' ওটা আমার অনুমান। এমনও হতে পারে যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সুপ্রভা অমলার কথা ভাবত তাই ছেলের চেহারা ঐ রকম হয়েছে।

শেষ অনুমান বরং ভাল কিন্তু প্রথমটা সত্য হইলে চিন্তার কথা। রাজেশ্বর সেইজন্য উদ্বেগ বোধ করে। সুপ্রভা শিক্ষিতা মেয়ে, সে ইহা

বুঝিবে, হয়ত অমলাও ধরিয়া ফেলিবে। তিনজনের জীবনই তাহা হইলে মাটি হইয়া যাইবে। অথচ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এইজন্য দোষ কারও নাই, দায়ী কেহই নয়। এ সবই বিধিলিপি।

রাজেশ্বর ভাবে অমলার কথা। তার উপর দিয়া এতবড় ঝড় ঝঞ্ঝা গেল কিন্তু তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কেমন একটা শান্ত সমাহিত ভাব। সুতা কাটা, খদ্দর বোনা, রাজেশ্বরের ঠাকুর ঘর সাজানো এই সব লইয়াই সে ব্যস্ত থাকে। নিজে পড়ে, তারকেশ্বরের ছেলে শান্ ইয়াট সেনকে পড়ায়। প্রত্যহ রাত্রে রাজেশ্বরকে বই পড়িয়া শোনায়। প্রথম প্রথম রাজেশ্বর ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ শুনিত।

অমলা রবীন্দ্র কাব্য ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ জন্মায়। রাজেশ্বর এখন নিজেই বলে, ঠাকুর কবির একটা কবিতা পড়ে শোনাও, মা। মন যখন দুর্বল হয় তখন ঠাকুর মশাইর কবিতা মনে বল এনে দেয়, বুকে দেয় সাহস।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসও রাজেশ্বরের বড় প্রিয়। অন্নদাদি, কমললতা সাবিত্রী এদের তার খুব ভাল লাগে। চেনা চেনা মনে হয়। রাজেশ্বর পড়াশুনা একরকম করে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতার বলে অনেক জটিল জিনিসই ধরিয়া ফেলিতে পারে। একবার যা শোনে তা আর ভোলে না। তা ছাড়া তার দৃষ্টি যেমন গভীর, তেমনই উদার। প্রাণ সহানুভূতিতে ভরা।

অমলা বলে, পড়াশুনার সুবিধে পেলে তুমি ঈশান স্কলার হতে, এম্, এ'তে পেতে গোল্ড মেডেল।

রাজেশ্বর হাসিয়া উত্তর করে, না মা তা হত না।

কেন নয়? এই বিষয় বৈভব মান প্রতিপত্তি নিজ হাতে তুমি গড়ে তুলেছ। এর তুলনায় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা ত' কিছুই নয়।

পাশ হয়ত করতে পারতাম। কিন্তু সকলকে হারিয়ে বৃত্তি পাওয়া, ওসব পারে মহেশের মতন ছেলেরা।

অমলা উত্তর করে, বড় ছেলেকে নিয়ে তোমার ভারী অহঙ্কার।

রাজেশ্বর বলে, সে ত' অহঙ্কারেরই জিনিস মা।

মহেশ্বরকে লইয়া রাজেশ্বর ও অমলা মধ্যে মধ্যে এরূপ আলোচনা করে। অমলা তাতে কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে না। ওঠে বীরেশ্বরের কথা, তাদের দুজনের মতে সেও ছিল অসাধারণ। মেধা তার অদ্ভুত।

রাজেশ্বর বলে, ছেলেবেলায় মা-মরা না হলে তার মাথা আরও খুলত অসুখের জন্য পড়াশুনা করতে পারত না তবু পরীক্ষায় জলপানি পেলে।

আজকাল কলিকাতায় সংসারের ভার তারকেশ্বরের স্ত্রী উমার উপর। জবা নিজ হাতে তাকে কাজকর্ম শিখাইয়াছে। রাজেশ্বর উমাকে বলিয়াছে, তোমাদের সংসারের জন্য ও অনেক কিছু করেছে। ওকে এখন তোমরা একটু বিশ্রাম দাও।

কিন্তু বিশ্রামে জবার বড় আপত্তি। একটা না একটা কিছু কাজ তার চাইই। সে বলে, বসে থাকলে শরীর আমার আরও খারাপ হয়।

সে দুঃখীর মার পরিচর্যা করে। শিপ্রাকে স্নান করায়, খাওয়ায়। কখনও বা পান সাজে। শিপ্রা তার খেলার সাথী। সে তাকে পুতুল গড়াইয়া দেয়। পুতুলের মালা গাঁথে। কিন্তু শিপ্রার চেয়েও বেশী ভালবাসে চন্দনকে। রাজেশ্বরকে চন্দনদের বাড়ী যাইতে দেখিলেই তারও যাইতে ইচ্ছা করে। বাড়ী হইতে সোজাসুজি আলিপুর গেলে রাজেশ্বর তাকে সঙ্গে লইয়া যায়।

জবা সেখানে যাইয়া সুপ্রভাকে সাহায্য করিতে বসে। বলে, একটু বস। তোমার আনাজটা কুটে দি মা।

কাজ করিতে করিতে আরম্ভ করে মহেশ্বরের গল্প, মহেশ আমার নারকোলের চিঁড়ে খেতে ভালবাসত। তার ত্রিগুণ কাকার জন্ম প্রত্যেক বারই ঐ চিঁড়া নিয়ে আসত। তুমি মাঝে মাঝে মহেশকে কচুর শাক রেঁধে দিও। একটু ঝাল বেশী দিও তাতে।

চন্দনের বুদ্ধি ও মেধা দেখিয়া এই বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া যায়। তার ধারণা চন্দুও একদিন তার পিতার মতন হইবে। সকলেই তার সুখ্যাতি করিবে।

সুপ্রভা একটু হাসিয়া বলে, কেন ওর বাপের চেয়েও বড় হবে না?

জবা বলে, আমার মহেশের চেয়েও বড়! সে কি হয়? মহেশ তার বাপ, ওরা যে—। জবা মধ্য পথে থামিয়া যায়।

সুপ্রভা দেখে আশে পাশে সকলেরই তার শ্বশুরের উপর অদ্ভুত অনুরাগ। তার স্বামী, নরেশ ত্রিগুণা এমন কি সর্বত্যাগী জ্যোৎস্না নাথও লোকের হৃদয় অতটা জয় করিতে পারেন নাই। এই লোকপ্রিয়তার পিছনে আছে রাজেশ্বরের অদ্ভুত ভালবাসা। মানুষকে কী ভালই না সে বাসে। উন্মাদ দুঃখীর মা, নির্বোধ বৃন্দাবন এদের প্রতিও তার কত যত্ন, কত সমাদর।

রাজেশ্বর একদিন সুপ্রভাকে বলে, আমার এই বিষয় বৈভব, এই সফলতা এর পিছনে ওদের যে কি দান তা তোমরা জান না। দুঃখীর মা যদি বীরুর যত্ন না নিত তা হলে কি এ সব গড়ে তুলবার আমি সময় পেতাম।

সে সুখ্যাতি করে সকলের। বৃন্দাবন, জবা, পরশুরাম, শহরবাসী প্রত্যেকের কাছেই ঋণ তার অপরিশোধনীয়।

দুষ্টু সান্ ইয়াট পিতামহকে বলে, বিন্দে দাদু হাবা। রাজেশ্বর তাকে ধমক দেয়।

সান্ বৃন্দাবনকে খেপায়, তোমার রাজু ভাই কিছু বোঝে না।

আর বোঝ তুমি! তুমি হইলা বুদ্ধির ঢিবি। দাঁড়া তুই—বলিয়া বৃন্দাবন তাকে তাড়া করিয়া যায়। সান্ ছোটে, পিছু পিছু ছুটিয়া বৃন্দাবন হাঁপাইয়া পড়ে। সান্ তখন হাসিতে থাকে। বৃন্দাবন আরও রাগিয়া যায়।

উমা ছেলেকে ধমক দেয়, ছিঃ বড় দাদুকে রাগাতে নেই।

সান্ বলে, ও রাগে কেন?

তুমি দাদুকে বোকা বল, ওকে দেখে হাস।

বুড়ো দেখে আমার হাসি পায় যে মা, কি করব?

উমা বলে, আমিও ত বুড়ো হব। তখন তুমি আমাকে দেখেও হাসবে।

সান্ বলে, না মা। মা কখন বুড়ো হয় না।

উমা ছেলেকে বুকে লইয়া আদর করে।

বৃন্দাবন বলে, তারুর ছাওয়ালের কখনও ভাল হবে না।

জবা বলে, ঐটুকু ছেলের উপর রাগ কর তুমি?

আরে মাথারি, ও আমার রাজু ভাইরে বোকা কবে, তাই সহ্য কবধ আমি? ও আমারে যা মনে লয় কউক। দেখবা আমি চুপ করিয়া থাকব। কত দুঃখে যে রাগ করি তা তুমি বোঝ না মাথারি।

সংসারে সকলেরই পরিবর্তন হইয়াছে। হয় নাই শুধু দুঃখীর মার। সে আগের মতন চুপ করিয়া থাকে। তবে আগের চেয়েও দুর্বল ও কৃশ। আজকাল সে নাকি প্রায়ই দুঃখীরাম ও বীরেশ্বরকে দেখিতে পায়। সে বলে, দুঃখী ও বীরু আমারে ডাকে, ঐ আকাশে বসিয়া ডাকে।

নরেশ্বর দেশে থাকিতেই কলিকাতার কাগজে তার কবিতা বাহির হইত। কলিকাতায় আসিয়া সে সাহিত্যিকদের দলে ভিড়িয়া পড়িল। প্রায়ই সাহিত্যের মজলিসে যোগ দেয়। বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করে। আই, এ পড়িবার সময়ই তার দুখানা বই বাহির হয়, একখানার নাম মঞ্জরীর থাল।

তার কবিতাগুলি সবই মঞ্জরীর খাল বিল, পাখীর ডাক, ধানের খেত এইসব লইয়া লেখা। দ্বিতীয়খানি, কালের শিঙা, কাল চলে, সঙ্গে সঙ্গে শিঙা বাজায়—আর ডাকে চল, আমার সঙ্গে তালে তালে চল। যে চলিতে পারে জীবন তাহার সার্থক। কালের এই শিঙা যুগে যুগে বাজিতেছে—আগামী যুগেও বাজিবে। প্রতি যুগেই তার বাণী নূতন, আহ্বান নূতন।

কিছুদিন পরে সে পড়া ছাড়িয়া দিল, রাজেশ্বর তাকে নিজেদের আপিসের কাজে লাগাইয়া দেয়। প্রথম প্রথম নরেশ প্রায় আপিসেব প্যাডে কবিতা লিখিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে দু একদিন অসমাপ্ত দু চারটা ফেলিয়াও আসিত। তখন কেহ ধারণা করিতে পারে নাই যে এই তরুণ সাহিত্যরসিক একদিন পাকা ব্যবসায়ী হইয়া উঠিবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ব্যবসায়-বুদ্ধি তার চমৎকার। বোঝে সব কাজ, কাজের প্রতি অনুরাগও যথেষ্ট। সে বুক কিপিং, একাউণ্টেন্সী, অডিটিং, কোম্পানির আইন সব পড়িয়া ফেলিল। তারই উপর ব্যবসায়ের ভার দিয়া রাজেশ্বর ও মহেশ্বর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। মহেশ্বর আর ব্যবসায়ে ফিরিল না। রাজেশ্বর আসিল বটে। কিন্তু সেও আগের মতন কাজকর্ম দেখিত না। খদ্দর চরকা লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। তা ছাড়া বীরেশ্বরের মৃত্যুতেও খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

নরেশ্বরের লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়ের সকল বিভাগে। দিনের পর দিন আর, মল্লিক এণ্ড সন্সের কল্পনাতীত উন্নতি হইতে লাগিল। সে নূতন কয়েকটা লিমিটেড্ কোম্পানিও করিল। তার মধ্যে কাপড়ের কল একটা, একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি।

এই সময় দেশে আসিল এক নূতন অতিথি। তার প্রথম আগমন ধীরে ধীরে। অতি সঙ্গোপনে। তখনও কেহ বোঝে নাই যে এই নবাগতের শক্তি অসীম—সম্ভাবনা অনন্ত এই অতিথির নাম কম্যুনিজ্‌ম্।

সুলেমান নামে নোয়াখালির একটি দরিদ্র মুসলমান তরুণ নরেশ্বরের সঙ্গে কলেজে পড়িত। ছেলেটি যেমন বুদ্ধিমান তেমন মেধাবী। কলেজ পাঠ্য বইর চেয়ে বাহিরের বইর সঙ্গেই তার বেশী পরিচয়। সেই নরেশ্বরকে কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে প্রথমে কয়খানা বই দেয়, সেগুলি নরেশ্বরের ভাল লাগে। সে আরও চায়। তারা দুজনে একসঙ্গে এইসব পড়িত, আলোচনা করিত। নরেশ্বর টাকা যোগাইত সুলেমান যোগাইত উদ্দীপনা।

ক্রমে ক্রমে আরও দু একটি তরুণ আসিয়া জুটিল। নরেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি পাঠ-চক্র গড়িয়া উঠিল। সংখ্যায় তারা নগণ্য কিন্তু উৎসাহ প্রচুর। নূতন জ্ঞান ও নূতন আলোর সন্ধানী এই তরুণ দলের উদ্দেশ্য দুঃখী দরিদ্রের, চাষী মজুরের মুক্তি।

নরেশ্বর ছিল এই দলের কর্মী। সুলেমান তাদের দার্শনিক। দরিদ্র কৃশকায় এই যুবক যেন আন্তরিকতার প্রতিমূর্তি। কেহ এই সম্বন্ধে প্রশংসা করিলে সুলেমান বলিত, আমি চাষীর ঘর থেকে এসেছি কিনা তাই আমার পক্ষে কম্যুনিষ্ট হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। তাদের দুঃখ মানেই যে আমার দুঃখ।

নরেশ্বর বলিত, চাষীর ছেলে আমিও ভাই। সেই হিসাবে আমি বরং উভয় কুল শুদ্ধ।

সুলেমান বলিত, তুমি যে ধনকুবের।

নরেশ্বর মাঝে মাঝে ভাবিত তার পিতার ঐশ্বর্য কি সত্যই সাম্যবাদী হওয়ার প্রতিবন্ধক?

অমলাকে সোভিয়েট রুশ সম্বন্ধে কয়েকখানা ছোট বই পড়িতে দেয়। বই পড়িয়া অমলার ভাল লাগে। সেও ক্রমে ক্রমে কম্যুনিজমের অনুরক্ত হইয়া পড়ে। একদিন কোনও মিলের ধর্মঘট সম্বন্ধে কথা উঠিল অমলা বলে, রাশিয়ায় এ সম্বন্ধে ভারী সুন্দর মীমাংসা হয়েছে।

রুশের নাম শুনিয়াই রাজেশ্বর যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল, রাশিয়ার আদর্শ দেখছি তোমাকেও পেয়ে বসেছে। এই ভয়ই আমি করেছিলাম।

অমলা বলিল, কেন বাবা ভয় কিসের? ওদের এমন সুন্দর আদর্শ।

তুমি জানলে কি করে?

বই পড়ে। নরেশ মাঝে মাঝে এনে দেয়।

নরেশ এনে দেয়! সেও—রাজেশ্বরের কণ্ঠস্বরে ভীতি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। সোভিয়েট সম্বন্ধে জানিত না সে কিছুই, কিন্তু তাদের নিন্দা কুৎসা যথেষ্টই শুনিয়াছিল। সোভিয়েটের কুশাসনের ফলে রুশিয়ার এক কোটির উপর লোক অনাহারে মরিয়াছে। উদ্ভট এই সোভিয়েটের মতবাদ, ধর্ম তারা মানে না। তাদের মধ্যে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক অতি শিথিল। এক কথায় সোভিয়েট অনাচার ও কদাচারেরই নামান্তর।

রাজেশ্বর নরেশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, কম্যুনিজম্ থেকে তফাৎ থেক। ওসব বই আর পড় না।

নরেশ্বর পিতার সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

খানিকটা তর্কের পর রাজেশ্বর বলিল, যারা ঈশ্বর মানে না তাদের দ্বারা পৃথিবীর কোন মঙ্গল হওয়া অসম্ভব।

শহরে প্রতিবেশী সম্বন্ধে মানুষের যে রকম নির্বিকার ভাব থাকে ভগবান সম্বন্ধেও নরেশ্বরের মনের ভাব অনেকটা সেই রূপ। তিনি থাকুন বা নাই থাকুন তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে প্রতিবেশীর কোন ঝামেলায় যেমন সে থাকিতে চায় না—সেই রকম ভগবান সম্পর্কে কোন বাদ বিতণ্ডায় যোগ দিতেও অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ পিতার সঙ্গে।

রাজেশ্বর মনে করিল পুত্রকে সাবধান করিয়া দিবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হইয়াছে। এদিকে নরেশ্বরের কার্য কলাপ আগের চাইতেও

জোরে চলিতে লাগিল। সে সোভিয়েট প্রচারের জন্ম নূতন কবিতা লিখিল। বেনামায় প্রবন্ধ ও পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করিল। সুলেমানকে বলিল, এ বাড়ী থেকে আমাদের আড্ডা তুলতে হবে দেখছি। বাবা এ বরদাস্ত করবেন না।

সুলেমান হাসিয়া বলিল, তকলিফ ত এই সবে শুরু।

পিতার সঙ্গে নরেশ্বরের আদর্শের পার্থক্য ক্রমে ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইবার আশঙ্কায় সে এটুকু চিন্তিত হইল। জীবনের আদর্শ ও বাস্তবের ব্যবধান তাকে পীড়া দিত। কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বই পড়িবে, বন্ধুদের সঙ্গে রাত বারটা পর্যন্ত ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করিবে, আর দুপুরে করিবে লাখ লাখ টাকার কারবারের খবরদারি। এ যেন প্রহসন।

এই সময় একখানা কাগজে কার্টুন বাহির হইল। অসংখ্য কুলী মজুরকে দিয়া একটা পাদপীঠ তৈয়ারি হইয়াছে, তার উপর দাঁড়াইয়া একজন ধনিক কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। মুখ খানা তার নরেশের মতন।

এর কিছুদিন পর রাজেশ্বরের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিল। তারা দাবি করিল, ভাল কোয়ার্টার, শতকরা পঁচিশ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি। কাজ করিতে করিতে কেহ আহত হইলে বা মারা গেলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং খাটুনির সময় কমানো।

নরেশ্বর প্রায় সব দাবিই মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘট মিটিয়া গেল। তবে সে বলিল, সব কিছু ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহাশয়ের অনুমতি সাপেক্ষ্য। তবে আশা করি তাঁর অনুমতি পাওয়া যাবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার পিতা, সে একটু জোর করিয়া বলিলে তিনি অন্যরূপ মত করিবেন না ভাবিয়া মজুররা নরেশ্বরের জয়ধ্বনি করিল। মিটমাটের জন্যই হোক বা জয়ধ্বনির জন্যই হোক নরেশ্বর

ভারী তৃপ্তি বোধ করিল। তার মনে হইল, সে এই দেশে একটা নবযুগের অগ্রদূত। নব দর্শনের উদ্গাতা।

সে ধনীর সন্তান হইয়াও কম্যুনিষ্ট এইজন্য তার একটা আত্মপ্রসাদ ছিল। সে প্রসন্নতা লোপ পাইল। স্বপ্ন ভাঙিল।

রাজেশ্বর সাধারণতঃ রাগ করে না। এবার সে রাগ করিল। সে মনে করিত তার শ্রমিক মজুররা বেশ সুখেই আছে। অনেক কলের চেয়ে সে মজুরি বেশী দেয়। তারা চাহিলেই ছুটি পায়, সহানুভূতি ও সাহায্য পায়, তাদের কোয়ার্টার আশে পাশের মজুরদের লাইনের চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু কিছুতেই এরা খুশি নয়। এ যেন রাক্ষসের ক্ষুধা।

নরেশ্বর ভাবিল, তার পিতা অতীত জীবন ভুলিয়া খাঁটি ধনতান্ত্রিক হইয়াছেন। ধনতন্ত্রবাদের রীতিই এই।

রাজেশ্বর মনে করিল, পুত্র তার প্রতি অবিচার করিতেছে। লোকের জন্য সারা জীবন বসিয়া সে এতটা করিল, কত দুঃখী দরিদ্রকে অন্ন দিল, আজ সে হইল শোষক ধনতান্ত্রিক—আর দুখানা পুঁথি পড়িয়া নরেশ্বর হইল শ্রমিক-দরদী।

পিতা পুত্রে আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক হইল। কিন্তু রাজেশ্বর কিছুতেই শ্রমিকদের দাবি পূরণ করিতে রাজী হইল না।

মজুররা আবার ধর্মঘট শুরু করার আগেই নরেশ্বর পিতার সমস্ত ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িল। বাড়ী ছাড়িল। তার আগেই অমলা বলিয়াছিল, বাবা বড় দুঃখ পাবেন যে ভাই।

নরেশ্বর বলিল, আমিও যে নিরুপায়।

রাজেশ্বর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ একদিন দেখিল সে কত বড় অসহায়। নিজের হাতে এত বিষয় বৈভব গড়িয়াছে বটে কিন্তু আজ তার পাশে দাঁড়াইবার একটি লোক নাই। এমন কেহ নাই যে সাহায্য করে, একটু পরামর্শ দেয়।

কনিষ্ঠ পুত্র মৃত, জ্যেষ্ঠ ওকালতি লইয়া ব্যস্ত, মধ্যম ততটা উপযুক্ত নয়। ছিল এক নরেশ্বর, তার উপর কী নির্ভরই না সে করিত! ক্রোধের বশে আজ সে বাপকে অসহায় ফেলিয়া চলিয়া গেল।

রাজেশ্বরের সমস্ত দুঃখ শোক যেন একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। চাঁপা থাকিলে ছেলেরা এতটা পর হইয়া যাইত না। বীরেশ্বর থাকিলে সে এতটা অসহায় হইত না। তার অবস্থা আজ যে যষ্টিহীন অন্ধের মতন।

কিন্তু সে ধনী, সে বড় মানুষ। গরিব হইলে অন্তর দিয়া আহা উহু করিবার মত অন্ততঃ দু একটা লোক থাকিত। আজ তাহাও নাই। লোকে ভাবে রাজেশ্বর বড় মানুষ, তার দুঃখ কি? ধনীর জীবনের এ অভিশাপও বড় কম নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজেশ্বর আঘাতটা সামলাইয়া লইল। রোজই অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করে, সকাল বিকাল মিল ও কারখানার কাজ দেখে। কোন দিন যায় ঘুষুড়ি, কোন দিন যায় সাঁকরাইল বা সোদপুর। বিশ্রাম এক রকম নাই বলিলেই চলে। আর মল্লিক এণ্ড সন্স আজ বাংলার অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানি মিল, কল কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, লাইফ ইনসিওরেন্স অফিস ছোট বড় অনেক কারবারই পরিচালনা করে। হাজার হাজার কুলি খাটে, শত শত কেরানী। সমস্ত কাজই রাজেশ্বর নিজে দেখে। এমন কি কোন্ কাগজে কয়টা বিজ্ঞাপন যাইবে তাহাও সে ঠিক করিয়া দেয়। নিজে প্রতিটি বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করে।

শুধু ইহাই নয়, এর উপর আছে সংসারের খবরদারি। নিজের প্রতিষ্ঠিত চরকা ও খাদি সঙ্ঘগুলির তত্ত্বাবধান। লোকে তার পরিশ্রম দেখিয়া বিস্মিত হয়। ভাবে, মানুষটা যেন কলের তৈরি। কলের তবু বিশ্রামের দরকার কিন্তু রাজেশ্বর অবিরাম খাটিয়াই চলিয়াছে।

অন্য কেহ ত দূরের কথা, সত্যকার অবস্থাটা মহেশ্বর পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। পারে শুধু অমলা। সে বোঝে যে রাজেশ্বরের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে, ইহা দুর্বলতার বিরুদ্ধে কর্মবীরের দ্বন্দ্ব। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর হইতেই সে মন ও শরীরের দুর্বলতা বোধ করিতেছিল। নরেশ্বর চলিয়া যাওয়ায় উহা আরও বাড়িল। কিন্তু বলবানের রীতিই স্বতন্ত্র। দুর্বলতা ও পরাজয় সে স্বীকার করে না।

সংগ্রাম করিতে করিতে বটের মতন ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু বেতের মতন নোয়ায় না।

অমলা জানে এই আত্মবঞ্চনা মানুষের পক্ষে মারাত্মক। ইহা অলক্ষ্যে পুটপাকের মতন ভিতরটা পোড়াইয়া দেয়। সে চিন্তিত হয়। মহেশ্বরের বাড়ী যাইয়া পরামর্শ করে। নরেশ্বরের খোঁজ করিবার জন্য চারধারে লোক পাঠায়। সান্ ও শিপ্রাকে সাজাইয়া দিয়া বলে, যাও দাত্বর সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।

কখনও রাজেশ্বরকে সে সিনেমায় লইয়া যায়। কখনও যায় খেলার মাঠে। খেলা দেখিতে রাজেশ্বরের কী উৎসাহ! সাহেব বনাম ভারতীয়ের খেলায় সে মাঝে মাঝে যুবকের মতন লাফাইয়া ওঠে। 'গোল' 'গোল' করিয়া চিৎকার করে। রুমাল উড়ায়। অমলাকে বলে, এতদিন কলিকাতায় আছি, খেলা কখনও দেখি নি তবু তুমি আগ্রহ করে দেখালে।

সিনেমার অভিজ্ঞতাও তার ছিল না। প্রথম দিন দেখিল মরক্কো। দেখিয়া মুগ্ধ হইল, বলিল, শুধু কাজ কাজ করেই ঘুরেছি, এ গুলি বাদ দিলে জীবনে মস্ত বড় ফাঁক থেকে যেত।

রাজেশ্বর আজকাল যেখানে যত পায় সোভিয়েট বিরোধী প্রবন্ধ সাহিত্য ও সংবাদপত্র কিনিয়া আনে। নিজে পড়ে, অমলাকে বলে, পড় মা। অমলা পড়িয়া শোনায়। দুজনে আলোচনা করে, তর্ক করে। অমলা করে সোভিয়েটের সমর্থন, যাই বল বাবা, ওদের দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দর।

রাজেশ্বর প্রশ্ন করে, তুমি এ সব পেলে কোথায়?

নরেশ বই আনত, সেগুলি পড়তাম।

আমি নিষেধ করা সত্বেও পড়েছ?

নিষেধ করার পর বহুদিন পড়ি নি, কিন্তু আবার আরম্ভ করেছি, নরেশ যাওয়ার পর। জানতে কৌতূহল হল কি আকর্ষণ এতে আছে,

যার জন্য নরেশের মতন কর্তব্য পরায়ণ মানুষ বিষয় বৈভব এমন কি তোমার মতন বাপকে ফেলেও চলে গেল।

রাজেশ্বর ধীরে ধীরে বলিল, তা ঠিক।

অমলা বলিল, আর যাই হ'ক ওদের এই নব বিধানে মানুষগুলো অন্ততঃ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

রাজেশ্বর উত্তর করিল, এক কোটি লোকের মৃত্যু দিয়ে তারা সেটা করেছে বটে।

ও হয়ত যুদ্ধের ফল। পিছনে বিরোধীদের প্রোপাগ্যাণ্ডাও থাকতে পারে। এর বিচার করবে কাল।

তর্ক করিতে করিতে রাজেশ্বর বলে, তুমিও ঐ পথের পথিক হলে, দেখছি।

অমলা বলে, না বাঁবা তা নয়।

রাজেশ্বর বলিল, আমি স্পষ্ট দেখছি কিছুদিন বাদে মানুষ আর ধর্ম সমাজ কিছুই মানবে না। এমন কি ঈশ্বরকেও নয়।

ঈশ্বর আছে এটা তুমি প্রমাণ করতে পার ?

অন্য কেহ ইহা বলিলে রাজেশ্বর জ্বলিয়া উঠিত। অমলার কথার উত্তরে হাসিয়া বলিল, ঈশ্বরেরও প্রমাণ!

অমলা উত্তর করে প্রমাণ, বই কি। এ যে বিজ্ঞানের যুগ।

অমলা নরেশ্বরের অনেক খোঁজ করিল। সুলেমানের বাসায় লোক পাঠাইল। লোকটি আসিয়া খবর দিল, সুলেমান বলিয়া ঐ ঠিকানায় কেহ নাই, কোন দিন ছিল না। ছিল সলিম মিয়া। লোকে তাকে ইনকুইলাব জিন্দাবাদ্‌ বলিয়া ডাকিত। সে একদিন হঠাৎ কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। ঘরে তালাটি পর্যন্ত দেয় নাই। ঐ ঘরে একটি টিনের তোরঙ্গ, পুরাতন খাটিয়া এবং নতুন দাঁতের বুরুশ পড়িয়া আছে। বুরুশটি দামী। ইহা হইতে অমলা শুধু এইটুকু মাত্র তথ

সংগ্রহ করিল যে সুলেমানের আরও ছুইটি নাম আছে, সলিম ও ইন্‌কুইলাব জিন্দাবাদ।

নরেশ্বরের সম্বন্ধে রাজেশ্বর ছিল একেবারেই নীরব। অন্য কেহ তার সামনে নরেশ্বরের নামও করিত না। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম দুঃখীর মা। রাজেশ্বরকে দেখিলেই সে বলে, আমার নরুরে আবার করলা কী? যাও, তারে লইয়া আইস।

সংসারের সকলেই কলিকাতায়, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা তাই তারকও প্রায়ই আসে। এক একবার থাকে আট দশদিন। নরেশ্বর চলিয়া যাওয়ার পর অমলা রাজেশ্বরকে বলিল, মেজ বাবুকে তোমার কাছে রাখ। উনিই কাজ কর্ম দেখুন।

রাজেশ্বর আপত্তি করে, তুমি ওকে চেন না মা।

অমলা বলে, সেও ত তোমারই ছেলে, চেনবার দরকার কি? আর তিনজনকে ত দেখলাম।

রাজেশ্বর বলে, তুমি ছেলে হলে বেশ হত মা।

ছেলে হইলে কি হইত তাহা ভাবিয়া আর লাভ কি! ছেলের বহু ভুল ত্রুটি মানুষ ক্ষমা করে। কিন্তু তার একটি মাত্র ভুল সমাজ ক্ষমা করিল না, ভগ্নীরা করিল না। এমন কি মাও নয়। তখন রাজেশ্বর আশ্রয় না দিলে তার দশা যে কি হইত অমলা তাহা ভাবিয়া পায় না। সে বলিল, ছেলে হলে আমিও হয়ত নরেশের মতন চলে যেতুম।

রাজেশ্বর বলিল, তুমিও!

অমলার নির্বন্ধাতিশয্যে শেষটায় স্থির হইল তারকেশ্বর কলিকাতায় থাকিবে, কাজকর্ম দেখিবে। এতদিন সেও ইহাই চাহিয়াছিল। ভাইরা কলিকাতায় মোটরে চড়িবে। লাখ লাখ টাকার কারবার দেখিবে, থাকিবে রাজার হালে আর সে দেশে বসিয়া হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভাঙিয়া মাঠে যাইবে। জীবন কাটাইবে ক্ষুদ্র তেজারতি ও দোকানদারি লইয়া।

এ আর পোষায় না। তার মনে হয় পিতার এই ব্যবস্থা তার প্রতি নিছক একটা অবিচার মাত্র। একদিন সে নিজেই দেশে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। তখন ত আর মল্লিক এণ্ড সন্স গড়িয়া ওঠে নাই। নরেশ্বরের নিরুদ্দেশের খবরে সে বেশ খুশি হইল। ইহা গোপন করিবার চেষ্টা সে করিত না বরং বলিত, ভায়ার মতিগতি যেরূপ হচ্ছিল তাতে আর কিছুদিন কারবারে থাকলে বাবাকে ফতুর করে ছাড়ত।

শিক্ষানবিশ হিসাবে তার মাহিনা হইল পাঁচশত টাকা। সে একজন সেক্রেটারী পাইল। এই ভদ্রলোকই বাড়ীতে আসিয়া তাকে কাজকর্ম শিখান, ইংরেজী পড়ান। ঠিক হইল কাজ চালাইবার মতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেই তারক আর মল্লিক এণ্ড সন্স এর এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার হইবে। চেক সহি করিবে। নরেশ্বরও উহাই করিত।

রাজেশ্বর নিজে ছিল গরিবের ছেলে। গরিবের দুঃখ সে বুঝিত। বোলশেভিক আতঙ্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলাইয়াছিল বটে। সে মনে করিত, মজুরদের বাড়িতে দিলে দেশের অনর্থ টানিয়া আনা হইবে। মজুরসঙ্ঘ বোলশেভিকবাদের বাহন। ধর্মঘট তার অস্ত্র। এগুলিকে ঠেকাইয়া রাখা দরকার। তবুও ব্যক্তিগতভাবে মজুরের দুর্দশায় তার সহানুভূতির অভাব ছিল না।

তারকেশ্বর ঠিক এর বিপরীত। বলশেভিকবাদ লইয়া সে মাথা ঘামায় না, জানেও না কিছুই। সে চেনে টাকা, তার কামনা অর্থ সঞ্চয়। শ্রমিকদের দাবি পূরণ করিলে ক্ষতি তাদেরই। সে বোঝে এই একটি মাত্র সহজ সত্য। তাই পিতার শ্রমিক বিরোধী মনোভাব তার বেশ ভাল লাগে।

স্ত্রী উমাকে সে বলিল, বাবার মতিগতি ফিরছে দেখছি। দান খয়রাত করে টাকা নষ্ট না করলে আমরা আরও বড়লোক হতে পারতুম।

উমা গরিবের মেয়ে। নিরন্নের দুঃখ কি তা সে জানে। সে উত্তর করিল, ওতে মানুষের ক্ষতি হয় না। বাবা বলেন, যা দান করা যায় ভগবান তার দশগুণ দেন।

তারকেশ্বর উত্তর করে, ভগবানের আর কাজ নেই। এইজন্য তিনি হিসেবের খাতা নিয়ে বসে আছেন।

পিতার উদারতা পাছে তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়, এই ভয়ে উমাকে সে সাবধান করিয়া দেয়, ওসব কথা কানে তুলবে না। অমলাও ঐ দলে। ওর সঙ্গে মিশো না। তাছাড়া জানই ত ওর ইতিহাস।

উমা স্বামীকে ভয় করে। সাধারণতঃ তার কথায় কোন প্রতিবাদ করে না। জানে একটুতেই স্ত্রীকে গরিবের মেয়ে বলিয়া অপমান করিতে তার বাধে না।

কিন্তু অমলাকে সে বড় ভালবাসে। সে বলিল, ভাসুর ঠাকুরকে বিয়ে করতে চায়নি এই ত ওর অপরাধ?

তারকেশ্বর বলিল, কেন বীরুর কথা—এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

উমা কল্পনাও করে নাই যে তার স্বামী মৃত কনিষ্ঠের সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত করিবে। সে বলিল, তোমার মুখে বাধল না বীরুর সম্বন্ধে ব'লতে। একেবারে মিথ্যা কথা। নিছক মিথ্যে।

তারকেশ্বর বলিল, তোমাকেও যাদু করেছে দেখছি। তাতে আর বিচিত্রই বা কি! বাবা রুশিয়ার ওদের নামও শুনতে পারতেন না। আর অমলা তাঁর সঙ্গে গিয়ে ঐ ওদের—কি বলে ঐ বলশেভিকদের হয়ে তর্ক করে। তাতেও তিনি রাগ করেন না, বরং একটু একটু হাসেন।

বছর খানেক পরের কথা। বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। মিলে মিলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইতে লাগিল,

তারা দাবি করিল, আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে চাই—বাঁচিতে চাই মানুষের মতন।

একদল বিশিষ্ট যুবক এদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল, তারা দেশকে শুনাইল এক নূতন বাণী। দেশের মুক্তি এই পথে। মুক্তি শ্রমিক চাষীকে দিয়া। তুমি পাতি বুর্জোয়া, তোমাকে দিয়া নয়। ঐ ধনীকে দিয়া ত নয়ই।

এই যুবারা তখন সংখ্যায় নগণ্য। প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের কিছুমাত্র নাই। ছিল শুধু আদর্শ।

একদিকে শ্রমিকের দাবি আর একদিকে ধনিকের ক্রোধ ও ত্রাস। সরকার ধনীদের পক্ষে। কোন মিলে ধর্মঘট হয়, কোথা ও লাঠি চলে। দেশের অবস্থা তখন এই।

রাজেশ্বর বলে, ব্যবসা বাণিজ্যের সবে একটু সুযোগ হয়েছিল, আর তখন এল কিনা এই উৎপাত। দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। অন্য দেশে এসব চলতে পারে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ের যে শৈশব অবস্থা। এখানে ধর্মঘট মানেই হচ্ছে আত্মহত্যা।

অমলা উত্তর করে, আর ওরা কি বলে, জান? দেশের দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের তোমরা শোষণ করতে চাও।

রাজেশ্বরকে সমর্থন করে ব্রজরাখাল। সে বলে, বর্তমানে দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেবা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য করা। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে।

রাজেশ্বর বলিল, ঠিক বলেছ রাখাল। তুমি ত বুঝবেই। দেশের দশের সেবা করেছ, জেল খেটেছ, অন্তরীণ ছিলে। দেশের জন্য তোমরা যে রকম ভাবো, সাধারণ আর পাঁচজনে ত' সে রকম ভাবে না। জানেও না।

মঞ্জরী অঞ্চলে ব্রজরাখালই স্বদেশী আন্দোলনের সাড়া জাগায়। মহেশ্বর প্রভৃতি তরুণদলের সে ছিল নেতা। বন্দেমাতরং ধ্বনি হইতে

আরম্ভ করিয়া বয়কট, ডাকাতি, অসহযোগ প্রভৃতি সবরকম অভিযোগেই সে জেল খাটে। অন্তরীণ হয়। জেল ও অন্তরণের ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাট কারবার করিত। কিন্তু এই অস্থায়ী ব্যবসায়ের আয়ে সংসার কোনদিনই চলে নাই। তাই কিছুদিন হইল সে রাজেশ্বরের আপিসে কাজ লইয়াছে। এক সময় সে দেশের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করিয়াছিল, কষ্ট সহ্য করিয়াছিল তাই রাজেশ্বর প্রথমেই তাকে ভাল মাহিনায় নিযুক্ত করিল।

ব্রজরাখালের মুখে এখন শুধু এক কথা। দেশের মুক্তি ব্যবসায়ে, বিশেষতঃ বাংলার। মাড়বাড়ী ভাটিয়ারা যে লুটে নিয়ে গেল।

নিজে সে স্বদেশীর কথা তোলে না। আর কেহ তুলিলে বলে, এ জাতের কিছু হবে না। জাতটাই মেরুদণ্ড হীন। সবাই জোচ্চোর।

ব্রজরাখাল বক্তা ভাল। বক্তৃতা করিয়া পাঁচ জনকে উত্তেজিত করিতে পারে। বাংলাও বেশ লেখে। মাহিনা আরও বাড়াইয়া দিয়া রাজেশ্বর তাই তাকে প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত করিল।

এবার আর মল্লিক্ এণ্ড সন্সে দেখা গেল এক নূতন ধরনের কর্মব্যস্ততা। ব্রজরাখালের সম্পাদনায় হাজার হাজার পুস্তিকা বাহির হইতে লাগিল। কোনটায় থাকিত ত্যাগের মাহাত্ম্য, দেশ সেবার গৌরব। কোন খানায় জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সম্পর্কে শ্রমিকের প্রতি উপদেশ। ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য ত্যাগে, তাদের আদর্শ মুনি ঋষির জীবন, কুটিরে বাস, ফল মূল ভক্ষণ। নিজের ভাগ্য লইয়াই তারা সন্তুষ্ট।

একখানা পুস্তিকা বাহির হইল, নাম 'চাষের খেত হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার'—রাজেশ্বরের সচিত্র জীবনী। কত ছোট তিনি ছিলেন এবং আজ কত বড় হইয়াছেন। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে আছে তাঁর ত্যাগ, চরিত্র বল, মানব জাতির প্রতি তাঁর প্রেম। রাজেশ্বরের

সৎকার্যের একটা তালিকা দিয়া পরিশিষ্টে গ্রন্থকার বলিতেছেন, হে শ্রমিক, তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রাজেশ্বর, তাঁর মতন শ্রমিক দরদী আর নাই।

রাজেশ্বর বলিল, একি করছ রাখাল? লোকে যে হাসবে।

ব্রজরাখাল বলিল, এ ত' আর প্রচারের জন্য নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ, দেশের মঙ্গল।

রাজেশ্বর নিজের জীবনী প্রচার বন্ধ করিয়া দিল। তবুও বিরুদ্ধবাদীরা উপহাস করিতে ছাড়িল না। তারাও এক ইস্তাহার বাহির করিল, ভাই মজদুর, ভাই কিষাণ সাবধান। তোমাকে প্রবঞ্চিত করার জন্য ধনিক আজ দেশ-দরদী সাজে। ত্যাগের দোহাই দেয়, দোহাই দেয় মুনি ঋষির। আর সেই সঙ্গে তোমার অস্থি ও রক্ত দিয়া সে নিজের জন্য বিলাসের প্রাসাদ গড়ে। তোমরা ভুলিও না। এই ইস্তাহার বাহির হইল অনন্ত শাস্ত্রীর নামে।

শ্রমিক দলে অনন্ত শাস্ত্রীর আবির্ভাব একটা স্মরণীয় ঘটনা। কিছুদিন হইল ইনি এই দলে আসিয়াছেন। এর আগে বিন্ধ্যাচলে ধ্যান ধারণা করিতেন। বিখ্যাত রামদাস কাঠিয়া বাবার ইনি প্রশিষ্য। অদ্ভুত এঁর চরিত্র, পাণ্ডিত্য অসাধারণ, যেমন কর্মী, তেমন ত্যাগী। যেখানে যান সেখানেই জয় হয়। সাধারণতঃ তিনি পিছনে থাকিয়া কাজ করেন, বুদ্ধি দেন, উৎসাহ যোগান। সামনে থাকেন তাঁর সহকর্মীরা।

শ্রমিকদলের আর একখানা ইস্তাহারে রাজেশ্বরের দান সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল, ছিল কতকগুলি ঘরোয়া খবর।

তারক বলিল, এ আমাদের নিজের লোকের কাজ। আমাদেরই গ্রামের লোক যারা আপিসে কাজ করে, তাদেরই কেউ করেছে। কী অন্যায় বল দেখি, কী অকৃতজ্ঞতা।

বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টায় রাজেশ্বর আপিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সামনে দাঁড়াইয়া অমলা, এই সময় টেলিফোন বাজিল। চাঁপা কটন মিলের ম্যানেজার বাদল চ্যাটার্জি সোদপুর হইতে বলিল, মজুররা ভারী গোলমাল করছে, যে কোন সময়ে উগ্র মূর্তি ধারণ করতে পারে। পুলিসে খবর দেব ?

রাজেশ্বর বলিল, না, পুলিসে খবর দেবেন না। আমি আসছি।

অমলা বলিল, কি বাবা ?

সোদপুর মিলে গোলমাল বেধেছে।

কয়দিন যাবৎ এই আশঙ্কাই তারা করিতেছিল। এই মিলে অসন্তোষ বহুদিনের। নরেশ্বরের প্রতিশ্রুতি পালিত না হওয়ায় এমনিই শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ ছিল। সেই চাপা আগুনে ইন্ধন যোগাইল একটি সামান্য ঘটনা। ম্যানেজার অবাধ্যতার জন্য তিনটি কুলিকে বরখাস্ত করে। কুলির দল ইহাতে খেপিয়া যায়, শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখায়। তারা জিদ ধরে, ঐ কুলি তিনজনকে আবার কাজে নিতে হইবে, নরেশ্বর বাবুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে হইবে। এই সঙ্গে জুড়িয়া দেয় নতুন আরও কতকগুলি সর্ত।

অমলা বলিল, এই ঝামেলায় তোমার গিয়ে কাজ নেই।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিল, কোন ভয় নেই আমার জন্য। ছেলেবেলা থেকে বহু গোলমাল আমি দেখেছি। মিটিয়েছিও অনেক দাঙ্গা ফ্যাসাদ।

অমলা বলিল, বেশ আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

তোমাকে !

হ্যাঁ বাবা, আমি তোমায় একা যেতে দেব না।

কিন্তু মেয়েদের যাওয়া কি নিরাপদ, ঐ উন্মত্ত জনতার সামনে ?

তাদের মধ্যেও ত' মেয়ে ছেলে আছে।

রাজেশ্বর বলিল, নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তারককে। কিন্তু উপায় নেই। কুলিরা তার উপর ভয়ানক চটা, তাদের ধারণা মিলের ম্যানেজার বাদল বাবু মিটিয়ে ফেলতে পারে নি শুধু ওরই জন্য।

শ্রমিকরা ভাবিতে পারে নাই যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজে এই সময় মিলে আসিবেন। তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া তারা আরও বিস্মিত হইল।

একদল গাড়ীর কাছে আগাইয়া আসিল। একদল বলিল, রুটি চাই, চাই ভাত। আমাদের ডাল রুটির দাবি তোমাদের শুনতে হবে।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ইন্‌কুইলাব জিন্দাবাদ। হিন্দু মুস্‌লিম কি জয়—লাল ঝাণ্ডা কি জয়।

অমলা বাহিরে আসিয়া গাড়ীর পাদানির উপর দাঁড়াইয়া বলিল, ভাই মজত্তুর, আপনাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনাদের অভিযোগ শুনতে এসেছেন। আপনারা বোধ হয় জানেন ইনি গরিবের মা বাপ।

একদল হাসিয়া উঠিল। কেহ বা চেঁচাইয়া বলিল, কলওয়ালা আবার গরিবের মা বাপ।

অমলা তখন বলিয়াই চলিয়াছে, আপনাদের ন্যায্য দাবি এঁকে জানান। ইনি জানেন মানুষ পেট ভরে খেতে না পেলে কাজ করতে পারে না। কাজ পেতে হলে আপনাদের খেতেও দিতে হবে। যাতে ফুর্তিতে থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অমলার সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হইলেও রাজেশ্বর ভাবিল, অমলা এ বলে কি? এ যে বলশেভিকদের মতন কথা। সে গাড়ীর ভিতর হইতে বলিল, এ কি বলছ মা?

কথাটা অমলার কানে গেল কিনা সন্দেহ। সে শ্রমিকদের উদ্দেশে বলিল, আপনারা একদল প্রতিনিধি ঠিক করুন। সেই নেতারা অফিস ঘরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন।

শ্রমিকের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ওঁর ছেলে কথা দিয়েছিল, তা উঁনি রাখেন নি।

অমলা কহিল, আমি ওঁর মেয়ে। আমি বলছি উনি কথা রাখবেন। কথা দেবেন এবার উনি নিজে। উনি এক সময় গরিব ছিলেন, আপনাদের চেয়েও গরিব। হাল চষতেন। চাষী মজুরের উপর ওঁর যা দরদ তা আর কোন মিল মালিকের নেই।

রাজেশ্বর এবার বলিয়া উঠিল, ঠিক ঠিক আমি চাষী ছিলুম, ওদের দুঃখ আমি জানি।

অমলার রূপে শ্রমিকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়াছিল। তার সপ্রতিভ ভাব তাদের বিস্মিত করিল। শেষটায় পরিস্থিতি বদলাইয়া দিল একটা সামান্য ঘটনা। একটি নারী শ্রমিকের কোলে তার ছেলে কাঁদিতে ছিল। অমলা মায়ের কোল হইতে ছেলেটিকে লইয়া আদর করিতে আরম্ভ করিলে শ্রমিকরা পরস্পরের দিকে চাহিল। অমলা সুন্দরী বলিয়াই হোক বা তার উজ্জ্বল পোশাক দেখিয়াই হোক ছেলেটি শান্ত হইল। অমলা শিশুটির দেহে তার রঙিন স্কার্টটা জড়াইয়া দিলে কুলি মজুররা বলিয়া উঠিল, ইনকুইলাব জিন্দাবাদ। অমলা শিশুটির মার হাতে দশ টাকার একখানা নোট দিয়া বলিল, একে দুধ খাইও। আবার জয় জয়কার পড়িল। লাল ঝাণ্ডা কি জয়—

এরপর শ্রমিকদের প্রতিনিধি ও রাজেশ্বরের মধ্যে মীমাংসা হইতে আর বেশী সময় লাগিল না। দু একজন প্রথম বলিয়াছিল যে ইহা মালিকের সময় নেওয়ার একটা কৌশল মাত্র কিন্তু শ্রমিকরাই তাদের মুখ বন্ধ করিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে রাজেশ্বর বলিল, এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আশাও করিনি যে এভাবে মিটে যাবে। কিন্তু তুমি অসাধ্য সাধন করলে।

অমলা উত্তর করিল, করেছ তুমি বাবা। গরিবের দুঃখ তুমি বোঝ তাই ওদের সব দাবি মেটালে।

তার দুইদিন পরে সাঁকরাইলের 'মঞ্জরী মিলে' দাঙ্গা বাধিল। লাঠি চলিল, আসিল সশস্ত্র পুলিস।

শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়িবার জন্য এক সভা করিতে চায়। ম্যানেজার তাদের নিষেধ করে। কিন্তু মজুররা জড় হইয়া সভা আরম্ভ করিয়া দেয়।

সোদপুরের ঘটনায় রাজেশ্বর শ্রমিকদের সব দাবি মানিয়া লওয়ায় তারকেশ্বর তাদের প্রত্যেকটি কলে জানাইয়া দেয়, কোন গোলমাল বাধিলেই ম্যানেজার যেন আগে তাকে খবর দেন।

ম্যানেজারের ফোন পাইয়াই সে হুকুম দিল, সভা জোর করে ভেঙে দিন, আমি আসছি।

সে এবং সশস্ত্র পুলিস একই সময়ে মিলে আসিয়া পড়ে। তার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই পুলিস বেপরোয়া লাঠি চালায়। অনেকে আহত হয়।

এবার স্বয়ং অনন্ত শাস্ত্রী এই ধর্মঘটীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাজেশ্বরের ইচ্ছা ছিল গোলমাল মিটাইয়া ফেলে। কিন্তু তারক প্রতিবারেই বাধা দিতে লাগিল। তার আশা ছিল কুলি মজুররা গরিব, কতদিন আর চালাইবে? নিজেরা নরম হইয়া হাতে পায়ে না ধরিলে এবার আর মিটাইয়া কাজ নাই।

কিন্তু আশ্চর্য সংগঠন শক্তি এই অনন্ত শাস্ত্রীর। তিন মাস ধর্মঘট চলিল কিন্তু মজুররা নরম হইল না। তাদের খরচাও চলিতে লাগিল। লোকে বলিল, টাকা দেন অনন্ত শাস্ত্রী, উনি এক রাজার

ছেলে কিনা—। কেহ বা বলে, ভারতবর্ষের বহু রাজা মহারাজা ওঁর শিষ্য। ওঁব আর টাকার ভাবনা ?

ক্রমে ক্রমে চাঁপা মিল ভিন্ন রাজেশ্বরের সমস্ত কারখানায়ই ধর্মঘট হইল। আশে পাশের অন্য ফ্যাক্টরী গুলিতেও ইহা ছড়াইয়া পড়িল।

সরকার অনন্ত শাস্ত্রীব নামে প্রথম ওয়ারেন্ট তারপর হুলিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু পুলিস তাকে ধরিতে পারিল না। ধর্মঘট পুরাদমেই চলিতে লাগিল।

লোকে বলে, শাস্ত্রী কখনও কুলি, কখনও বা পুলিসের বেশে মজুরদের কাছে আসেন। কাবুলীওয়ালা সাজিয়া টাকা ধার দিয়া যান। রূপী লে আও, হামরা রূপী লে আও—বলিয়া লাঠি উঁচাইয়া টাকার তাগাদা করিবার ব্যপদেশে কুলী মজুরদেব কানে দেন উৎসাহেব মন্ত্র।

তারকেশ্বর বলে, লোকটা সোভিয়েটের টাকা খায়। ও হচ্ছে দেশের শত্রু।

রাজেশ্বর বলে, মানুষটার ক্ষমতা ছিল। ইচ্ছে করলে দেশের উপকার কবতে পারত।

অমলাই ফোনে মহেশ্বরকে নরেশ্বরের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর দেয়। সম্বোধন করে 'তুমি' বলিয়া। টালিগঞ্জে দেখা সাক্ষাতের পর তাদের কথাবার্তা এই প্রথম। শুনিয়া সুপ্রভা বিস্ময় প্রকাশ করে, বলে, অমলা তোমায় ফোন করেছে !

রাজেশ্বর সেই সময় কয়েকদিন অসুস্থ ছিল। নরেশ্বরের খোঁজ খবরের জন্য অমলাকে প্রায়ই মহেশ্বরের সঙ্গে কথা বলিতে হইত। পরস্পরের ঘন ঘন দেখাশুনা হইত।

উমা তাদের সম্পর্কে সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই শুনিয়াছিল। অমলার এই 'তুমি' সম্বোধন তার কেমন যেন ঠেকিল। এর চেয়েও বিস্মিত হইল তার ব্যবহার দেখিয়া। কিছুই যেন হয় নাই এরূপ সরল স্বচ্ছন্দ ভাব। শেষটায় সে সিদ্ধান্ত করিল, সভ্য শিক্ষিত সমাজের রীতিই হয়ত এই।

অমলার চরিত্রের পরিণতি মহেশ্বরকে মুগ্ধ করিল। মন তার সর্ব বিষয়েই সজাগ, হাজারে অমনটি মেলে কিনা সন্দেহ। যেমন তীক্ষ্মবুদ্ধি, তেমনিই সরলতা। প্রাণ সহানুভূতির রসে টস টস করে। মানুষের দুঃখ দুর্গতির কথা বলিতে বলিতে অমলা চঞ্চল হইয়া ওঠে। তার কণ্ঠ বাষ্পার্দ্র হয়। মহেশ্বর দেখিল তার পিতার শ্রমিক বিরোধী মনোভাব যে বহুল পরিমাণে কমিয়াছে, সেও অমলারই জন্য। এই ব্যাপার প্রায় অসাধ্য সাধনেরই সামিল। শুধু চরিত্রের নয়, তার রূপের পরিবর্তনও বিস্ময়কর। তরুণী অমলা ছিল ঝরণার মতন উচ্ছল, প্রাণ

শক্তিতে ভরপুর, ছন্দোময়ী, কলহাস্যময়ী তরুণ শিল্পীর আঁকা রেখা-চিত্রের মতন ভাবের দ্যোতনা মাত্র। আর আজকের অমলা পূর্ণ যৌবনা নদীর মতন মহিমময়ী, স্নেহময়ী যেন শ্রী ও যৌবনের জীবন্ত আলেখ্য।

অমলা মহেশ্বরের মধ্যে সেরূপ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইল না। দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয়, নামজাদা এ্যাডভোকেট মহেশ্বরও তেমনি ঈশান স্কলার মহেশ্বরের ক্রম বিকাশ। সেই ধীর স্থির শান্ত মানুষটি। হিসাব করিয়া সে কাজ করে, কিছু করার আগে পাঁচজনে কি বলিবে, কি মনে করিবে, বিচার করিয়া লয়।

কিছুদিন অসুস্থতার পর রাজেশ্বর আবার কাজকর্ম আরম্ভ করিলে অমলা ও মহেশ্বরের দেখা সাক্ষাৎ কমিয়া গেল। কথাবার্তা অবশ্য একেবারে বন্ধ হইল না, কিন্তু অমলা বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলিত না। মহেশ্বর ইহাতে ব্যথিত হইল।

মঞ্জরী মিলের ধর্মঘট বেশ গুরুতর আকার ধারণ করিলে অমলা রাজেশ্বরকে বলে, বাবা এবার বড় বাবুকে ডেকে নাও। তোমার বয়স হয়েছে, মেজ বাবুর উপর মজুরদের রাগ। বড় বাবু ছাড়া এখন দেখবে কে? বিশেষ করে ওদিকে রয়েছে অনন্ত শাস্ত্রীর মতন অর্গ্যানাইজার।

ধর্মঘট এবার জোর চলিল। শীঘ্র মিটিবার কোন লক্ষণই নাই। ইহা লইয়া রাজেশ্বর বেশ বিব্রত। প্রায়ই মহেশ্বর ও অমলার সঙ্গে পরামর্শ করে। আগে যে-সময় অমলার বই পড়া শুনিত এখন সেই সময় ধর্মঘটের আলোচনা হয়। মোটা টাকা ধার করিয়া আমেরিকা হইতে সে নূতন কতগুলি কলকব্জা আনাইয়াছে। এ অবস্থায় ধর্মঘট না মিটিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। বাজারে দুর্নাম হইবে! রাজেশ্বরের আহার নাই, নিদ্রা নাই, এক একদিন সে বলে, মা, এর চেয়ে চাষীর জীবন ছিল অনেক ভাল। এত ঝামেলা সুদে পোষায় না।

অমলা হাসিয়া বলে, বুড়ো হয়েছ বললে তুমি আপত্তি কর। কিন্তু এ যে বার্ধক্যেরই লক্ষণ, বাবা। রাজেশ্বর একটু হাসে।

মহেশ্বর মক্কেলের কাজ সারিয়া রাত নয়টা আন্দাজ বালিগঞ্জের বাড়ীতে আসে। থাকে এগারটা বারটা পর্যন্ত। প্রায় দিনই খাইয়া যায়।

অমলাই তাকে ফোনে ডাকে, তাকে রাজেশ্বরের বক্তব্য জানায়। মহেশ্বর কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে জবাব দেয়। তবে তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এর মধ্যেই সে বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। চন্দন ও কণাকে কখনও সে পুতুল কিনিয়া দেয়, কখনও আইসক্রিম কিংবা প্যাস্টিজ্। তাদের একা পাইলে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আদর করে, চুমু খায়। তার বুক বেদনায় টনটন করিয়া ওঠে। কণা বলে মাতী বড ভাল। চন্দন মাকে বলে, মাতীমা তোমার চেয়েও সুন্দর। তবে বড্ড চুমু খায়। শুনিয়া সুপ্রভা গম্ভীর হইয়া যায়।

তার সঙ্গে অমলার কথাবার্তা কখনও বন্ধ হয় নাই। তবে বিবাহের পর সুপ্রভা তাকে যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছে। অমলাকে দেখিলেই তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। সুপ্রভার উপর অমলার কোন দিনও রাগ হয় নাই বটে কিন্তু তার সিঁথির সিন্দুর দেখিলেই মনে হয় জগতে সুখ সম্ভোগ করার জন্য যে বিশেষ যোগ্যতার দরকার সেটা তার মোটেই নাই। সুপ্রভার আছে, তাই সে তার প্রাপ্য পাইয়াছে। আর নাই বলিয়াই তার নিজের ভাগ্যে জুটিয়াছে বঞ্চনা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুজনেরই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিল। অমলার যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে আবার অল্পেই আগের সেই প্রীতির সম্পর্ক ফিরিয়া আসিল।

সুপ্রভা স্বামীকে বলিত, অমলার মন আয়নার মতন পরিষ্কার। এমনটি দেখা যায় না।

সে অমলার কাছেও অনেক কিছুই বলে। মহেশ্বর সম্বন্ধে বলে, জানো উনি নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাদের দিকে তাকাবারও সময় পান না।

মহেশ্বর হাসিয়া বলে, আর তুমি ?

আমি কি করেছি ?

মহেশ্বর বলিল, আচ্ছা, নিজেই তুমি বল দেখি, তুমি কি আমার কোন খবর রাখ ?

সুপ্রভা বিচারের ভার দেয় অমলার উপর। বলে, বেশ তুমিই বল অমু, দেখছ ত এই কিছুদিন। এই প্রসঙ্গ লইয়া তিনজনের মধ্যে শেষটায় হাসাহাসি পড়িয়া যায়। তাদের আড়ালে অমলার চোখ মাঝে মাঝে ছল ছল করিয়া ওঠে। সুপ্রভা ও মহেশ সে খবর রাখে না।

মঞ্জরীতে দুর্ভিক্ষ। ঘন ঘন তাগিদ আসে টাকা পাঠাও। সাহায্য চাহিয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবরা রাজেশ্বরকে চিঠি দেয়। লেখে, তুমি থাকতে আশা করি আমরা না খেয়ে মরব না।

দেশের রিলিফ কমিটিতে রাজেশ্বর একবার হাজার টাকা দিল। আত্মীয় স্বজনদের পৃথক্‌ভাবে সাহায্য করিল! জীবনে একদিনও যার নিকট সামান্য উপকার পাইয়াছে গোপনে তাদের প্রত্যেকের খবর লইল।

দেশের অবস্থা ভয়াবহ। যেমন অন্নকষ্ট, তেমনি ব্যাধির প্রকোপ। এই সময় মিলের ধর্মঘট বন্ধ হইলে কলিকাতায় ও একটা রিলিফ কমিটি করা হইল। তাহাতেও রাজেশ্বর হাজার টাকা দান করিল। ত্রিগুণাকে বলিল, তুমি হও এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট। মহেশ্বর সেক্রেটারী।

ত্রিগুণা বলিল, আমি গরিব লোক। আমার চেয়ে তোমার প্রেসিডেন্ট হওয়াই ভাল। গরিবকে কি লোকে টাকা দেবে?

রাজেশ্বর উত্তর করিল, দেশময় তোমার নাম। সে তুলনায় আমায় আর চেনে ক'জন?

বাল্যের এই দুই বন্ধু পরস্পরের সাফল্যে গর্ব বোধ করে। দার্শনিক হিসাবে, সমাজের নেতা হিসাবে, চরিত্র বলে ত্রিগুণার খ্যাতি দেশব্যাপী। সরকারে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

একবার একটি ছেলে আইন অমান্য হিসাবে রাজপথে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিতেছিল। পুলিস তাকে যত মারে ছেলেটি ততই জোরে চিৎকার করিতে থাকে। ত্রিগুণা ঐ পথে আসিতেছিল। সে আগাইয়া গিয়া বলিল, I protest.

উদ্ধত রাজপুরুষ তাকেও তাড়া করিলে সে বলিল, বন্দেমাতরং।

এবার আক্রমণ চলিল তার উপর। তারই একটি ছাত্র পুলিসের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, What are you doing, Monroe? He is a great scholar.

মনরো বলিল, I will teach him a new lesson.

এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার তখন লাঠিখানা মনরোর হাত হইতে কাড়িয়া নেয়।

তার পরদিন বাংলায় ও বাংলার বাহিরে কাগজে কাগজে বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক ডক্টর ত্রিগুণা সেনে। আঘাতের এই সংবাদ বাহির হইল। অনেকে মামলা করিতে পরামর্শ দিল। ত্রিগুণা কহিল, মার খেয়ে মামলা করার ইচ্ছে আমার নেই। আমার পজিসনের সুযোগ নেওয়ায় দেশের কোন লাভ হবে না। আমি নিজে এবার সত্যাগ্রহী হব।

পরদিনই সে সরকারের প্রদত্ত সি, আই, ই উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বড়লাটকে এক চিঠি দিল,—আমার উপর কিংবা আমার দেশ-

বাসীর উপর এই যে অত্যাচার এর জন্যে কোন ব্যক্তি বিশেষকে আমি দায়ী মনে করি না। দায়ী ভারতে প্রচলিত শাসন যন্ত্র। এই শাসন যন্ত্রের প্রদত্ত সম্মান থেকে মুক্তি চাই।

রিলিফ কমিটিতে ত্রিগুণা চরণের নাম থাকায় বাংলার বিভিন্ন স্থান এমন কি বাহির হইতে মঞ্জরীর সাহায্যের জন্য প্রচুর টাকা আসিতে লাগিল।

আবার মহেশ্বর ও অমলার মেলামেশার সুযোগ হইল। রিলিফ কমিটির বেশীর ভাগ কাজই তারা দুজনে করে, চাঁদা সংগ্রহের জন্য বড়লোকের বাড়ী যায়, হিসাব রাখে। অনেক সময়ই একসঙ্গে থাকিতে হয়। অমলার সান্নিধ্যের জন্য মহেশ্বর কাজে বেশী উৎসাহ পায়। দুজনেই করে অক্লান্ত পরিশ্রম।

রাজেশ্বরের একবার মঞ্জরী যাওয়া দরকার। সেখানে রিলিফের কাজে নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। তাই স্থানীয় লোকেরা বার বার টেলিগ্রাম করিতেছিল। অমলা বলিল, এ বয়সে পারবে গিয়ে কাজ করতে? রাজেশ্বর হাসিয়া উত্তর করিল, এর মধ্যেই আমি বুড়ো হয়ে গেলুম নাকি? এখনও ত ষাট হতে তিন বছর বাকী।

অমলা আবদার ধরিল, আমায় কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে, বাবা।

নিলে আমারই সুবিধে হত, কিন্তু সে যে পাড়াগাঁ। সেখানে হয়ত তোমার নানারকম অসুবিধে হবে।

অমলা বুঝিল রাজেশ্বর কিসের ইঙ্গিত করিতেছে। মঞ্জরীর অনেকেই তার কথা জানে, হয়ত একটু বেশী করিয়া জানে। পল্লীগ্রামের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তারা পদে পদে এই মেয়েটির লাঞ্ছনা করিতে পারে। রাজেশ্বরের এই আশঙ্কা।

অমলা তাই চুপ করিয়া গেল।

সেদিন অমলা ও মহেশ্বর উত্তর শহরতলীর কোনও মহারাণীর নিকট হইতে রিলিফের চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার পরে মহেশ্বর বলিল, একটু বেড়িয়ে যাবে, অমলা ?

তোমার যা ইচ্ছে।

ড্রাইভার আনে নাই, ষ্টীয়ারিং ছিল মহেশ্বরের হাতে। সে যশোর রোডে পৌছিয়া বারাসতের দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল। গাড়ী হু হু করিয়া ছোটে, বাতাসে মহেশ্বরের চাদর উড়িতে থাকে। অমলার রেশম-কোমল চুলের গোছা আসিয়া পড়ে তার মুখের উপর। সে হাত দিয়া এক একবার সরাইয়া দেয়।

ডাইনে বাঁয়ে, সামান—পিছনে গ্রামের সীমারেখার মতন গাছের সারি। মাঠের উপর গ্রাম, গ্রামের পর আবার মাঠ। গোধূলির ধূসর আলোয় প্রকৃতির রূপ গৈরিক বসনা উমার মত। তারই মধ্যে জনবিরল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া একজন মানুষ শামুক গুগলি খোঁজে—মনে হয় যেন পরশ পাথরের সন্ধান করিতেছে।

পথের ধারে মাঝে মাঝে জীর্ণ কুটির, কোথাও বা একখানা ক্ষুদ্র দোকান। দোকানী দীন বেসাতি লইয়া বিরল পথিকের প্রতীক্ষা করে, দুপয়সার মাল বেচিবে বলিয়া।

এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে পট পরিবর্তন হয়। মাটির নীচের কালো ছায়া ধূসর ধরণীকে গ্রাস করিতে চায়। অমলা বলে, আর কতদূর যাবে ?

মহেশ্বর উত্তর করে, দেখি কতদূর যেতে পারি।

অমলা বলে, তেল আছে ত ?

তেল যা আছে তাতে অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে।

হঠাৎ অমলা বলিল, গাড়ীটা থামাও ত।

ব্রেক কষিতে কষিতে মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল দেখি ?

সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গেল একটা কুকুর ছানার ক্ষীণ করুণ কাতরানি। তারা দুজনেই গাড়ী হইতে নামিল।

বাঁদিকে ছোট একখানা জমি, মাটি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, শুকনা ঘাসগুলি গায়ে বেঁধে, তারই মধ্যে প'ড়িয়া আছে একটা কুকুরছানা। চোখ-দুটি ঘোলা, জীবনরসের অভাবে তাতে দৃষ্টিশক্তি আছে কিনা সন্দেহ। ছানাটি কতদিন এইভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে কে জানে? অমলা তাকে তুলিতে গিয়া দেখিল, কুকুরটির কোমর ভাঙা, পিছনের দুখানা পা'ই যেন অবশ। অমলার স্পর্শে সে জোরে কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল। অমলা বলিল, একটু জল যদি দিতে পারতাম হয়ত বাঁচত, শুধু একটু জল।

দুধারেই শুকনা জমি, জলের লেশমাত্র নাই। গাড়ীতে উঠিয়া অমলা পরম স্নেহভরে ছানাটির মাথায় হাত বুলায়। তার মুখে ফুটিয়া ওঠে স্নেহ ও করুণার এক অপরূপ শ্রী।

মহেশ্বর এক একবার অমলার দিকে চায় আর মনে করে, ঐ ছানাটি কি ভাগ্যবান।

খানিকটা পরে একটা পোড়ো বাগান পাওয়া গেল। সামনেই আম গাছে ঘেরা পুকুর। তার জীর্ণ ঘাটে ছোট বড় অনেকগুলি ফাটল। তার মধ্য হইতে বট ও অশ্বত্থের চারা উঠিয়াছে। কোথায়ও ঘাসের চাবড়া। অমলা ঘাট বাহিয়া জলের ধারে নামিয়া গেল। কুকুরটার মাথায় একটু জল দিয়া রুমাল ভিজাইয়া তার মুখের কাছে ধরিলে সে চকচক করিয়া খাইতে লাগিল। মহেশ্বর বলিল, টিফিন ক্যারিয়ারে মাখন আর বিস্কুট আছে, এনে দি।

জল ও খাবার খাইয়া ছানাটি ঝিমাইতে লাগিল।

অমলা বলিল, ওর নাম রাখা যাক পথিক। পথের আলাপ ওর সঙ্গে।

মহেশ্বর বলিল, পথের আলাপ আমাদের সকলেরই। তবে দুদিন বেশী আর কম।

চাঁদিনী রাত। বাগানের গাছগুলি জ্যোৎস্নার বুকে ছোট বড় অসংখ্য রেখা টানিয়া দেয়। পুকুর পারের গাছগুলি জলের মধ্যে নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গাছতলার এধারে ওধারে কতকগুলি ডিমের খোসা, মেটে বাসন ও কলার পাত। পাশেই অমলা একটা ব্রোচ কুড়াইয়া পাইল। সে বলিল, বোধ হয় কেউ এর আগে পিক্‌নিক করে গেছে। যাক, তবু রিলিফ কমিটির কিছু হল।

মহেশ্বর বলিল, সবই তুমি রিলিফের জন্য টানতে চাও।

অমলা উত্তর করিল, চাই বই কি। অবশ্য আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।

খরচা পোষাবে ?

তা পোষাবে, সোনার যে দাম। খানিকটা পরে সে বলিল, তুমি আগে এদিকে এসেছ বোধ হয় ?

মহেশ্বর কহিল, দুচারবার এসেছি। সময় পেলেই আমি গ্রামের দিকে যাই, পাড়াগাঁর ছেলে, গ্রামই আমার বেশী ভাল লাগে।

আমারও লাগে, তবে বাংলার গ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই মোটেই। পশ্চিমে পাড়াগাঁ কিছু কিছু দেখেছি কিন্তু তার রূপ অন্য রকম।

গ্রামের কথা হইতে উঠিল চাষীর জীবনের কথা।

মহেশ্বর বলিল, অনেক চাষী পরিবারই কলকাতার মজুরদের চেয়ে গরিব। কিন্তু বাঙালীর ভিটের টান বড় বেশী। তাই তারা গাঁ ছেড়ে আসে না।

অমলা বলিল, তাদের মর্যাদাও পশ্চিমে কুলির চেয়ে বেশী। তাদের সংসার সমাজ আছে, ঐতিহ্য আছে।

মহেশ্বর কহিল, তা নিশ্চয়ই। চাষী নিজের জমি চষে।

অমলা কহিল, জমিদারী প্রথা চাষীকেও একটা মর্যাদা দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রমিক সে হিসাবে নিঃস্ব, চাষী তা নয়।

মহেশ্বর বলিল, জানো আমার এই চাষী সম্প্রদায়েরই লোক? বাবা নিজের হাতে চাষ করতেন।

কিন্তু আজ তোমরা জমিদার।

মহেশ্বর বলিল, কিন্তু এই চাষীর ছেলে বলেই তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছ।

কথাটা মর্মান্তিক সত্য। অমলা তাই চুপ করিয়া রহিল। মহেশ্বর তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ভুল আমিও কম করি নি, অমু।

অমলা বলিল, সে কথা তুলে কোন লাভ নেই। তার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মনে পড়ে বালিগঞ্জের সেই রাত্রির কথা?

মনে খুবই পড়িতেছিল। মহেশ্বরের স্পর্শে অমলার বুকে তখন তীব্র স্পন্দন চলিতেছিল।

মহেশ্বর বলিল, আমি তোমায় চাই, একান্তভাবেই চাই।

অমলা বলিল, চাওয়া অন্যায়।

চাই তবুও।

কিন্তু কি ভাবে তুমি আমায় চাও?

তা জানি না।

অমলা বলিল, একদিন আমরা পরস্পরের হতে পারতাম। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। তোমার খেলার পুতুল হয়ে আমি থাকতে পারি না।

মহেশ্বর বলিয়া ফেলিল, একদিন ত বীরেশের পুতুল হতে পেরেছিলে।

ছিঃ—তুমি এত ছোট—অমলা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ছিলাম, তার খেলার পুতুলই ছিলাম। সে আর তুমি!

মহেশ্বর তার হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পাপিষ্ঠা। তাবপরই তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া অমলা সোজসুজি বাজেশ্বরের ঘবে গেল। রাজেশ্বর তখন চুপ করিয়া বসিয়া।

তোমাব এত দেবি হল যে—এই প্রশ্ন কবিতে যাইয়াই অমলার মুখেব দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল তাব চোখ বিভ্রান্ত, মাথাব চুল বিস্রস্ত। বাজেশ্বরের আব কিছুই বলা হইল না। বুঝিল স্বভাব-ধীব এই মেয়েটিব মনে একটা তীব্র ঝড চলিতেছে!

অমলা বলিল, তোমাব সঙ্গে পরশু আমায়ও মঞ্জরী নিয়ে চল।

রাজেশ্বব বলিল, বেশ যেও।

সমস্ত বাত অমলাব ঘুম হইল না। সে ভাবিল অনেক কথা, মহেশ্বরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, তাব তখনকাব ধরন ধাবণ। পল্লীগ্রাম হইতে সদ্য আগত ছাত্র মহেশ্বব ছিল কী লাজুক, কী ভদ্র! অমলাব মনে হইল, সে ভাল বাসিত সেই সরল, সুন্দর তরুণকে, আজও ভালবাসে সেই তরুণের স্মৃতিকে।

মহেশ্ববের ভাই বলিয়া বীরেশ্বরকেও বাসিত। এই মহেশ্ববকে সে ভালবাসে না। না না, তা অসম্ভব।

কিছুদিন যাবৎ ভুলও সে কম করে নাই। মহেশ্বরেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার আগে তাব ইহা বোঝা উচিত ছিল। আজ বুঝিল, আগুন লইয়া সে খেলিয়াছে। পুড়িতে তাকে হইবেই। ইহাই প্রকৃতিব ধর্ম। এমন ভাগ্য করিয়া সে আসে নাই যে আগুন লইয়া খেলিবে অথচ তার আঁচ গায়ে লাগিবে না। এই শাস্তি তার উপযুক্তই হইয়াছে।

খুব ভোরে রাজেশ্বর ঠাকুর ঘরে নাম জপ করিতেছিল। অমলা ঢুকিয়াই ব্যস্তভাবে বলিল, একখানা গাড়ি চাই, বাবা এক্ষুনি চ'ই।

রাজেশ্বর জপের সময় কেহ ঠাকুর ঘরে যায় না। তাই অমলার এই ব্যস্ততায় সে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, কেন মা?

আমার পথিকের জন্য, তাকে আমি ফেলে এসেছি। অমলা বিগত সন্ধ্যার সেই কুকুরের গল্প বলিল।

ভুলে পথিককে ফেলে এলুম বাবা—কণ্ঠে ছিল তার বেদনার সুর।

রাজেশ্বর বলিল, এই কথা মা? বেশ আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আর একটু আলো হোক।

অমলা বলিল, তাড়াতাড়ি ক'র কিন্তু।

রাজেশ্বরের জপ হইল না। সে ভাবিতেছিল অমলার কথা। একটা কুকুরছানার জন্য যার এত দরদ, ভাগ্যবিধাতা তাকে সব রকমে এমন করিয়া বঞ্চিত করিলেন কেন?

গাড়ীতে যাইতে যাইতে অমলা বলিল, বাবা তুমি হঠাৎ আমার মঞ্জরী যাওয়ার মত দিলে যে?

রাজেশ্বর বলিল, মহেশের কাছ থেকে তোমার একটু দূরে থাকা দরকার। তাতে উভয়েরই মঙ্গল।

অমলা প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করিল। শেষে ভাবিল, ভুল বুঝিবার এবং ভুল বুঝিয়া রাগ করিবার মানুষ ত রাজেশ্বর নয়।

সে সোফারকে বলিল, একটু তাড়াতাড়ি চলুন, শ্রীধর বাবু। চিনে যেতে পারবেন ত?

সোফার বলিল, কোন্ জায়গায় যেতে হবে বুঝতে পেরেছি। আপনি শুধু বাগানটা আমায় চিনিয়ে দেবেন।

বাগানে পৌছিয়া তারা দেখিল, কুকুর ছানাটি সামনের আমগাছ তলায় পড়িয়া মরিয়া আছে। মুখে ডিমের খোলা জড়ানো! ক্ষুধার

জ্বালার ঐ খোলা গিলিতে যাইয়াই হয়ত তার দম আটকাইয়া গিয়াছে।

অমলা একটুক্ষণ স্থিরভাবে চাহিয়া পথিককে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, তোকে আমি এমনি করে ফেলে গেলুম!

মঞ্জরীতে আসিয়াই রাজেশ্বর রিলিফের কাজের এক নূতন রূপ দিল। তাঁতীকে দিল তাঁত ও সুতা, কামারকে হাপর, জেলেকে জাল। যারা অন্য কোন কাজ করিতে অসমর্থ তাদের চরকা ও তুলা দিয়া বলিল, সুতা কাটো, আমরাই কিনে নেব।

অন্ধ আতুর এবং অতি বৃদ্ধ ভিন্ন সকলকে দিয়াই সে কাজ করাইয়া নিত। প্রত্যেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত। রাজেশ্বর বলিত, এতে মানুষের আত্মসম্মান বাড়ে। তা ছাড়া বসে খাওয়াব মত পাপ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। যে খাওয়ায় এবং যে খায় অপরাধ দুজনেরই।

রিলিফের কাজে মঞ্জরী এবার জ্যোৎস্নানাথকে পাইল। এই অভিজাত ব্যারিষ্টার বিপুল প্রাকটিস ও নগরীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই যে মঞ্জরীতে আসিয়া রাজেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত আলোক আশ্রমে যোগ দেন সেই হইতে এই আশ্রম লইয়াই আছেন। সুতা কাটেন, তাঁত বোনেন, ছেলে মেয়েদের পড়ান, দরিদ্রের সেবা করেন। কাজ তাঁর অচ্ছুতদের লইয়া।

তাঁর বন্ধু গ্রামের যত সরল চাষী মজুর, যত কামার কুমার আর বনজঙ্গলের পশু পাখী। ঠিক দুপুরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী তার উঠানে আসিয়া বসে। কাক, চিল, চড়ুই, শালিক, পায়রা ও হরিয়ালের দল। আসে সব পথচারী কুকুর, বিড়াল, মানুষের পরিত্যক্ত যত গরু বাছুর। জ্যোৎস্নানাথের বাড়ীতে এদের নিত্য নিমন্ত্রণ। এদের চিৎকারে ও

কলগুঞ্জনে বাড়ীটা মুখরিত হইয়া ওঠে। জ্যোৎস্নানাথ উঠানে চাল কলা বিছাইয়া দেন। ছোলা, ভুষি, বিচালি, জল ও মাছ মাখা ভাত দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী বারান্দায় বসিয়া এই ভোজ দেখেন। রোজ দুপুরে পাঁচটি করিয়া দরিদ্রের পাত পড়ে। নিজেরা যাহা খান, তাদেরও ঠিক তাহাই দেন।

বৈকালে আসে পড়ুয়ারা, কেহ এম, এর ইংরেজী ও ফিলজফি পড়িয়া যায়। কেহ বি, এর ইকনমিক্স। স্কুলের ছেলেরা আসে ট্রানশ্লেসন সংশোধন করাইয়া নিতে, কেহ সাবষ্ট্যান্স লিখিয়া নেয়। মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্নানাথ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র চর্চা করেন। মোটা খদ্দর পরিহিত বিলাস ব্যসনহীন এই মানুষটিকে দেখিলে মনে পড়ে আশ্রমবাসী মুনি ঋষিদের কথা।

জ্যোৎস্নানাথের স্ত্রী স্বামীর আদর্শ সঙ্গিনী। মোটা ভাত কাপড়েই তাঁর আনন্দ। আনন্দ আর্তের সেবায়, পাখীর কল কাকলি শ্রবণে। স্বামীকে তিনি সর্বকার্যে উৎসাহ দেন। তাঁর দুঃখ এই যে নিজে কিছু সাহায্য করিতে পারেন না। বালিগঞ্জে বসিয়া তবু কিছুটা করিতে পারিতেন কিন্তু এখন সে সামর্থ্যও নাই।

মধ্যে মধ্যে রাজেশ্বরকে তিনি সুপ্রভার বিষয় প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, এখন প্রভা কি করছে? চন্দনকে পড়াচ্ছে? বাঃ বেশ। মার কাছে ছোটদের যেমন শিক্ষা হয় আর কারও কাছে তেমনটি হয় না। কখনও মন্তব্য করেন, মহেশকে ভাগ্যবান বলতে হবে, প্রভার মতন স্ত্রী পেয়েছে। কি বল, অমলা?

অমলা মৃদুকণ্ঠে উত্তর করে, হ্যাঁ।

এই সুখী দম্পতির সান্নিধ্যে রাজেশ্বর ও অমলার দিন বেশ কাটিয়া যায়। রাজেশ্বর ভাবে তাঁদের ত্যাগের কথা। জীবনের প্রতিটি অভ্যাসের পরিবর্তন, এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছু নাই। কেহ তার দানের সুখ্যাতি

করিলে রাজেশ্বর বলে, ছিলুম দীন দরিদ্র, হয়েছি মিলের মালিক। আমার পক্ষে দু দশ টাকা ত্যাগ তো বিলাস ব্যসনের সামিল। ত্যাগ ব'লতে হয় ককাটি মশাইর।

রাজেশ্বর পল্লীগ্রামে মানুষ। পল্লী প্রকৃতির উপর তার আকর্ষণই স্বতন্ত্র। জ্যোৎস্না নাথের এই জীবন তার বড় ভাল লাগে—ঝিল্লি তাঁকে ঘুম পাড়ায়, প্রভাতে পাখীর ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙে, ঝোপঝাড় হইতে বৌ কথা কও ডাকিয়া তাঁর সঙ্গে কথা কয়, গ্রীষ্মের দুপুরে শ্রান্তি অপনোদন করে গাছের ছায়া আর মঞ্জরীর খালের স্বচ্ছ শীতল জল, বৈকালে মেঠো হাওয়া হয় ভ্রমণের সাথী।

রাজেশ্বরের মনে পড়ে তার নিজের অতীত জীবন, গাঙে নদীতে মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, মধুমতী-বক্ষে সেই গান—

নাইয়া রে মোর নাইয়া
কিসের লাগি কোথায় তুমি
চলছ রে নাও বাইয়া
ও মোর নাইয়া—।

তার এক এক বার ইচ্ছা হয় মঞ্জরীতে আসিয়া সেও আগের সেই জীবন যাপন করে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। মিল, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওর কোম্পানি এরা যে অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়াছে। এই প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া অতীতকে দেখা হয়ত চলে কিন্তু পিছনে ঝাঁপাইয়া পড়া এখন অসম্ভব।

জ্যোৎস্নানাথ একদিন অমলাকে বলিলেন, এ আশ্রম কিন্তু একদিন তোমার ঘাড়েই পড়বে, মা

অমলা তাঁর দিকে চাহিল।

জ্যোৎস্নানাথ বলিলেন, আমরা আর কদিন ? এর পর আশ্রম চালাতে হবে তোমাকে।

অমলা রাজেশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, ওঁকে দেখবে কে ?

জ্যোৎস্নানাথ কহিলেন, তা বটে, কিন্তু এ আশ্রমও ত ওঁরই।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিল, অমলা আপনার আশ্রম বাঁচাতে পারবে বটে কিন্তু আদর্শ বাঁচবে না।

জ্যোৎস্নানাথ বলিলেন, কেন ?

অমু মা এর রূপ বদলে দেবে। ও হচ্ছে সোভিয়েট পন্থী।

জ্যোৎস্নানাথ কহিলেন, বাঁচার সার্থকতাই ত ঐখানে। পরিবর্তন মানেই নূতন প্রাণশক্তি।

রাজেশ্বর গম্ভীর হইয়া যায়। ভাবে, ককাটি মহাশয়ের মতন মানুষ এ কী বলিতেছেন।

রিলিফের কাজের চাপ তখন খুবই বেশী। জ্যোৎস্নানাথ ও রাজেশ্বর আর্ত ত্রাণ লইয়াই ব্যস্ত। উভয়েই অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। রাজেশ্বর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যে মধ্যে নৌকা করিয়া ঘুরিয়া আসে। কখনও জ্যোৎস্নানাথ ও অমলা সঙ্গে থাকেন। কখনও সে একলা যায়।

কচুরিপানায় নৌকা আটকাইয়া গেলে নিজে লগি ঠেলে, কাদায় নামিয়া নৌকা টানে। বলে, এতে ভারী আনন্দ, যার বাড়ী বিলে নয়, এ আনন্দ সে বুঝবে না।

অমলা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ছেলেবেলাও কি নৌকা এরকম আটকাত ?

ধাপ-দলে মাঝে মাঝে মাঝে আটকাত বটে। কিন্তু এত বেশী নয়। এই কচুরিপানা তখন ছিল না।

সেদিন ত দেখালে পুরানো কচুরিপানা, তার নীল ফুল।

রাজেশ্বর বলিল, তার বাড়তি এত ছিল না, আর এ যেন রাবণের বংশ। বাংলার এ একটা শ্রেষ্ঠ অভিশাপ। গত যুদ্ধের সময়ে প্রথম আসে, তাই এর নাম জার্মান কচুরি।

নৌকা করিয়া বেড়াইতে অমলার বড় ভাল লাগে। বিলের শেওলা পানা, পদ্ম নাল এগুলি কী সুন্দর! পথ ঘাট কিছু নাই বটে, কিন্তু এই অভাবই যেন পল্লী-শ্রীকে বেশী মধুর করিয়া তুলিয়াছে। শহরের বড় বড় পাকা সড়ক, তাতে মোটর চলে, চলে বাইসিক্‌ল, গাড়ী ঘোড়া। পথে পথে আলো, দুধারে ইমারত। এসব গুলিতে জীবন যাত্রা সরল ও সহজ করিয়া তোলে বটে কিন্তু রাজেশ্বরের মনে হয় মানুষের তৈরি সভ্যতার এ দান যেন প্রকৃতির অনিয়ম। আর মঞ্জরীর এই পল্লী-শ্রী বিধাতার নিজের হাতে গড়া।

মানুষ একে বেশী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে নাই বলিয়াই বোধ হয় মঞ্জরী এত মনোরম। মনোরম এর খাল বিল নদী নালা, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। প্রকৃতির রূপ এখানে কি সুন্দর! এই সৌন্দর্যের মধ্যে রাজেশ্বরের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটিয়াছে। জীবনের সেই দিন গুলিও সুন্দর। প্রকৃতির আজকের এই রূপ আর তরুণ বয়সের স্মৃতি বর্তমানের অনুভূতিকে নিবিড়তর করিয়া তোলে। এক একটা জায়গা দেখে, দেখে এক একজন মানুষ আর মনের মণিকোঠায় লুকানো স্মৃতিগুলি মুক্তার দানার মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে।

অতীতের সবই যেন ভাল। নইল গাছে চড়িয়া নইল খাওয়া, বাগানে বাগানে পাকা গাব, আম করমচা বেতফল ও ডৌয়ার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান, বৌ কথা কওর অনুকরণে শিস দেওয়া, বট গাছের জট ধরিয়া দোল খাওয়া—সে ছিল এক মধুর জীবন। নইলের ভঙ্গুর ডাল পায়ের তলায় মটমট শব্দ করিত, প্রতি মুহূর্তেই জলে পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল আর সেই ভীতির মধ্যেই ছিল আনন্দ।

ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিলে ভুঁইয়া মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইতেন, আত্মীয় স্বজনরা ধমক দিতেন। মিশিতে তার বেশী ইচ্ছাও ছিল না। তার চেহারা সুন্দর, প্রকৃতি শান্ত, ত্রিগুণার সে বন্ধু তাই বামুন কায়েত

কিশোররা অভিভাবকদের নিষেধ মানিত না। তার সঙ্গে ভাব করিতে আসিত।

এক দিনের কথা আজও মনে পড়ে। পাখীতে ঠোকরানো একটা আম—একদিকে সিঁদুরের রং আর একদিকে সবুজ কাটিয়া সবে হলুদ হইতে শুরু করিয়াছে, পাখীতে সামান্যই খাইয়াছে—আমটি মাটিতে পড়িলে তার ওই রং এর জন্যই রাজেশ্বর সেটা তুলিয়া লইল।

আব যায় কোথায়? গাছের মালিক বাঁশের মতন ঢেঙা বিধবা সোনা ঠাকরুন কী তীব্র ভৎর্সনাই না করিলেন—অভাইগ্যা, বাপ-মা খাওয়া ছাওয়াল। হবে না বরাত এই বকম? মানুষের পাপের ফল হয় হাতে হাতে।

রাজেশ্বব ছুটিয়া পলাইল। তারপব সে আর কথনও কারও গাছ তলায় যায় নাই। আজ এই সব কথা মনে পড়িলেও ভাল লাগে। অতীতের সব কিছুই লেপিয়া পুঁছিয়া মুছিয়া গিয়াছে বিস্মৃতির অতল তলে—মাঝখানটায় দুই একটা ঘটনা শুধু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন যে আছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু সেগুলি না থাকিলে জীবনটা এত উপভোগ্য হইত না।

আব্বাসের পিসি, বয়স কেহ বলে একশ দশ, কেহ বলে একশ পনর। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেও সে রাজেশ্বরের বাড়ী দুধ যোগাইত। বর্ষায় আসিত নিজের ডোঙা বাহিয়া। আব্বাস নাই, তার ছেলে আবদুলও নাই। আছে আব্বাসের নাতি আশ্রফ আর তার ধান কলাই পাহারা দিবার জন্য একশ পনর বছরের বুড়ী জাহানারা।

উঠানে ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। জাহানারা একখানা ডাল হাতে করিয়া এককোণে বসিয়া আছে। কখনও মুখে শব্দ করিয়া, কখনও ডাল উঁচাইয়া, দুই একবার বা উঠিয়া সে গরু ছাগল হাঁস মুরগী, পশু পাখী সব তাড়ায়। চুলগুলি ধবধবে সাদা, কলিকাতার

বুড়ীর-মাথার-পাকা-চুলেরই মতন, গায়ের রং কালো, দাঁত পড়িয়া আবার গোটা দুই উঠিয়াছে। চিবুকের উপর কয়েক গাছা পাকা দাড়ি গজাইয়াছে।

রাজেশ্বরের তাকে দেখিয়া মনে হইল এ যেন গত শতকের একখণ্ড স্মৃতি ফলক। বৃদ্ধা রাজেশ্বরকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। রাজেশ্বর নিজের পরিচয় দিল, আমি তোমাগো রাজু, চিনলে না আয়ি মা?

ওঃ আমাগো রাজুয়া, হুরীর মতন খুব-সুরৎ তোর বউ। ভাল, ভাল।

অতীতের কিছু কিছু জাহানারার মনে পড়ে, সবটা নয়।

রাজেশ্বর বলিল, আমার ছেলেবেলা গোপনে তুমি আমায় অনেক দুধ খাইয়েছ, আয়ি মা। বলেছ, কেওরে কইস্‌না, একটু খা; পাস্‌ না তো খাইতে, বাপ মা নাই।

বৃদ্ধা বলিল, আমি ভুলি নাই। তুই মণ্ডলের জামাই। মণ্ডল আমারগো ছোট ছিল। তার বাবা শুখাই ছিল মোরগো বয়সী। মাইয়াডা তোর বুঝি? বড় খুব-সুরৎ, ওলফাত কাজীর বাড়ীর আনারটার মতন।

এই বৃদ্ধারই এক সখী ছিল জয়া। একশত সাত বৎসর বয়সে সে মরিয়াছে। রাজেশ্বর বলিল, মনে পড়ে জয়া মাকে?

আব্বাসের পিসি বলিল, পড়ে। সে আমারে গাঁজা খাইতে কইত। আমি খাই নাই, আক্‌, থু।

বালবিধবা জয়াকে সকলে ডাকিত জয়া রাঁড়ি। রাজেশ্বর ডাকিত জয়া মা বলিয়া।

রাজেশ্বরের মা'র বয়স তখন প্রায় বাইশ। বিবাহের দশ বৎসরের মধ্যে তার কোন সন্তান না হওয়ায় তাকে সকলে বন্ধ্যা ঠাওরাইল। আলোকের কুলগুরু গুপী ঠাকুরের বাবা দ্বারিক ঠাকুর বলিলেন, একটা

কবচ দিতে পারি। তাতে এক ভরি গাঁজার ছাই লাগবে, একটানে পোড়ান এক ভরির ছাই। হাতে কবচ পরলেই ছাওয়াল হবে।

পরগনার বড় বড় গাঁজারু ফেল পড়িল। শেষটায় সফল হইল জয়া। রাজেশ্বরের মা এই কবচ ধারণ করার কিছুদিন পরেই তার জন্ম হয়। বৃদ্ধা জয়া তাকে তাই ডাকিত কল্কি-পুত্তুর। বলিত, লোকের থাকে ধর্ম্ম পুত্তুর। আমার হৈল কল্কি-পুত্তুর। ঐ রাজুয়া।

রাজেশ্বর জয়ার শেষদিন পর্যন্ত তাকে মাসহারা দিয়াছে।

এই সময় দূর হইতে গুটিকয়েক ছেলে আব্বাসের পিসিকে বলিল, ও বুড়ী, কবরে যাবি?

বৃদ্ধা এইবার গালি দিতে আরম্ভ করিল, আমি যাব কেন, যাবি তোরা।

বুড়ী যত খেপে ছেলেরা ততই চেঁচায়। সে শেষটায় রাজেশ্বরকে সালিস মানিল, বল ত বাবা, আমি মরব কেন? আমার মরার কি হৈছে?

রাজেশ্বর আসিয়াছে শুনিয়া একে একে পাড়ার অনেকেই আসিয়া হাজির হইল। কেহ কুশল প্রশ্ন করে, কেহ গৃহস্বামীকে বলে, একখানা পাখা আন, ওনারে একটু বাতাস হর। কেহবা ডাব আনিতে ছুটিয়া যায়। একজন রাজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতার এখন নিমকটা কি দরে পাওয়া যায়, মল্লিক মশয়। গান্ধী মহারাজ নিমক করবেন কবে? শোনলাম সে নিমকে নাকি পয়সা লাগবে না? কথাটা হাচা?

রাজেশ্বর আব্বাসের পিসিকে একজোড়া কাপড় ও দশটি টাকা দিলে বৃদ্ধা ঐ কাপড় ও টাকা পাড়ার মাতব্বর আজিজের হাতে দিয়া বলিল, জব্বরের ছাওয়াল মাইয়াগো দিয়া আইস। তারগো বড় কেলেশ কষ্ট। আমি আর কয়দিন? ছেঁড়া নেতাতেই আমার চলবে।

আশ্রফ ইহতে অসন্তুষ্ট হইল, বলিল. কাল. পরশুই ত আবার কাপুড় চাবা, ঘ্যানর ঘ্যানর করবা।

বৃদ্ধা বলিল, আমার একখানা কাপড় আছে। বেশী ছেঁড়াও না।

রাজেশ্বর আশ্রফকে বলিল, ও টাকা আর কাপড় জব্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দেও। তোমার হাতে ওঁর জন্য আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

আশ্রফ বলিল, তাই দিও। মল্লিকের পো। বুড়ীর হাতে দিলে ও বিলাইয়া দেয়। মরতে চলছে অথচ স্বভাব বদলায় না।

রাজেশ্বর বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা কবিল, কি খেতে ইচ্ছা করে, আয়ি মা?

বৃদ্ধা বলিল, মিষ্টু আর টক, একটু চুকা মিঠা।

অমলা এই বৃদ্ধাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তার জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গী কী অপূর্ব!

রাজেশ্বর বলিল, আয়ীমা বরাবরই ওই রকম। গেল দুর্ভিক্ষে নিজের ভাত পরকে দিয়ে উপোস করে থাকত। আব্বাস বকলে কিছু বলত না, একটু মুচকি হাসত।

ছোট ছোট এই জীবন, ছোট তাদের কাহিনী। সকলের দৃষ্টির আড়ালে ওরা যে কত মঙ্গল বিলায় কে তার হিসাব রাখে?

ফেরার পথে অমলা বলিল, বড্ড বেঁচে গেছি বাবা, বুড়ীকে বলতে যাচ্ছিলাম, তোমার মরতে ইচ্ছা করে না?

রাজেশ্বর বলিল, মরার কথা বললে ও চল্লিশ বছর আগেও খেপত।

অমলা আব একদিন দেখিল বৃদ্ধার আর এক রূপ। সে জাহানারার জন্য আচার আমসত্ব ও গুড় তেঁতুল লইয়া আসিয়াছিল। আচার পাইয়া বুড়ী বলিল, এ বুঝি কলকাতিয়া অম্বল?

এই সময় পাড়ার একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আব্বাসের ফুপা নাকি তোমারে ভাল বাসত না?

আর যায় কোথায়? বৃদ্ধা রাগিয়াই আগুন। সে ছেলেটিকে অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িল। খানিকটা পরে ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কলিল, আমারে বাসত না তাতে তোর কি রে মড়া? বাসত না ত ঠিকই।

আশ্চর্য ব্যাপার! একশো দশ বছরেব উপর বয়স অথচ স্বামী-প্রেমের অভাব সে ভুলিতে পারে নাই। সেই স্মৃতি আজও তাকে পীড়া দেয়।

রাজেশ্বর বলিল, জাহানারা যে বাংলার মেয়ে। হিন্দুই হ'ক আর মুসলমানই হ'ক বাঙালীর মেয়ে একই ছাঁচে ঢালা। আর এইটিই বাংলার বৈশিষ্ট্য।

একদল লোক আছে যারা কিছুতেই দুর্ভিক্ষের সাহায্য কেন্দ্রে যাইতে চায় না। চোখের সামনে ছেলে মেয়েবা ক্ষুধায় কাঁদে, দিনের পর দিন অস্থি চর্ম সার হইয়া যায়, অনশনে মরে, মরে অনশন জনিত ব্যাধিতে, তবু রিলিফ কেন্দ্রে যাইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে এদের আত্মাভিমানে বাধে।

এইরূপ এক পরিবারের খবর পাইয়া রাজেশ্বর কাঁদিগ্রামে গেল।

সঙ্কীর্ণ ভিটা, তার উপর একটি মাত্র বেঁটে হিজল গাছ, আর ছোট একখানি ঘর। নীচের ঝুরিখাল হইতেই ঘরখানি চোখে পড়ে, সেখানা এমন জীর্ণ যে এখনও কি কবিয়া যে দাঁড়াইয়া আছে ভাবিতে পারা যায় না।

সঙ্কীর্ণ খালের পাঁকের মধ্যে উপুড় করা মস্ত বড় একখানা বাচের নৌকা, তার অনেকগুলি কাঠ খসিয়া গিয়াছে, পেরেকগুলা কঙ্কালের দাঁতের মতন পৃথিবীকে যেন ভেংচি কাটে। দেখিলেই মনে হয় এর অতীত ছিল গৌরবময়। জীর্ণ বটে কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এখনও উহা বেমানান।

নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া তের চৌদ্দ বছরের নেংটি পরা একটি ছেলে পদ্মকেশর খাইতেছিল। পেট ও মাথা দুইই প্রকাণ্ড, হাত পা

গুলি সরু সরু, ছেলেটি যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। রাজেশ্বর নৌকা হইতেই তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেদার রায়ের বাড়ী কোন্‌টা?

ছেলেটি তার পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়া একটুক্ষণ বিস্ময় সহকারে চাহিয়া রহিল।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেদার রায়ের বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার?

হ মশয়, এইটাই তার বাডী।

রাজেশ্বর তার আত্ম-সম্ভ্রম বোধের গল্প শুনিয়া আশা করিয়াছিল, কেদার রায়ের বাড়ীটা অন্ততঃ এর চেয়ে বড় হইবে। উঠানে উঠিয়া দেখিল আরও তিনটি ছোট ছোট ছেলে। প্রত্যেকেরই চেহারা প্রথমটির মতন, উপরন্তু তারা উলঙ্গ।

তের চৌদ্দ বছরের ছেলেটি রাজেশ্বরকে ঘরের কাছে লইয়া গেলে একটি স্ত্রীলোক বুকে হাত চাপা দিয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল। ভিতরে পচা রক্ত মাংস ও ক্লেদের গন্ধ, ভিতের উপর গয়ের ছড়ান, পাশেই একটি লোক উবু হাঁটু বসিয়া। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেডা বট হে?

মঞ্জরী থেকে এসেছি।

সমাচারডা কি?

আপনারই নাম কেদার রায়?

হ। দারোগা, পুলিস, পেসিডেন সকলটি ত কয় কেদার রায়। অরে, ওনারে একটু বইসতে দে, আমি চক্ষে দেখি না, মশায়। মাফ করবা।

রাজেশ্বর বলিল, আপনার যদি কিছু সাহায্যের দরকার থাকে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি।

কেদার রায় কহিল, অ জীবনী, কেহ আর নাই ত ধারে কাছারে?

ছেলেটি কহিল, না বাবা।

কেদার বলিল, চাউল ডাইল কিছু দিলে বড় উপকার হয়। কিন্তু কেউ যেন টের না পায়। আমি কেদার রায়, বৈকুণ্ঠ মালোর ছাওয়াল আমি ভিক্ষার চাউল নিলে লোকে কবে কি ?

বৈকুণ্ঠ মালোর ছেলে কেদার রায়! বৈকুণ্ঠ ছিল তাদের জাতের মধ্যে একজন নামী লোক, চার পাঁচখানা টিনের ঘর, মস্ত বড় ভিটা, কত জমি জিরাত।

রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি মাতব্বর বৈকুণ্ঠ মালোর ছেলে, যার বাগেরহাটে কারবার ছিল ?

কেদার কহিল, নেপালপুর থানায় বৈকুণ্ঠ আবার কয় জন ? যানার বাইচের নাও ছিল, চালানি কারবার ছিল, ভুঁইয়ারা আর দারোগা সাইবরা যারে উঁচু পিঁড়া দিতেন, আমি সেই বৈকুণ্ঠেরই ছাওয়াল।

রাজেশ্বর দেখিল এই ভিটাটাও তার বৈকুণ্ঠ দা'র নয়। কেদারের দুর্দশায় সে ব্যথিত হইল। বাড়ী ঘর জমি জমার কথা জিজ্ঞাসা কবিতে তার আর প্রবৃত্তি হইল না। সে শুধু বলিল, আপনি রায় হয়েছেন কতদিন ?

হইছি বাপ মরার পরে। কত টাকা খরচ হৈছে।

খরচা কত করেছেন ?

শতে শতে। চৌধুরীর সেরেস্তায়, রেজেষ্টারী অফিসে, থানায়—টাকা লাগছে সব জায়গায়। দারোগা পেসিডেন, উকিল মোক্তার টর্নী—টাকা খাইছে সকল বেটা।

লোকটা এত বোকা—রায় বনিতে সর্বস্বান্ত হইল। আর তারই বা দোষ কি ? পথ দেখাইয়াছে গণ্য মান্য, শিক্ষিত সম্ভ্রান্তেরা। রাজেশ্বর এমন বহু শিক্ষিত লোক দেখিয়াছে, যারা সামান্য উপাধির জন্য জলের মতন টাকা খরচ করে। জমিদারি বন্ধক দিয়া রায় বাহাদুর হয়।

বৈকুণ্ঠ মালোকে সে দাদা বলিয়া ডাকিত। কয়েকবার তাঁর বাড়ীতেও গিয়াছে। তখন কেদার ছিল নিতান্ত নাবালক।

বৈকুণ্ঠের সহিত রাজেশ্বরের পরিচয় বাগেরহাটে, সেও চালানি কারবার করিত। রাজেশ্বর তার কাছে অনেক উপকার পায়। টিনের আটচালা, ধানের মড়াই, গোয়ালঘর, বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে এর সবই ছিল। আজ তার ছেলের এই দুর্দশায় রাজেশ্বর অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে বলিল, আপনাকে কিছু চাল ডাল দিয়ে যাচ্ছি আর কয়েকটা টাকা।

কেদার কাঁদ কাদ ভাবে বলিল, এও আজ নিতে হইল, বরাতে এও ছিল। আমার বাপের নৌকা বাইছে রাজু মল্লিক, বাইচের নৌকা। শুনছি সে নাকি এখন মাজিষ্টর রেজিষ্টর সাইবগো লগে খানা পিনা করে, আপনার গো মঞ্জুরীরই রাজু মল্লিক। নৌকাখান অনেকে কেনতে চাইছিল। বেচি নাই। তবু মান্‌ষের কাছে কইতে পারব। আমার গো নৌকা বাইতে যাইয়াই রাজু জলে পড়ছিল। বাঁচাইল তারে টগর নামে এক মাথারি। দুইজনেরই খুবসুরত চেহারা। তাগো ভালবাসা হইছিল খুব। টগর কলিকাতায় যাইয়া মরল ভালবাসার জনের ধারে। শোনছ বোধ হয় এসব কথা? জানে সকলটিই।

রাজেশ্বরের কাছে এ এক নূতন সংবাদ। পাছে নিজের পরিচয় দিতে হয় এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইল।

মাঝি ইতিপূর্বেই চাল ডাল তুলিয়া দিয়াছিল। রাজেশ্বর উঠানে আসিয়া দেখিল, ছেলেরা মুঠায় মুঠায় চাল ডাল চিবাইতেছে। সে নৌকায় উঠিলে পুত্র জীবনীকে মাঝে রাখিয়া হিজল গাছের আড়াল হইতে কেদারের স্ত্রী কহিল, ও জীবনী, কও, ওনারে আমি চেনতে পারছি। উনিই রাজা রাজু মল্লিক। ঘরের একজন চক্ষে দেখে না, ভোগতেছে দুই বছর। রক্ত আমাশা. অর্শ। উনি যদি আমারগো

না দেখেন, তিকিচ্ছা না করান তা হইলে ছাওপোনা লইয়া আমি ভাসিয়া যাব !

রাজেশ্বর আশ্বাস দিল, আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে খন।

স্ত্রীর কাছে শুনিয়া কেদার বলিল, অমন একটা ধনী মানী মানুষ আইল, তারে একটু পান সুপারিও দিতে পারলাম না। সকলই অদেষ্ট !

রাজেশ্বরের বাড়ীর সীমানা মঞ্জরীব খাল পর্যন্ত, পুরাতন বাড়ী আর খালের মধ্যের সমস্ত জমি কিনিয়া সে বাগান করিয়াছে। পুরান ভিটাতেই সাদা তেতলা দালান। পাশেই চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দির। বাগানে নানারকম ফুল ফল ও পাতাবাহারের গাছ, ছোট ছোট বাওয়ার। বাড়ীতে আসিয়া এবারও রাজেশ্বর নিজের হাতে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়াছে, সার দিয়াছে, নতুন কলম করিয়াছে। প্রতি বারই এইরূপ করে।

বাড়ীর দক্ষিণে চাঁপার চিতার উপর শ্বেত পাথরের তৈরি বেদী। তার পুবে বীরেশের নিজের হাতে রোঁয়া আমগাছ। তার তলাটাও বাঁধান। এইখানে বসিলে সোজা খাল পর্যন্ত দেখা যায় এবং খালের ওপারে প্রায় দুই মাইল মাঠ। মাঝে কোন গাছপালা নাই।

সন্ধ্যার পর নাম-জপ সারিয়া রাজেশ্বর কোনদিন ঘাটে বসে, কোনদিন স্ত্রীর সমাধির উপর। গ্রামের লোকেরা আসিয়া জড় হয়, বিনা কারণে নানা রকম পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে যেমন, বৌর অসুখ করিয়াছে, কি চিকিৎসা করাইবে, কবিরাজী না এ্যালোপ্যাথিক ? কেহ নতুন জামাইকে লইয়া আসে, বলে এনার সঙ্গে আলাপ কর বাবাজী, ইনি সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ।

তারা চলিয়া গেলে অমলা আসে। সেদিন অমলার শরীর ভাল ছিল না। রাজেশ্বর একা বসিয়াছিল।

খালের ওপারে দেখা যায় তারাকান্দরের মাঠ। মাঠের পুব দক্ষিণ কোণে তারাকান্দরের গাছের সারি যেখানে শেষ হইয়াছে তারও দক্ষিণ পুব কোণে ধূ ধূ করে কান্দি গ্রাম। ঐখানে কেদার রায়ের বাড়ী। তার সেই পুরাতন পৈতৃক বাড়ী নয়, দরিদ্র রুগ্ন কেদারের জীর্ণ কুটির।

অদ্ভুত মানুষ এই কেদার রায়। অত গরিব অথচ অতখানি আত্মাভিমানী। রাজেশ্বর টাকা দেওয়ার সময় কেদার অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে হাত বাড়াইয়াছিল। দরিদ্র বটে, কিন্তু মানুষটা ঠিক ভিখারী সাজিতে পারে নাই, দেখিয়া রাজেশ্বরের একটু শ্রদ্ধাও হইয়াছিল। কেদার তাকে আজ এক নূতন খবর দিল। টগর ও তার প্রেমের কথা। রাজেশ্বরের জীবনে টগর ছিল স্বপ্নের মতন, দুঃস্বপ্ন নয়, ঠিক সুখস্বপ্ন কিনা তাও সে বোঝে না। তবে এই স্বপ্নের স্মৃতি-টুকুকে গোপনীয়তার মর্যাদা দিয়া কত যত্নেই না সে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সে স্মৃতিও নাকি আজ পাঁচজনের সম্পত্তি। সুদূর কাঁদি গ্রামের লোকেও তা জানে।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে চাঁপার কথা—চাঁপা, টগর বীরেশ্বর। দ্রুতগামী স্টীমারে দাঁড়াইয়া পিছনের দিকে চাহিলে যেমন মনে হয়, গাছ পালা, ঘর বাড়ী, গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, কত জিনিসই না পিছনে ফেলিয়া গেলাম। কিন্তু উহা ছাড়া উপায় নাই, ফেলিয়া যাওয়াই বিধিলিপি। বৃদ্ধ বয়সে জীবনের পিছনের দিকে তাকাইলেও মনে হয় ঠিক ঐ একই কথা। কত আসিল, কত গেল। কিন্তু বৃথা এর কেহ নয়, মিথ্যা নয় কেহই। অতীত বর্তমানের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবে। সে হিসাবে চাঁপা, টগর বীরেশ্বর, স্যার চার্লস ষ্টিফেন প্যাটার্সন, দুঃখীর মা তার জীবনে সার্থক এঁরা সকলেই।

পরের দিন সকালে বৃন্দাবনের মৃত্যু সংবাদ আসিল। সুপ্রভা লিখিয়াছে, সুস্থ মানুষটি, বসে তামাক খাচ্ছেন। হঠাৎ একটা কাশি দিলেন, আবার একটা, তাব পরই শুয়ে পড়লেন, জবা জ্যাঠাইমাকে ডাকলেন, মাথারি—। তিনি আসবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর মুখ দিয়ে শেষ কথা বেরুল, আমার রাজু ভাই। সামনে ছিল সান্ ইয়াট্ সেন, মৃত্যুর সময় জ্যাঠামশাইর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার উপর।

চিঠি পড়িয়া রাজেশ্বর স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। সারাটা দিন কারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। রাত্রে অমলাকে বলিল, তখন ত্রিগুণা ভিন্ন আমার কেউ ছিল না। তোমার কাকীমাও আসেন নি। সেই সময় পেলাম বৃন্দাবনকে। সে ছিল যেন ভগবানের আশীর্বাদ।

এরপর খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল বৃন্দাবনের কথা। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমার জীবনে কেউ মরে নি। নিরর্থক হয় নি কিছুই, মা।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনের মৃত্যুর পর রাজেশ্বর তাই কলিকাতায় চলিয়া আসিল। জবা তার অনেক উপকার করিয়াছে। তার এই বিপদে কাছে থাকা দরকার। আসিয়া দেখিল জবার স্থির অচঞ্চল মূর্তি। বেদনাকে সে বেশ শান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল যেন কিছুই হয় নাই—এমন ভাব।

রাজেশ্বর অমলাকে বলিল, তুমি ঠিকই বলেছিলে যে জবা জ্যাঠাইমা এ শোকে মুষড়ে পড়বে না।

কিছুদিন পরের কথা। অফিস হইতে খানিকক্ষণ মাঠে বেড়াইয়া সন্ধ্যার একটু পরে রাজেশ্বর বাড়ী ফিরিয়াছে। তখনও অফিসের পোশাক ছাড়ে নাই। এই সময় চাকর খবর দিল, পুলিসে বাড়ীটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। রাজেশ্বর বারান্দায় আসিয়া দেখিল, সেখানেও কয়েকজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া, তার মধ্যে গুটি কয়েক বাঙালী ভদ্রলোক এবং তিন চারটি সার্জেন্ট। বাহিরে দু তিন খানা মোটর। ল্যানে কতকগুলি কনষ্টেবল্।

একটি বাঙালী ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আপনিই কি মিষ্টার রাজেশ্বর মল্লিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা বসুন।

ভদ্রলোক নিজে আসন গ্রহণ করিয়া সহকর্মীদের বসিতে বলিলে তারা বসিল। তিনি রাজেশ্বরকে বলিলেন, আমি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি, আপনাকে দুজন আসামী সনাক্ত করতে হবে। আপনার মেয়ে মিস অমলাকেও আমাদের দরকার।

রাজেশ্বর পুলিস অফিসারের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া রহিল। অমলা আসিলে বলিল, ইনিই অমলা।

পুলিস অফিসার বলিলেন, নমস্কার মিস্ রায়! আমি স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের গোপাল বিশ্বাস।

গোপাল বিশ্বাস বাংলার যুব সমাজের ভাগ্যবিধাতা। পুলিস তার অঙ্গুলি হেলনে চলে। তিনি সার্জেন্টদের একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, Hallo Orchard, bring them in. তারপর রাজেশ্বরকে বলিলেন, রায়পুর মামলার কথা শুনছেন বোধ হয়? তারই দুজন আসামীকে সনাক্ত করতে হবে।

অরচার্ড ও দুইজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আসামীরা ভিতরে আসিলেন। উভয়েরই সুগঠিত, দীর্ঘ ঋজু দেহ, দীর্ঘশ্মশ্রু। একজনের পরনে পায়জামা ও ভেষ্ট, পায়ে চপ্পল, আর একজন গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত। উভয়েরই দৃষ্টি তেজস্বী ও উদার তবে ভেষ্ট পরিহিতকে কিছু ক্ষীণ ও দুর্বল দেখাইতেছিল।

বিশ্বাস বলিলেন, বসুন শাস্ত্রীজী, বসুন মিঃ আজাদ। এদের চিনতে পাবেন, মিস্ রায়?

অমলা উভয়কে ভাল করিয়া দেখিয়া বিশ্বাসের দিকে চাহিল। ইশারায় জানাইল, না চিনিতে পারে নাই।

বিশ্বাস একটু হাসিলেন,। তিনি রাজেশ্বরকে বলিলেন, বিখ্যাত অনন্ত শাস্ত্রী ও আজাদ সাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল আপনার বাড়ীতে। এঁদের সহকর্মী ছিলেন মিস্ রায়। অবশ্য উনি আজ ওঁদের চিনতে পারছেন না।

আসামীদের দিকে একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজেশ্বর অনন্ত শাস্ত্রীকে ডাকিল, নরু, নরেশ।

নরেশ মাথা নীচু করিল। রাজেশ্বর বলিল, আর এই বোধ হয় তোমার বন্ধু সুলেমান? নরেশ সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

মিঃ বিশ্বাস বলিলেন, বড় বাপের ছেলে। তা ছাড়া নিজেও শক্তিমান। নরেশ্বর বাবু নেতা হবেন এই ত স্বাভাবিক।

সে কথা রাজেশ্বরের কানে গেল কিনা সন্দেহ। পুত্রের প্রশান্ত ভাব ও দীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে সে গর্ব বোধ করিল।

মিঃ বিশ্বাস রাজেশ্বরকে বলিলেন, আপনার সঙ্গে কাজ আমাদের হয়ে গেছে। আপনি নিজেই দুজনকে সনাক্ত করেছেন।

এরপর আরম্ভ হইল অমলার জেরা। নরেশ কোন্ বই কবে তাকে পড়িতে দিয়েছে, সুলেমান ও নরেশের সঙ্গে তার কি কি আলোচনা হইয়াছে, এই সব খুঁটি নাটি প্রশ্ন।

দুই বৎসর আগের ঘটনা। সব জিনিস ঠিক মনে নাই। পুলিস নানাভাবে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রশ্ন করে। অমলা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয়, ভাবিতে সময় নেয় না। পুলিস চেষ্টা করিয়াও নিজের অভীপ্সিত কোন কথা বাহির করিতে পারে না, বরং নিজেরাই হিমশিম খাইয়া যায়।

রাজেশ্বর বলিল, আপনার আপত্তি না থাকলে এদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি।

মিঃ বিশ্বাস বলিলেন, সে ত ভালই।

পুলিস বিদায় লইল রাত প্রায় বারটায়। অমলাকেও তারা লইয়া গেল। মিঃ বিশ্বাস বলিলেন, আপনার মেয়েকে আমরা শীগ্‌গীরই ছেড়ে দেব।

এবার রাজেশ্বর একটু হাসিল, বড় করুণ সে হাসি।

পুলিসের সঙ্গে যাইবার সময় নরেশ্বর ও অমলা দুজনেই তার পদধূলি লইল। অমলা হাসিয়া বলিল, আমি শীগ্‌গীরই ফিরে আসব বাবা। এই ত মিঃ বিশ্বাস বলছেন, এত বড় অফিসার উনি।

বিশ্বাসের মতন লোকও এবার মাথা নীচু করিলেন।

রাজেশ্বর এতক্ষণ সোজা হইয়া বসিয়াছিল। পুলিস চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িল।

মহেশ্বরও পুলিসের খবর পাইয়া আসিয়াছিল। সে তারকেশ্বর ও উমা এবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আসিল জবা। জবা রাজেশ্বরকে বাতাস করে, উমা তার পায়ে হাত বুলায়। রাজেশ্বর চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, পরনে তখনও অফিসের পোশাক। কপালে ও নাকে ঘামের ফোঁটা চকচক করে, মনে হয় যেন শ্রান্ত কোন সৈনিক যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাজেশ্বর ভাবিতেছিল অনেক কথা—ষড়যন্ত্র, মামলা, অমলা ও নরেশ্বরের অজানা ভবিষ্যৎ, কম্যুনিজম, মানুষের জীবন প্রবাহ।

খানিকটা পরে উমা কহিল, হাত মুখ ধুয়ে একটু দুধ খান, বাবা।

রাজেশ্বর ইশারায় জানাইল, না এখন নয়।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়, একে একে সকলেই বিশ্রাম করিতে যায়। আলোটা নিভাইয়া দিয়া একা জবা অপেক্ষা করিতে থাকে। সে পরম স্নেহে রাজেশ্বরের কপালে হাত বুলায়।

এই স্ত্রীলোকটি অশিক্ষিত, সে বৃন্দাবনের বউ কিন্তু মন ও রুচি তার মার্জিত, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তার মনে পড়ে, জীবনে কত উপকার সে পাইয়াছে এই মানুষটির কাছে। মূর্খ দরিদ্রের স্ত্রী সে, সমাজে তার কী অবস্থাই না হইত যদি এই মানুষটি তাকে আশ্রয় না দিত। ভুলিয়া না ধরিত। বিধবার বুকখানা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। তার চোখের দু ফোঁটা জল পড়ে চেয়ারের হাতলের উপর। সে বিস্মিত হয়।

রাত্রি আরও গভীর হয়, মধ্যে মধ্যে দুই একখানা মোটর সামনের রাস্তা দিয়া হর্ণ বাজাইয়া যায়। পাশের এক করদ নৃপতির বাড়ীর তৃতীয় প্রহরের সানাইয়ের বাজনায় রাজেশ্বরের তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। সে চাহিয়া দেখে তার পাশেই রাস্তার আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়া আসিয়া মেজের উপর দাবার ছকের মতন ছক কাটিয়াছে। সে মাথায় একটা সূক্ষ্ম তীব্র বেদনা বোধ করে, সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে নরেশ্বরকে—অমলাকে।

দেখে তার সামনে যেন একটা মিছিল চলিয়াছে—অগণিত মানুষের মিছিল, এই মিছিলটা কখনও সোজা যায়, কখনও বা যায় বক্র গতিতে। কখনও সব দলিয়া মথিয়া তৈমুর নাদিরের মতন চলে, কখনও বুদ্ধ খৃষ্ট অশোকের মতন শান্তি বিলাইতে বিলাইতে অগ্রসর হয়।

এই গতি চলিয়াছে সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে। অনাদি এর ধারা, অনন্ত প্রবাহ। আজ সেই গতি-প্রবাহে দেখা যায় নরেশকে, অমলাকে, রুগ্ন শীর্ণ সুলেমানকে। তার অমলা, তার নরেশ এই মিছিলের বর্তিবাহী।

ধীরে ধীরে সে বলে, নরেশ, অমু, তোমরা যাও—আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি।

সমাপ্ত

"শতাব্দী" সম্বন্ধে লেখকের নিকট প্রেরিত বাংলার শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের অভিমত :

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'শতাব্দী' পড়া শেষ হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসখানি একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। ইহা বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও মনে হইতেছে, আপনিই নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন—একেবারে বাংলার বাঙ্গালীর নবজীবন। এই উপন্যাসখানি এমন সময়ে বাহির হইয়াছে যখন আমাদের মহারথীরা তাঁহাদের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন—এখন নিজ নিজ সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জর করিয়া চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করাইতেছেন। আপনার লেখাটিতে কি ভাবে, কি ভাষায় কোথাও চীৎকার নাই। দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ, তেমনই স্থির; কল্পনা অতিশয় সংযত—কোনখানে অতিরিক্ত রং বা মশলা নাই, ভাষাও তদুপযুক্ত। এই ভাষাই রচনাটির জীবন, উহাই আপনার প্রধান কৃতিত্ব। আপনার দৃষ্টি বা মনোভাব, কল্পনার সমগ্ররূপ, রচনার যাহা কিছু কৌশল তাহা ঐ ভাষাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঐ ভাষাই তাহা ধরিয়া আছে। সকল শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ উহাই, ভাষাই সব; প্রেরণা যদি সত্য এবং সম্পূর্ণ হয় তবে লেখক তাহার উপযুক্ত ভাষাও লাভ করেন—ঐ ভাষাই তাঁহার মুক্তি, উহাই শক্তি, উহাই আনন্দ! এই উপন্যাসে আপনি কোথাও

এতটুকু আত্মভ্রষ্ট হন নাই অর্থাৎ ফাঁকি দেন নাই—আপনার সারাজীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহার সকল উপকরণ যোগাইয়াছে একটা জীবনের যাহা কিছু সঞ্চয় এবং প্রাণপূর্ণ উপলব্ধি আপনি ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাই ইহা এত সত্য ও সফল হইয়াছে। অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতেই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা লাভ করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে আপনি বাঙালী জীবনের তথা সমাজের, একেবারে মূলে বা তলদেশে দৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জীবনের অতিশয় সরল ও সহজ ধারাটিকে আধুনিক কালের বিশাল জীবন-সমুদ্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। অথচ কোন মতবাদের উগ্রতা নাই, চরিত্র সৃষ্টিতে কোন জটিলতা নাই নাটকীয় ঘটনার চমক, বা কাব্য কল্পনার রংও নাই। নায়ক রাজেশ্বরের জীবন ও তাহার চরিত্রকে ঘেরিয়া যে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারা যেমন স্বতন্ত্র ও সজীব, তেমনই কাহিনীরও সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইয়াছে। নায়ক চরিত্রের যে বিকাশ এই উপন্যাসে দেখানো হইয়াছে যাহাকে ইংরেজীতে growth বা development বলে, এমন আমি বাংলা উপন্যাসে অল্পই দেখিয়াছি। তার কারণ এই চরিত্রটিই যেমন উপন্যাসের মেরুদণ্ড, তেমনই ইহার স্বরূপটি আপনার কল্পনার অতিশয় সত্য ও গভীরভাবে ধরা দিয়াছিল ঐ একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনের স্পর্শে আর সকল চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার এই কেন্দ্রটি ঠিক ছিল বলিয়া আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

আপনার এই উপন্যাসখানি একটি অভিনব রচনা। অভিনব এবং অতিশয় সহজ ও ধীর গভীর বলিয়াই সহসা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতেও পারে; কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার লক্ষ্যভেদ হইয়াছে। একটা বিষয়ে আপনি সত্যই অপরাধ করিয়াছেন এত ছোট অক্ষরে ছাপা উচিত হয় নাই। উপন্যাস পাঠক সর্ব্ব বিষয়েই

একটু আরাম চায়, এজন্য অনেকেই বিমুখ হইতে পারে। বইখানি সুশ্রী হওয়া উচিত ছিল।

পুনরায় আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়—

স্বাঃ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

কুরপালা—৩৷৷০

মৃত ও অমৃত—২৷৷০

চক্রবাক—৩৲

প্রাপ্তিস্থান—

পূরবী পাব্‌লিশার্স

১৩নং শিবনারায়ণ দাস লেন,

কলিকাতা।